কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

[illegible]

খণ্ড

৫

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো · ১৯৭৯

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

К. Маркс и Ф. Энгельс
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ
Том III
На языке бенгали

МЭ $\frac{10101\text{-}092}{016(01)\text{-}79}$ 739-79   0101010000

সূচি

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব (১)

১

বিপ্লবের শুরুতে জার্মানি

ইউরোপের মূলভূমিতে বৈপ্লবিক নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ। ১৮৪৮-এর ঝঞ্ঝার আগে 'কর্তৃপক্ষ যারা ছিল' তারা আবার 'বিদ্যমান কর্তৃপক্ষ,' আর কমবেশি জনপ্রিয় একদিনের শাসকেরা, সাময়িক গভর্নররা, ত্রিজন-শাসকদের একতমরা, একনায়কেরা, তাদের প্রতিনিধি, সিভিল কমিশনার, সামরিক কমিশনার, জেলা-শাসক, বিচারপতি, জেনারেল, অফিসার আর সৈনিকদের নিয়ে লেজুড়টা সমেত ছিটকে পড়েছে গিয়ে নানা বৈদেশিক উপকূলে, 'চালান হয়েছে সাগরপারে' ইংলন্ডে কিংবা আমেরিকায়। সেখানে তারা গড়বে 'in partibus infidelium' (২) নতুন নতুন সরকার, বিভিন্ন ইউরোপীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, জাতীয় কমিটি, আর নিজেদের অভ্যাগম প্রচার করবে যেসব উদ্‌ঘোষণায় সেগুলো হবে যেকোন কম কাল্পনিক শাসকদের উদ্‌ঘোষণারই মতো গুরুগম্ভীর।

সৈন্যব্যূহের একেবারে সমস্ত ঘাঁটিতে ইউরোপের মূলভূমির বৈপ্লবিক পক্ষ -- বরং বলা ভাল, পক্ষগুলি -- যেমনটা ভোগ করেছে তার চেয়ে বিলক্ষণ পরাজয় কল্পনাতীত। কিন্তু তাতে কী হবে? সামাজিক আর রাজনীতিক প্রাধান্যের জন্যে বৃটিশ বুর্জোয়াদের আটচল্লিশ বছর ধরে, ফরাসী বুর্জোয়াদের চল্লিশ বছর ধরে দৃষ্টান্তহীন সংগ্রাম চালাতে হয় নি কি? পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র যখন মনে করেছিল সেটা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি অটল হয়ে দাঁড়াল ঠিক সেই মুহূর্তেই যেমনটা, অন্য কোন সময়ে তার চেয়ে নিকটবর্তী হয়েছিল কি বুর্জোয়াদের বিজয়? বিপ্লবকে অল্পকিছু আলোড়কের বিদ্বেষপ্রসূত বলা হত যে-কুসংস্কারে সেটার সময় চলে গেছে অনেক আগেই।

প্রত্যেকেই আজকাল জানে, যেখানেই কোন বৈপ্লবিক আলোড়ন ঘটে সেখানে পশ্চাদভূমিতে থাকেই কোন সামাজিক অভাব, যেটা জীর্ণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির বাধার দরুন মিটতে পারে না। যাতে আশু সাফল্য নিশ্চিত হয় তত প্রবলভাবে, তত সর্বজনীন হয়ে অভাবটা কোন একসময়ে তখনও মালুম না হতে পারে, কিন্তু বলপূর্বক দমনের প্রত্যেকটা চেষ্টার ফলে সেটা শুধু ক্রমাগত প্রবলতর হয়েই প্রকাশ পায়, শেষে ফেটে পড়ে বেড়ি ভেঙে। তাহলে, আমরা যখন পরাস্তই হয়েছি, সেক্ষেত্রে শুরু থেকে আবার শুরু করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। তাছাড়া, সৌভাগ্যবশত, আন্দোলনের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনার মধ্যে বিশ্রামের জন্যে সম্ভবত খুবই সংক্ষিপ্ত যে বিরতিটা জুটে গেল তাতে আমাদের খুবই জরুরী একটা কাজের জন্য সময় পাওয়া গেল: বিলম্বে বৈপ্লবিক সংঘটন এবং পরাজয় উভয়ই অবশ্যম্ভাবী হবার কারণগুলো নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ; কিছু কিছু নেতার আপতিক প্রচেষ্টা, প্রতিভা, দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি কিংবা বেইমানির মধ্যে নয়, কারণগুলো খুঁজতে হবে আলোড়িত জাতিগুলির প্রত্যেকটার সাধারণ সামাজিক অবস্থা এবং জীবনের পরিবেশের ক্ষেত্রে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসের সহসা সংগঠিত আন্দোলন দুটি কোন পৃথক পৃথক ব্যক্তির কৃতি নয়, তা হল কমবেশি স্পষ্ট উপলব্ধ কিন্তু প্রত্যেকটি দেশে বহু শ্রেণীর খুবই নিশ্চিতভাবে অনুভূত জাতিগত অভাব আর প্রয়োজনসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত দুর্নিবার অভিব্যক্তি, এখন এ সত্য সর্বত্রই স্বীকৃত। কিন্তু প্রতিবৈপ্লবিক সাফল্যগুলোর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সর্বদিক থেকে সঙ্গেসঙ্গেই উত্তর পাওয়া যায়: শ্রী অমুক কিংবা তমুক মহাশয় জনগণের প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা করেন'। পরিস্থিতি অনুসারে উত্তরটা হতে পারে যথার্থ কিংবা তা নয়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সেটায় কোনকিছুরই ব্যাখ্যা মেলে না — 'জনগণ' তাদের প্রতি এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা হতে দিল, এমনটা ঘটল কেন, তাও তাতে দেখান হয় না। তমুক মহাশয়কে বিশ্বাস করা চলবে না, এই একমাত্র তথ্য সম্বন্ধে অবগতি যে রাজনীতিক পার্টির মোট পুঁজিপাটা সেটার সাফল্যের সম্ভাবনা তো সামান্যই।

তাছাড়া, বৈপ্লবিক আলোড়ন এবং সেটার দমনের কারণগুলোর অনুসন্ধান এবং প্রকটন একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্নও বটে।

মারাস্ত, না লেদ্রু-রলাঁ, না লুই ব্লাঁ, না অস্থায়ী সরকারের অন্য কোন সদস্য, না তাঁরা সবাই মিলে বিপ্লবটাকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন বিপর্যয়ের মধ্যে, যেখানে সেটা ডুবল, এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী উক্তি — এই সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কোন্দল, অভিযোগ আর পালটা অভিযোগ — এগুলোতে আমেরিকান কিংবা ইংরেজদের কোন্ আগ্রহটা থাকতে পারে, ব্যাপারটা বুঝতে এগুলো তাদের কোন্ সাহায্যটা করতে পারে, যখন তারা এই সমস্ত বিভিন্ন আন্দোলন লক্ষ্য করেছে এত দূর থেকে যাতে কার্যকলাপের কোন খুঁটিনাটি পৃথক করে ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়? কোন প্রকৃতিস্থ লোক কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, ভালর জন্যেই হোক, আর মন্দর জন্যেই হোক, মোটের উপর মামুলি ক্ষমতাসম্পন্ন এগার জন* তিন মাসের মধ্যে তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষের জাতিটার সর্বনাশ করতে সমর্থ হল — যদি না ঐ তিন কোটি ষাট লক্ষ মানুষ তাদের সামনে পথটাকে দেখতে পেরে থাকে ঐ এগার জনের মতোই সামান্যই। কিন্তু এমনটা কী করে ঘটল যাতে কোন্ পথে চলতে হবে সেটা অংশত আবছা আলোয় হাতড়ে হলেও তাদের নিজেদেরই স্থির করতে ডাক পড়ল একসঙ্গে এই তিন কোটি ষাট লক্ষের উদ্দেশে, আর তারপর কী করে তারা পথ হারাল এবং তাদের পুরন নেতাদের কিছু সময়ের জন্যে নেতৃত্বে ফিরে আসতে দেওয়া হল, এটাই আসল প্রশ্নটা।

কাজেই, যেসব কারণ ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লবকে অনিবার্য করেছিল, এবং ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সালে সেটার ঠিক তেমনই অবশ্যম্ভাবী সাময়িক অবদমন ঘটিয়েছিল, সেগুলোকে আমরা 'Tribune'-এর (৩) পাঠকদের সামনে খুলে ধরতে চেষ্টা করলে সেদেশে তখনকার ঘটনাধারার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমাদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় না যেন। আপাতদৃষ্টিতে আপতিক, অসংলগ্ন এবং বেখাপ ঘটনাবলির তালগোল পাকান পিন্ডটার কোন্ অংশটা হবে পৃথিবীর ইতিহাসের একাংশ সেটা পরবর্তী ঘটনাবলি এবং আগামী পুরুষ-পর্যায়গুলির রায় দিয়ে নির্ধারিত হবে। তেমন কাজটা করার সময় এখনও আসে নি। যা সম্ভবপর সেটার চৌহদ্দির মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে, আর সেই আন্দোলনের প্রধান প্রধান ঘটনার, প্রধান প্রধান উত্থান-পতনের

* ফরাসী অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা। — সম্পাঃ

ব্যাখ্যা দেবার জন্যে, এবং পরবর্তী সম্ভবত অনতিদূরবর্তী উৎক্ষেপ জার্মান জনগণকে কোন্ অভিমুখে চালিত করবে তার সূত্রক পাবার জন্যে অনস্বীকার্য তথ্যাদির ভিত্তিতে যুক্তিসম্মত কারণগুলো বের করতে পারলে সেটাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে।

প্রথমত, বিপ্লবের শুরুতে জার্মানির অবস্থাটা কী ছিল?

জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণীর গড়ন হল প্রত্যেকটা রাজনীতিক সংগঠনের বনিয়াদ — সেটা জার্মানিতে ছিল অন্য যেকোন দেশের চেয়ে জটিল। বড় বড় শহরে, বিশেষত রাজধানীতে জড়ো হওয়া শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ বুর্জোয়ারা ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্রকে বিনষ্ট করেছিল, কিংবা, অল্প কয়েকটা আকারে পর্যবসিত করেছিল, যেমনটা ইংলন্ডে, কিন্তু জার্মানিতে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুল তাদের প্রাচীন বিশেষাধিকারগুলোর একটা বড় অংশ বজায় রেখেছিল। সামন্ততান্ত্রিক রায়তিস্বত্বের বহুল প্রচলন ছিল প্রায় সর্বত্র। ভূমির ভূম্যধিকারী প্রভুরা তাদের প্রজাদের উপর এক্তিয়ার পর্যন্ত বজায় রেখেছিল। রাজনীতিক বিশেষাধিকার থেকে, রাজন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েও তারা কৃষকদের উপর নিজেদের খাসমহলের মধ্যযুগীয় আধিপত্যের প্রায় সবটাই এবং কর থেকে অব্যাহতিও বজায় রেখেছিল। কোন কোন এলাকার চেয়ে অন্য কোন কোন এলাকায় সামন্ততন্ত্র বেশি জেঁকে ছিল, কিন্তু রাইন নদীর পশ্চিম পারে ছাড়া কোথাও সেটা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নি। তখন খুবই সংখ্যাবহুল এবং অংশত খুবই সমৃদ্ধ এই সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতকুল সরকারীভাবে দেশের পহেলা 'বর্গ' বলে গণ্য ছিল। ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তারা, ফৌজের প্রায় সমস্ত অফিসার ছিল এদের মধ্য থেকে।

জার্মানির বুর্জোয়ারা মোটেই ফ্রান্স কিংবা ইংলন্ডের বুর্জোয়াদের মতো তত সমৃদ্ধ এবং একত্রে জড় ছিল না। স্টীম চালু হবার ফলে এবং ইংরেজদের ম্যানুফ্যাকচারের দ্রুত বেড়ে চলা প্রাধান্যের দরুন জার্মানির প্রাচীন ম্যানুফ্যাকচার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়নীয় ইউরোপীয় মূলভূমি ব্যবস্থার (৪) আমলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চালু করা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ম্যানুফ্যাকচার দিয়ে পুরনগুলো নষ্ট হবার ক্ষতিপূরণও হয় নি, নিজ অভাব সরকারগুলির গোচরে জোর করে আনার মতো শক্তিশালী ম্যানুফ্যাকচারিং

তরফ সৃষ্টি করতেও তা যথেষ্ট ছিল না, — অভিজাতকুলের ছাড়া অন্যের সম্পদ আর ক্ষমতার যেকোন প্রসারের বিরুদ্ধে প্রখর সতর্কতা ছিল এইসব সরকারের। ফ্রান্স যেখানে বিপ্লব আর যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর জুড়ে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য রেশম ম্যানুফ্যাকচার চালিয়েছিল, ঐ একই সময়ে জার্মানির ক্ষৌমবস্ত্রের শিল্প প্রায় নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল। তাছাড়া, ম্যানুফ্যাকচারের এলাকা ছিল বিরল; সেগুলো ছিল দূর অন্তর্দেশে, আমদানি-রপ্তানির জন্যে ব্যবহার করত প্রধানত বৈদেশিক, ওলন্দাজ কিংবা বেলজিয়ান বন্দর, উত্তর সাগর এবং বলটিক রাষ্ট্রগুলির বড় বড় সমুদ্র-বন্দর শহরের সঙ্গে সেগুলির সমস্বার্থ ছিল সামান্য কিংবা মোটেই না; সর্বোপরি, সেগুলি প্যারিস আর লিয়োঁ, লণ্ডন আর ম্যাঞ্চেস্টারের মতো বড় বড় ম্যানুফ্যাকচার আর বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে নি। জার্মান ম্যানুফ্যাকচারের এই অনগ্রসরতার কারণ ছিল বহুবিধ, তবে সেটার বাবত দুটো কারণ দেখানোই যথেষ্ট হবে: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রধান পথ হয়ে উঠেছিল আটলাণ্টিক মহাসাগর, সেটা থেকে বেশ দূরে দেশটির প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থান, আর জার্মানি অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত ছিল, ষোল শতক থেকে এখনকার দিন অবধি সেইসব যুদ্ধ চলেছিল দেশটির মাটিতে। যে রাজনীতিক প্রাধান্য ইংরেজ বুর্জোয়াদের আয়ত্তে রয়েছে সেই ১৬৮৮ সাল থেকে, যা ফরাসীরা জিতে নিয়েছিল ১৭৮৯ সালে, সেটা জার্মান বুর্জোয়ারা লাভ করতে পারে নি এই সংখ্যাল্পতারই দরুন, বিশেষত কোনই কেন্দ্রীকরণের অভাবের দরুন। অথচ জার্মানিতে বুর্জোয়াদের সম্পদ এবং তার সঙ্গে রাজনীতিক গুরুত্ব সমানে বাড়ছিল সেই ১৮১৫ সাল থেকেই। অনিচ্ছাভরে হলেও সরকারগুলি এই বুর্জোয়াদের অন্তত অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ বৈষয়িক স্বার্থগুলোর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি এমনটাও যথার্থই বলা চলে যে, বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংবিধানগুলিতে বুর্জোয়াকে যে রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিটি কণাই আবার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ এবং ১৮৩২ থেকে ১৮৪০ সালের প্রতিক্রিয়াশীলতার দুটো কালপর্যায়ে, তেমন প্রতিটি কণা বাবত ক্ষতিপূরণ করা হয়েছিল তাদের কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত ব্যবহারিক সুবিধা দিয়ে। বুর্জোয়াদের প্রত্যেকটা রাজনীতিক পরাজয়ের পিছু পিছু এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যিক আইন

প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের এক-একটা জয়। কোন খুদে ডিউক রাজ্যের ব্যবস্থাপরিষদে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে ভোট দিলে ঐ মন্ত্রীরা শুধু উপহাস করত, সেই অনাস্থা প্রকাশের অনিশ্চিত অধিকারের চেয়ে ১৮১৮ সালের প্রুশীয় সংরক্ষণ শুল্ক (৫) এবং 'জল্‌ফেরাইন' (Zollverein) (৬) চালু হওয়াটা জার্মান ব্যবসায়ী আর ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছে ঢের বেশি মূল্যবান ছিল নিশ্চয়ই। এইভাবে, সম্পদ বাড়তে-বাড়তে এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে-ঘটতে বুর্জোয়ারা শিগ্‌গিরই একটা পর্বে পৌঁছে দেখল, তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর পথে বাধা হল দেশের রাষ্ট্রিক গঠন — দেশ এলোমেলোভাবে বিভক্ত ছত্রিশটি রাজন্যের মধ্যে, তাদের পরস্পরের বিরোধী নানা প্রবণতা আর খামখেয়াল; বাধা হল কৃষির উপর এবং সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যের উপর সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল; বাধা হল বুর্জোয়াদের যাবতীয় কাজকারবারের উপর অজ্ঞ এবং উদ্ধত আমলাদের উঁকি-মারা পরিদর্শন। তার সঙ্গে সঙ্গে 'জল্‌ফেরাইন' প্রসারিত এবং পাকাপোক্ত হল, স্টীম যোগাযোগ চালু হল সর্বত্র, অন্তর্বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে চলল, তার ফলে বিভিন্ন রাজ্য আর প্রদেশের ব্যবসায়ী-ম্যানুফ্যাকচারার শ্রেণীগুলি পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে গেল, তাদের স্বার্থের সমতা ঘটল, কেন্দ্রীকৃত হল তাদের শক্তি। সেটার স্বাভাবিক পরিণতিতে তাদের গোটা জনরাশি চলে গেল উদারপন্থী প্রতিপক্ষ শিবিরে, আর রাজনীতিক ক্ষমতার জন্যে জার্মান বুর্জোয়াদের প্রথম ঐকান্তিক সংগ্রামে জিত হল। এই পরিবর্তনটার সূচনাকাল হিসেবে ধরা যেতে পারে ১৮৪০ সাল, যখন থেকে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা জার্মানির বুর্জোয়াদের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ১৮৪০-৪৭ সালের এই উদারপন্থী প্রতিপক্ষ আন্দোলনের কথায় আমরা ফিরে আসব পরে।

জাতির জনসমষ্টির বিপুল অংশটা ছিল অভিজাতও নয়, বুর্জোয়াও নয়, সেটা ছিল শহরে শহরে ছোট ব্যবসায়ী আর দোকানদার শ্রেণী এবং মেহনতী জন, আর গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের নিয়ে।

জার্মানিতে শ্রেণী হিসেবে বড় বড় পুঁজিপতি এবং ম্যানুফ্যাকচারারদের ব্যাহত বিকাশের পরিণতিতে সে দেশে ছোট ব্যবসায়ী আর দোকানদারদের শ্রেণীটা অত্যন্ত সংখ্যাবহু। অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলিতে বাসিন্দাদের প্রায়

অধিকাংশই এই শ্রেণীর মানুষ, আর প্রভাবের জন্যে আরও ধনী প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ছোট শহরগুলিতে এই শ্রেণীর প্রাধান্য পুরোপুরি। প্রত্যেকটা আধুনিক রাষ্ট্র সংগঠনে এবং প্রত্যেকটা আধুনিক বিপ্লবে অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শ্রেণী আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ জার্মানিতে, সেখানে সাম্প্রতিক সংগ্রামগুলির সময়ে সাধারণভাবে চূড়ান্ত ভূমিকায় এসেছে এই শ্রেণী। অপেক্ষাকৃত বড় বড় পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী আর ম্যানুফ্যাকচারারদের শ্রেণী, যথাযথভাবে বললে বুর্জোয়া শ্রেণী, এবং প্রলেতারিয়ানদের বা শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থান থেকে আসে ঐ শ্রেণীর প্রকৃতিটা। প্রথমটার অবস্থানে উঠতে আকাঙ্ক্ষী এই শ্রেণীর পৃথক পৃথক মানুষ সামান্য ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলেই ছিটকে গিয়ে পড়ে দ্বিতীয়টার কাতারে। রাজতান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজসভা আর অভিজাতদের প্রথা এটার অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক হয়ে পড়ে — এই ফরমাশদাতাদের লোকসান হলে এই শ্রেণীর একটা মস্ত অংশের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলিতে সামরিক গ্যারিসন, জেলা-বোর্ড, অনুগামীদের সমেত আদালত প্রায়ই এই শ্রেণীর সমৃদ্ধির ভিত্তি; সেগুলোকে সরিয়ে নিলে পড়ে যায় ছোট দোকানদার, দরজি, মুচি আর কাঠের মিস্ত্রিরা। এমনিভাবে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ শ্রেণীর কাতারে ঢুকবার আশা, আর প্রলেতারিয়ানের, কিংবা নিঃস্ব ফকিরেরই দশায় পড়ে যাবার আশঙ্কার মধ্যে; সাধারণের বিষয়াবলি পরিচালনায় অংশীদারি জিতে নিয়ে নিজেদের স্বার্থের উন্নতিবিধানের আশা, আর তাদের সেরা খদ্দেরদের ভাগিয়ে দেবার ক্ষমতা সরকারের আছে বলে, সেই যে-সরকার তাদের অস্তিত্বেরই নিয়ন্তা, অসময়োচিত বিরোধিতা দিয়ে সেটাকে কুপিত করার আতঙ্কের মধ্যে সদা-দোদুল্যমান এই শ্রেণী, যেটার সংগতি-সংস্থান সামান্য, আর সেই মালিকানার নিরাপত্তাহীনতা সেটার পরিমাণের বিপরীত অনুপাতে, এই শ্রেণীটার মতামত অত্যন্ত ইতস্তত দোলায়মান। শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক কিংবা রাজতান্ত্রিক সরকারের আমলে অবনমিত এবং হীনানুগত এই শ্রেণীটা বুর্জোয়াদের ক্ষমতা উঠতি হতে থাকলে ঘোরে উদারপন্থার দিকে; যেইমাত্র বুর্জোয়ারা নিজ আধিপত্য হাসিল করে অমনি এটার প্রচণ্ড গণতান্ত্রিক আস্ফালন শুরু হয়ে যায়, কিন্তু নিজের নিচের শ্রেণীটা, প্রলেতারিয়ানরা তাদের স্বতন্ত্র আন্দোলনের

চেষ্টা শুরু করতে-না-করতেই এটা ভয়ের শোচনীয় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পিছিয়ে যায়। জার্মানিতে এইসব পর্বের একটা থেকে অন্যটায় এই শ্রেণীর পর্যায়ক্রমে পার হয়ে যাওয়াটা আমরা দেখব ক্রমে ক্রমে।

সামাজিক আর রাজনীতিক বিকাশের দিক থেকে জার্মানির শ্রমিক শ্রেণী ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর পিছনে ততটাই দূরে পড়ে আছে যতটা পিছনে জার্মান বুর্জোয়ারা রয়েছে ঐ দুই দেশের বুর্জোয়াদের থেকে। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য: সংখ্যাবহু, শক্তিশালী, জড়ো-হওয়া এবং কুশল প্রলেতারিয়ান শ্রেণীর জীবনযাত্রার অবস্থার ক্রমবিকাশ চলে সংখ্যাবহু, ধনী, জড়ো-হওয়া এবং শক্তিশালী বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নয়নের সমান তালে। বুর্জোয়াদের সমস্ত পৃথক পৃথক মহল, বিশেষত শ্রেণীটার সবচেয়ে উন্নতিশীল মহল বড় ম্যানুফ্যাকচারাররা রাজনীতিক ক্ষমতা জয় করে নিজেদের চাহিদাগুলো অনুসারে রাষ্ট্রটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন করে গড়ে তোলে, খাস শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনই কখনও স্বাধীন হয় না, সেটার প্রকৃতি কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রলেতারিয়ান হয়ে ওঠে না। মালিক আর কর্মীদের অনিবার্য সংঘাতটা আসন্ন হয়ে ওঠে তখনই, সেটাকে আর মুলতবি রাখা যায় না; যা কখনও পূরণ হবার নয় এমনসব ভুয়ো আশা আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে আর নিরস্ত করা যায় না; উনিশ শতকের বিরাট সমস্যা — প্রলেতারিয়েত লোপ করার সমস্যা — অবশেষে স্পষ্ট এবং সঠিকভাবে প্রকাশ পায়। আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং সম্রাটদের অতি চমৎকার-সব নমুনা পাওয়া যায় গ্রেট বৃটেনে, কিন্তু জার্মানিতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান অংশটার নিয়োগকর্তা তারা ছিল না, এই নিয়োগকর্তারা ছিল ছোট ছোট কারিগর-ব্যবসায়ীরা, এদের গোটা ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগের অবশেষমাত্র। মস্ত মস্ত তুলো সম্রাট আর খুদে মুচি কিংবা ওস্তাদ দরজির মধ্যে যেমন বিপুল ব্যবধান, তেমনি দূরত্ব আছে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যাবিলনগুলির তীক্ষ্ম চতুর কারখানা-কর্মীদের থেকে কোন গ্রামাঞ্চলের খুদে শহরের লাজুক জার্নিম্যান দরজি কিংবা আসবাবপত্রের ছুতোরমিস্ত্রির, এরা যে পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে সেগুলো শ'-পাঁচেক বছর আগেকার তাদের ধরনের মানুষের চেয়ে বড় একটা পৃথক নয়। জীবনযাত্রার আধুনিক পরিবেশ, শিল্পোৎপাদনের আধুনিক প্রণালীর এই

সর্বৈব অভাবের সঙ্গে অবশ্য ছিল আধুনিক ভাব-ধারণারও মোটামুটি সমানই সমগ্র অভাব, কাজেই বিপ্লবের শুরুতে মেহনতী শ্রেণীগুলির একটা বড় অংশ গিল্ড এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত বৃত্তিগত কর্পোরেশনগুলি অবিলম্বে পুনঃস্থাপনের জন্যে হাঁক ছাড়ল, সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। তবু, ম্যানুফ্যাকচারিং এলাকাগুলিতে উৎপাদনের আধুনিক প্রণালীর প্রাধান্য ছিল, বহুসংখ্যক ভ্রমণশীল মেহনতীজনের থেকে জুটেছিল মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা আর মানসিক বিকাশ, ফলে গড়ে উঠেছিল একটা তাকতদার কেন্দ্রী অংশ, নিজেদের শ্রেণীর মুক্তি সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণা ছিল অনেক বেশি স্পষ্ট এবং বিদ্যমান আর ইতিহাসনির্দিষ্ট চাহিদাগুলোর অপেক্ষাকৃত অনুযায়ী; কিন্তু তারা ছিল ঊনজনমাত্র। বুর্জোয়াদের সক্রিয় আন্দোলনের সূচনা-কাল ১৮৪০ সাল ধরলে, শ্রমিক শ্রেণীর বেলায় সেটা আবির্ভাবের সূত্রপাত করে ১৮৪৪ সালে (৭) সাইলেসিয়ায় আর সহেমিয়ায়* কারখানা মজুরদের অভ্যুত্থান; যেসব পর্ব পার হয়ে চলেছিল এই আন্দোলন সেটা পর্যালোচনা করার উপলক্ষ আমাদের হবে একটু পরেই।

শেষে, ছিল ছোট খামারীদের, কৃষকদের বিরাট শ্রেণীটা; খেতমজুর লেজুড়টা সমেত এই শ্রেণীটার মানুষ ছিল সমগ্র জাতির অধিকাংশ। কিন্তু বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল এই শ্রেণীটা। ছিল প্রথমত, কিছুটা সম্পন্ন খামারীরা, জার্মানিতে তাদের বলা হয় Gross-আর Mittelbauern** তারা কমবেশি বড় বড় খামারের মালিক, তারা প্রত্যেকে কয়েক জন করে খেতমজুর খাটাত। করমুক্ত বড় বড় সামন্ত ভূস্বামীরা, আর ছোট কৃষক এবং খেতমজুরেরা — এই দুইয়ের মাঝামাঝি ছিল ঐ শ্রেণীটার স্থান; এই শ্রেণীটা শহরের সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীজোটকে অতি স্বাভাবিক রাজনীতিক পন্থা হিসেবে ধরেছিল স্পষ্টপ্রতীয়মান কারণেই। আর ছিল, দ্বিতীয়ত, ছোট ছোট লাখেরাজদার কৃষক, তারা সংখ্যাবহু ছিল রাইন অঞ্চলে, সেখানে সামন্ততন্ত্র ঘায়েল হয়েছিল ফরাসী মহাবিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে। অন্যান্য প্রদেশেও এখানে-ওখানে ঐরকমের স্বাধীন

---

* চেক্। — সম্পাঃ

** বড় আর মাঝারি কৃষক। — সম্পাঃ

ছোট ছোট কৃষক ছিল — যেসব জায়গায় তারা তাদের জমির উপর আগেকার সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা বাবত টাকা মিটিয়ে দিতে পেরেছিল। এই শ্রেণীটা কিন্তু লাখেরাজদারদের ছিল শুধু নামেই, সাধারণত তাদের সম্পত্তি এমন পরিমাণে এবং এমন গুরুভার শর্তে বন্ধক থাকত যাতে কৃষক নয়, যে টাকা ধার দিত সেই মহাজনই হত জমির আসল মালিক। তৃতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক প্রজারা, জমা থেকে তাদের সহজে উচ্ছেদ করা যেত না, কিন্তু তাদের চিরস্থায়ী খাজনা দিতে হত কিংবা খাস জমিদারির মালিকের জন্যে কিছু পরিমাণ খাটতে হত তেমনি বরাবর। শেষে, খেতমজুর। বহু বড় খামারে তাদের অবস্থা ছিল হুবহু ইংলন্ডের একই শ্রেণীর অবস্থার মতো, সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা গরিবি হালে কম খেয়ে মনিবের দাস-দশায় জীবনযাত্রা চালিয়ে সেই অবস্থায়ই মরত। কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টির এই শেষের তিনটে শ্রেণী — ছোট লাখেরাজদার, সামন্ততান্ত্রিক প্রজা আর খেতমজুরেরা — বিপ্লবের আগে কখনও রাজনীতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না, কিন্তু স্পষ্টতই এই ঘটনাটা নিশ্চয়ই তাদের জন্যে খুলে দিল জীবনের নতুন ধারা, যেটা উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ঠাসা। বিপ্লব তাদের প্রত্যেকের সামনে বিভিন্ন সুযোগ তুলে ধরল; মনে করা যায়, আন্দোলন একবারে ঠিকমতো লেগে গেলে তাতে তারা শামিল হবে প্রত্যেকেই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্টপ্রতীয়মান এবং সমস্ত আধুনিক দেশের ইতিহাস থেকেও দেখা গেছে যে, বিশাল অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকার দরুন এবং তাদের কোন মোটারকমের অংশে মতৈক্য ঘটান দুষ্কর হবার ফলে কৃষিক্ষেত্রের জনসমষ্টি কখনও সার্থক স্বাধীন আন্দোলনের চেষ্টা করতে পারে না; অপেক্ষাকৃত একত্রে জড়ো-হওয়া, অপেক্ষাকৃত শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত, অপেক্ষাকৃত সহজে যারা নড়েচড়ে, সেই শহরের মানুষের প্রবর্তক প্রেরণা তাদের আবশ্যক হয়।

সাম্প্রতিক আন্দোলন শুরু হবার সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব শ্রেণীর সাকল্যটা ছিল জার্মান জাতি সেগুলি সম্বন্ধে একটু আগে দেওয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণই ঐ আন্দোলনে বিদ্যমান অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্য এবং প্রতীয়মান দ্বন্দ্ব-অসংগতির অনেকটার ব্যাখ্যার জন্যে যথেষ্ট। এতই বিবিধ, এতই বিরুদ্ধ, এতই পরস্পরের বিপরীত বিভিন্ন স্বার্থ যখন প্রচন্ড বিরোধে অবতীর্ণ হয়; এইসব দ্বন্দ্বরত স্বার্থ যখন প্রত্যেকটা এলাকায়, প্রত্যেকটা

প্রদেশে তালগোল প্যাকিয়ে যায় বিভিন্ন অনুপাতে; সর্বোপরি যখন দেশে থাকে না কোন মস্ত কেন্দ্র, থাকে না কোন লন্ডন, কোন প্যারিস, যেটার সিদ্ধান্ত সেটার গুরুত্বের প্রভাব দিয়ে প্রত্যেকটা এলাকায় একই বিবাদ বারংবার লড়বার আবশ্যকতা দূর করতে পারে — যে লড়াইয়ে বিপুল পরিমাণ রক্ত, কর্মশক্তি আর পুঁজি ঢালা হল সেটা অসংখ্য বিচ্ছিন্ন সংগ্রামে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, সবকিছু সত্ত্বেও লড়াইয়ে কোন নিষ্পত্তির ফল ফলে না, তাছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে?

তিন ডজন কমবেশি গুরুত্বসম্পন্ন রাজ্যে জার্মানির রাজনীতিক খন্ড-বিখন্ড অবস্থাটাও সমানই বোধগম্য হয় এই ব্যাপারটা থেকে: জাতির অঙ্গ-উপাদানগুলি তালগোল পাকান এবং বহুতর, ঐসব উপাদান আবার প্রত্যেকটা এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন। যেখানে সমস্বার্থ থাকে না সেখানে কোন লক্ষ্যের ঐক্য থাকতে পারে না, কর্মের ঐক্য তো নয়ই। জার্মান কনফেডারেশনকে (৮) চির-অটুট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল বটে, তবু এই কনফেডারেশন এবং সেটার ডায়েট (৯) কখনও জার্মান ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ হয় নি। জার্মানিতে কেন্দ্রীকরণ সর্বকালের মধ্যে যে সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠেছিল সেটা হল 'জল্‌ফেরাইন'-এর স্থাপনা; এটা দিয়ে উত্তর সাগরের পাড়ের রাজ্যগুলিকেও জোর করে ঢোকান হয়েছিল তাদের নিজস্ব কাস্টম্‌স ইউনিয়নে (১০); তখন অস্ট্রিয়া থেকে গিয়েছিল নিজস্ব পৃথক নিবারক শুল্ক মুড়ি দিয়ে। ছত্রিশটার জায়গায় কার্যত মাত্র তিনটে স্বাধীন শক্তিতে বিভক্ত হল, এটাই ছিল জার্মানির সন্তোষের কারণ। রুশী জারের* ১৮১৪ সালে স্থাপিত সর্বোচ্চ আধিপত্য অবশ্য তাতে করে একটুও পরিবর্তিত হয় না।

আমাদের সিদ্ধান্তসূত্র থেকে এইসব প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বের করার পরে আমরা আমাদের পরের কিস্তিতে দেখব জার্মান জাতির উল্লিখিত শ্রেণীগুলি একের পর এক সচল হয়ে উঠেছিল কিভাবে, আর এই বিচলন কোন্‌ প্রকৃতি ধারণ করেছিল ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লব শুরু হবার সময়ে।

লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

---

* প্রথম আলেক্সান্দর। — সম্পাঃ

প্রাশিয়া রাষ্ট্র

জার্মানিতে মধ্য শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনীতিক আন্দোলন শুরুর সময় ধরা যেতে পারে ১৮৪০ সাল। তার আগে বিভিন্ন লক্ষণ থেকে দেখা গিয়েছিল, দেশটির ধনবান এবং শিল্প-মালিক শ্রেণীটি এত পরিমাণে পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল যাতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-আমলাতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের চাপে তারা আর অনীহ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারত না। জার্মানির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজন্যরা একে-একে কমবেশি উদারপন্থী ধরনের নিয়মতন্ত্র মঞ্জুর করল — অংশত, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের নিজ নিজ রাজ্যে অভিজাতকুলের প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে, আর অংশত, ভিয়েনা কংগ্রেস (১১) তাদের শাসনাধীনে সম্মিলিত করল যেসব বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সেগুলোকে সমগ্র সত্তা হিসেবে পাকাপোক্ত করার জন্যে। নিজেদের কোন বিপদ ছাড়াই তারা এটা করতে পারল, কেননা তারা জানত, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার নিছক ক্রীড়াপুত্তলিকা কনফেডারেশনের ডায়েট তাদের সার্বভৌমত্বের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করলে তারা সেটার নির্দেশগুলির প্রতিরোধ করার কাজে জনমত এবং ব্যবস্থাপরিষদগুলির সমর্থন পাবে; আর উল্টে ব্যবস্থাপরিষদগুলি বড় বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলে সমস্ত বিরোধিতা চূর্ণ করার জন্যে তারা কনফেডারেশনের ডায়েটের ক্ষমতা লাগাতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে। এমন পরিস্থিতিতে ব্যাভেরিয়া, ভ্যুর্টেমবের্গ, বাডেন আর হানোভারের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি রাজনীতিক ক্ষমতার জন্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের উদ্ভব ঘটাতে পারত না, কাজেই বিভিন্ন খুদে রাজ্যের বিধানপরিষদগুলিতে উত্থাপিত ঝগড়া-বিবাদ থেকে খুবই সাধারণভাবে দূরে থেকে গেল জার্মান বুর্জোয়াদের বিরাট অংশটা, তাতে তারা বেশ ভালভাবেই জানত যে, জার্মানির দুটো বৃহৎ শক্তির কর্মনীতিতে আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বুনিয়াদী পরিবর্তন ছাড়া কোন গৌণ প্রচেষ্টা এবং জয়ে কোন ফায়দা হবে না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে, এইসব খুদে পরিষদে গজিয়ে উঠল উদারপন্থী ব্যবহারজীবী,

প্রতিপক্ষবাদীদের একটা পেশাদার গোষ্ঠী: রোট্টেকরা, ভেল্কাররা, রোয়েমাররা, জর্ডানরা, স্ট্যুভেরা, আইসেনমানরা, সেই মহা 'জনপ্রিয় লোকেরা' (Volksmänner), যাঁরা বিশ বছরের কমবেশী কোলাহলময় কিন্তু সর্বদাই অকৃতকার্য প্রতিপক্ষীয়তার পরে ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক জোয়ারে ক্ষমতার শিখরে উন্নীত হয়ে সেখানে নিজেদের চূড়ান্ত অক্ষমতা আর তুচ্ছতা দেখিয়ে আবার ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন অচিরে। জার্মানির মাটিতে রাজনীতি আর প্রতিপক্ষীয়তার ব্যাপারীদের প্রথম প্রথম নমুনা এ'রা, বক্তৃতা আর লেখাগুলিতে এ'রা নিয়মতান্ত্রিকতার ভাষাটাকে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছিলেন জার্মানদের কানে; আর নিজেদের জীবনযাত্রা দিয়েই এ'রা একটা সময় কাছিয়ে আসার পূর্বলক্ষণ দেখিয়েছিলেন, যখন আসল অর্থ সম্বন্ধে বিশেষকিছু না জানা এইসব বাচাল অ্যাটর্নি আর প্রফেসরদের ব্যবহৃত রাজনীতিক কথাগুলিকে লুফে নিয়ে সেগুলিকে সঠিক অর্থে ব্যবহার করবে বুর্জোয়ারা।

১৮৩০ সালের ঘটনাবলি (১২) সারা ইউরোপকে ফেলে দিয়েছিল যে রাজনীতিক উত্তেজনার মধ্যে সেটার প্রভাবে সক্রিয় হয়েছিল জার্মান সাহিত্যও। তখনকার প্রায় সমস্ত লেখকই প্রচার করত একটা স্থূল নিয়মতান্ত্রিকতা, কিংবা আরও স্থূল প্রজাতন্ত্রবাদ। রচনাদিতে নিপুণতার ঘাটতি মেটাবার জন্যে রাজনীতিক ইঙ্গিতে ক্রমাগত বেশি পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল বিশেষত নিকৃষ্ট ধরনের লেখক-সাহিত্যিকরা, কেননা রাজনীতিক ইঙ্গিত মনোযোগ আকর্ষণ করবে সেটা নিশ্চিত ছিল। কবিতায়, উপন্যাসে, পর্যালোচনায়, নাটকে, প্রত্যেকটা সাহিত্যিক রচনায় গিজগিজ করত যাকে বলা হত 'প্রবণতা', অর্থাৎ সরকারবিরোধী মেজাজের কমবেশি ভীতু প্রকাশ। জার্মানিতে ১৮৩০ সালের পরে বিরাজমান ভাব-ভাবনার বিভ্রান্তিটা ষোল-কলা পূর্ণ হল যখন রাজনীতিক বিরোধিতার এইসব উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ে বদহজম করা জার্মান দর্শনের স্মৃতি এবং ফরাসী সমাজতন্ত্রের, বিশেষত সাঁ-সিমোঁবাদের টুকরোটাকরা। ভাব-ভাবনার এই জগাখিচুড়ি নিয়ে যাদের কারবার, লেখকদের সেই ঘোঁটটা গাল-ভরা নাম ধারণ করল 'নবীন জার্মানি' বা 'আধুনিক সম্প্রদায়' (১৩)। বয়োদোষের জন্যে তারা পরে অনুশোচনা করে, কিন্তু তাদের রচনাশৈলীর উন্নতি হয় নি।

শেষে, জার্মান দর্শন — অতি জটিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জার্মান মানস

বিকাশের সবচেয়ে নিশ্চিত এই উষ্ণমাপকটি বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল যখন হেগেল তাঁর 'আইনের দর্শন'-এ বলেছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ধরনের শাসন। অর্থাৎ কিনা, রাজনীতিক ক্ষমতায় দেশের বুর্জোয়াদের আসন্ন আগমনের কথা তিনি ঘোষণা করলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর মতসম্প্রদায় সেখানেই থেকে যায় না। তাঁর অনুগামীদের অপেক্ষাকৃত আগুয়ান অংশটা একদিকে কঠোর সমালোচনার কঠিন পরীক্ষায় ফেলল প্রত্যেকটা ধর্মমতকে, খৃষ্ট ধর্মের প্রাচীন কাঠামটার ভিত্তিমূলে ধরে নাড়া দিল, তার সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরল বিভিন্ন রাজনীতিক মূলনীতি, যেগুলি তদবধি জার্মানির মানুষ যেমনটা বিবৃত হতে শুনেছে তার চেয়ে দুঃসাহসিক, আর প্রথম ফরাসী বিপ্লবের বীর-নায়কদের গৌরবমণ্ডিত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করল। এইসব ভাব-ভাবনা জড়ান থাকত দুর্বোধ্য দার্শনিক ভাষায়, সেটা লেখক আর পাঠক উভয়ের মন যেমন ঝাপসা করে আনত, তেমনি সমানই ধাঁধিয়ে দিত সেন্সরের চোখ, এইভাবেই 'তরুণ হেগেলবাদী' লেখকেরা সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা পেয়েছিল তেমনটা সাহিত্যের অন্য সমস্ত শাখায় ছিল অজ্ঞাত।

জার্মানিতে জনমতের মস্ত পরিবর্তন ঘটছিল, সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল এইভাবে। যেসব শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষায় কিংবা জীবনে প্রতিষ্ঠা এমন ছিল যাতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অধীনেও কিছুটা রাজনীতিক জ্ঞান পাওয়া এবং স্বাধীন রাজনীতিক অভিমত গোছের কিছু গড়ে তোলা সম্ভব সেগুলির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একটু একটু করে সম্মিলিত হয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছিল পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষব্যূহ। জার্মানিতে রাজনীতিক বিকাশের মন্থরতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে গিয়ে প্রত্যেকের অবশ্যই বিবেচনায় রাখা দরকার এই কথাটা: যে দেশে সংবাদ-তথ্যাদির সমস্ত উৎস সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, যেখানে গরিবদের অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং রবিবারের বিদ্যালয় থেকে সংবাদপত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত আগে সরকারী অনুমোদন ছাড়া বলা, শেখান, ছাপান কিংবা প্রকাশিত হত না কিছুই, সেখানে যেকোন বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া কত দুষ্কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভিয়েনার দিকে চেয়ে দেখুন। মেহনত আর শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যে ভিয়েনার মানুষ বোধহয় জার্মানিতে কারও চেয়ে খাটো নয়, এবং উৎসাহ-

উন্দীপনা, সাহস আর বৈপ্লবিক কর্মশক্তিতে তারা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত, অথচ নিজেদের আসল স্বার্থের ব্যাপারে তারা ছিল অন্য সবার চেয়ে অজ্ঞ, বিপ্লবের সময়ে তারা ভুল করেছিল আর সবার চেয়ে বেশি। অতি মামুলি রাজনীতিক বিষয়গুলো সম্বন্ধেও মেটারনিখ সরকার তাদের প্রায় ষোল-আনা অজ্ঞ রাখতে পেরেছিল, এটাই বহুলাংশে তার কারণ।

আর কোন ব্যাখ্যা ছাড়াও বোঝা যায় কেন এমন ব্যবস্থার অধীনে রাজনীতিক তথ্যাদিতে প্রায় সম্পূর্ণ একচেটে ছিল সমাজের এমনসব শ্রেণীর যেগুলি সেই তথ্য গোপনে আমদানি করার খরচ যোগাতে পারত, আরও বিশেষত বিদ্যমান অবস্থার সবচেয়ে গুরুতর আঘাত পড়ছিল যাদের স্বার্থের উপর, অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যিক শ্রেণীর। কাজেই, কমবেশি প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্র চালু থাকার বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রথমে তারাই; প্রতিপক্ষের কাতারে তাদের শামিল হওয়া থেকেই ধরতে হবে জার্মানিতে আসল বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হবার সময়।

জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিপক্ষীয় ঘোষণাপত্রের সময় ধরা যেতে পারে ১৮৪০ সাল থেকে, প্রাশিয়ার প্রয়াত রাজার* মৃত্যুর সময় থেকে; ১৮১৫ সালের 'পবিত্র মৈত্রী'র (১৪) প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে কেবল তিনিই বেঁচে ছিলেন। জানা ছিল যে, নতুন রাজা তাঁর পিতার আমলাতন্ত্র আর সামরিকতার প্রাধান্যের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। ১৬শ লুইয়ের অভ্যাগম থেকে ফরাসী বুর্জোয়ারা যা প্রত্যাশা করেছিল, কিছু পরিমাণে তাই প্রুশীয় ৪র্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের কাছে আশা করেছিল জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী। পুরন ব্যবস্থাটা ফেটে পড়েছিল, সেটা ছিল জীর্ণ, সেটাকে পরিত্যাগ করা চাই, এবিষয়ে সর্বদিক থেকে সবাই একমত ছিল, পুরন রাজার আমলে যেটাকে নীরবে বরদাস্ত করা হয়েছিল সেটা তখন অসহ্য বলে ঘোষণা করা হল উচ্চৈঃস্বরে।

কিন্তু যেখানে ১৬শ লুই, 'Louis-le-Desire' (ঈপ্সিত লুই) ছিলেন সাদাসিধে, নিরহঙ্কার বোকারাম, নিজের অকার্যকরতা সম্বন্ধে অর্ধ-সচেতন, তাঁর কোন নির্দিষ্ট মতামত ছিল না, তিনি শাসন চালাতেন

* ৩য় ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

প্রধানত শিক্ষাকালে গঠিত অভ্যাস অনুসারে, 'ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্‌ম-le Desire' ছিলেন একেবারেই ভিন্ন কিছু। চরিত্রের ক্ষীণতার দিক থেকে তিনি তাঁর ফরাসী আদিরূপটিকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিরহঙ্কারও ছিলেন না, মতামতহীনও ছিলেন না। বেশির ভাগ বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি শখের গোছের ধরনে অবগত হয়েছিলেন, কাজেই ভাবতেন তিনি যা বিদ্বান্ তাতে প্রত্যেকটা বিষয়ে নিজ মীমাংসাকে তিনি চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে পারেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী, আর বার্লিনে কোন ভ্রমণরত ক্যানভ্যাসার ভান-করা বুদ্ধির দীর্ঘ ক্লান্তিকর কথায় কিংবা অলঙ্কারপূর্ণ বাকপটুতায় তাঁকে নিশ্চয়ই হার মানাতে পারত না। সর্বোপরি, তাঁর নিজের মতামত ছিল। প্রুশীয় রাজতন্ত্রের আমলাতান্ত্রিক উপাদানটাকে তিনি ঘৃণা করতেন, অবজ্ঞা করতেন, কিন্তু তার একমাত্র কারণ তাঁর সমস্ত সহানুভূতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক উপাদানটার প্রতি। তিনি নিজে ছিলেন 'Berliner politisches Wochenblatt' (১৫) (বার্লিন রাজনীতিক সাপ্তাহিক)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাতে প্রধান লেখক; তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তথাকথিত ঐতিহাসিক সম্প্রদায়-এর (১৬) (এই সম্প্রদায়ের উপজীব্য ছিল বোনাল্ড, দ্য' মাইস্ত্র এবং ফরাসী লেজিটিমিস্টদের (১৭) প্রথম পুরুষের অন্যান্য লেখকদের ভাব-ধারণা), সেইভাবে অভিজাতকুলের প্রাধান্যশালী সামাজিক অবস্থান যতখানি সম্ভব পুরোপুরি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। ৪র্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌ম যে 'চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত ধারণা'টি বাস্তবায়িত করবার কাজ হাতে নিয়েছিলেন এবং বাস্তবায়িত করতে এখন আবার চেষ্টা করছেন সেটা এইরকমের: রাজ্যের পহেলা অভিজাত রাজা, তিনি প্রথম পর্যায়ে সামন্ত, প্রিন্স, ডিউক আর কাউন্টদের জমকাল রাজদরবার দিয়ে পরিবেষ্টিত; দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁকে ঘিরে সংখ্যাবহু ধনী অধস্তন অভিজাতকুল; রাজভক্ত বার্গার আর কৃষকদের উপর শাসন চলবে তাঁর মর্জিমাফিক, এইভাবে নিজে হবেন বিভিন্ন সামাজিক বর্গ বা পঙক্তির একটা সমগ্র ক্রমবিভাগতন্ত্রের প্রধান, ঐসব পদ বা পঙক্তির প্রত্যেকটার থাকবে নির্দিষ্ট বিশেষাধিকার, প্রত্যেকটাকে অন্যগুলি থেকে পৃথক করে রাখবে জন্ম কিংবা স্থিরীকৃত, অপরিবর্তনীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রায় অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধ; তার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত

পঙক্তি বা 'রাজ্যের বর্গসমূহ' ক্ষমতা আর প্রভাবের দিক থেকে এমন চমৎকারভাবে পরস্পরের ভারসাম্য রক্ষা করবে যাতে কার্যকরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে রাজার।

প্রুশীয় বুর্জোয়ারা তত্ত্বগত প্রশ্নাবলিতে খুব বিদিত ছিল না — তাদের রাজার প্রবণতাটার আসল মর্ম বুঝতে তাদের কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই তারা বুঝতে পেরেছিল রাজা এমনসব ব্যাপারে বদ্ধপরিকর যেগুলো তারা যা চায় সেটার একেবারে বিপরীত। পিতার মৃত্যুর ফলে নিজ 'বাকপটুতা' শৃঙ্খলমুক্ত হতে-না-হতেই নতুন রাজা অগুন্তি বক্তৃতায় তাঁর অভিপ্রায় ঘোষণা করতে লেগে গিয়েছিলেন; তাঁর প্রত্যেকটা বক্তৃতা, প্রত্যেকটা কাজের ফলে তাঁর প্রতি বুর্জোয়াদের সহানুভূতি সরে যাচ্ছিল আরও দূরে। কিছু কিছু কঠোর এবং চমকপ্রদ বাস্তবতা তাঁর কাব্যিক স্বপ্নগুলোয় ব্যাঘাত না ঘটালে ওসব তিনি গ্রাহ্য করতেন না। হায়, কল্পনাবিলাসিতা হিসাবে তেমন দড় নয়, আর ডন্ কুইক্সোটের পর থেকে বরাবর সামন্ততন্ত্র সামনে চলতে জানে না! নগদ টাকা সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য বরাবরই ধর্মযোদ্ধাদের সন্তানসন্ততির সবচেয়ে দরাজ উত্তরাধিকার, সেটা বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছিল ৪র্থ ফ্রিডরিখ ভিলহেল্‌মের। গদি লাভ করার সময়ে তিনি পেয়েছিলেন হিসাব ক'রে ব্যবস্থিত হলেও ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা এবং পরিমিতভাবে পূর্ণ রাজকোষ। রাজসভার পরব, রাজকীয় শোভাযাত্রা, অনুগ্রহবিতরণ, অভাবী বদস্বভাবী আর লোভী অভিজাতদের জন্যে অর্থসাহায্য, ইত্যাদি বাবত রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থের শেষ কপর্দকও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল দু'বছরে। তখন রাজদরবার কিংবা সরকার কোনটার জরুরী প্রয়োজনের জন্যে নিয়মিত কর আর যথেষ্ট নয়। এইভাবে হিজ্ ম্যাজেস্টি অচিরেই দেখলেন, তাঁর একদিকে রয়েছে দগদগে ঘাটতি, আর অন্যদিকে ১৮২০ সালের একটা আইন, তাতে 'ভবিষ্য জন-প্রতিনিধিত্বের' অনুমোদন ছাড়া নতুন ঋণগ্রহণ কিংবা বিদ্যমান কর বাড়ান বেআইনী। এই প্রতিনিধিত্ব ছিল না; সেটা সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি নতুন রাজার ছিল বাপের চেয়েও কম; সে-প্রবৃত্তি যদি তাঁর হত তাহলে তিনি বুঝতেন তাঁর গদি পাবার পর থেকে জনমতের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

বাস্তবিকপক্ষে, বুর্জোয়ারা অংশত আশা করেছিল নতুন রাজা

সঙ্গেসঙ্গেই নিয়মতন্ত্র চালু করবেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির বিচার, ইত্যাদি ঘোষণা করবেন — সংক্ষেপে, রাজনীতিক প্রাধান্যলাভের জন্যে তারা যা চেয়েছিল সেই শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবেন রাজা নিজেই — তারা নিজেদের ভুল বুঝে দুর্দান্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল রাজার বিরুদ্ধে। রাইন প্রদেশে এবং কমবেশি সাধারণভাবে সারা প্রাশিয়ায় তারা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যাতে পত্র-পত্রিকাজগতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাদের নিজেদের উপযুক্ত লোক কম ছিল বলে তারা চরমপন্থী দার্শনিক দলের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ পর্যন্ত হয়েছিল, যে-বিষয়ে আমরা আগে বলেছি। এই মৈত্রীর ফল হয়েছিল কলোন্-এর 'Rheinische Zeitung' (১৮), যে-পত্রিকাটিকে পনর মাস চলার পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বলা যেতে পারে জার্মানিতে সংবাদপত্র প্রেসের অস্তিত্ব তখন থেকে। এটা ছিল ১৮৪২ সালে।

বেচারা রাজার লেনদেনের দুষ্করতা হল তাঁর মধ্যযুগীয় ঝোঁকগুলোর উপর প্রখরতম বিদ্রূপ-বাণ, তিনি অচিরেই বুঝলেন, 'জন-প্রতিনিধিত্বে'র জন্যে সাধারণের সোরগোলের ব্যাপারে সামান্যকিছু সুবিধে না দিয়ে রাজত্ব চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় -- সেই যে 'জন-প্রতিনিধিত্ব' হল ১৮১৩ আর ১৮১৫ সালের দীর্ঘ-বিস্মৃত প্রতিশ্রুতির অবশেষ, যেটা অঙ্গীভূত ছিল ১৮২০ সালের আইনে। এই অসুবিধাজনক আইনটা পালনের সবচেয়ে কম আপত্তিকর ধরনটা তিনি বের করলেন -- বিভিন্ন প্রাদেশিক ডায়েটের স্থায়ী কমিশনগুলিকে তিনি একত্রে বসালেন। প্রাদেশিক ডায়েটগুলো স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৩ সালে। রাজ্যের আটটা প্রদেশের প্রত্যেকটার ডায়েট গঠিত ছিল নিম্নলিখিতদের নিয়ে: ১। ঊর্ধ্বতন অভিজাতকুল, জার্মান সাম্রাজ্যের প্রাক্তন রাজ-পরিবারগুলো, সেইসব পরিবারের কর্তারা ডায়েটের সদস্য ছিল জন্মাধিকারবলে; ২। নাইটদের প্রতিনিধিরা বা নিম্নতন অভিজাতকুল; ৩। শহরগুলির প্রতিনিধিরা; এবং ৪। কৃষককুল বা ছোট খামারী শ্রেণীর ডেপুটিরা। গোটা জিনিসটা এমনভাবে সাজান ছিল যাতে প্রত্যেকটা প্রদেশের ডায়েটে অভিজাতকুলের দুটো অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। আটটা প্রাদেশিক ডায়েটের প্রত্যেকটা নির্বাচিত করত একটা কমিশন, এখন বহু-আকাঙ্ক্ষিত ঋণ ভোটে পাস করাবার উদ্দেশ্যে ঐ আটটা কমিশনকে বার্লিনে ডাকা হল প্রতিনিধি পরিষদ হিসেবে গঠিত হবার জন্যে। বলা হয়েছিল রাজকোষ পূর্ণ,

ঋণটা আবশ্যক ছিল চলতি চাহিদার জন্যে নয় — একটা রেলপথ নির্মাণের জন্যে। কিন্তু সম্মিলিত কমিশনসমূহ (১৯) সোজা 'না' জবাব দিয়েছিল রাজাকে, তারা বলেছিল জন-প্রতিনিধিবৃন্দ হিসেবে কাজ করার আইনগত যোগ্যতা তাদের ছিল না; হিজ্ ম্যাজেস্টিকে তারা বলেছিল, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জনগণের সহায়তা চাইবার সময়ে তিনি যে জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সংবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা এই রাজা পালন করুন।

সম্মিলিত কমিশনসমূহের অধিবেশনে প্রমাণিত হয়েছিল যে, বিরোধিতার মনোভাব বুর্জোয়াদেরই মধ্যে আর গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। কৃষকদের একাংশ তাদের সঙ্গে শামিল হয়েছিল; আর বহু অভিজাত ছিল নিজেদের তালুকে বড় বড় খামারী আর তারা ছিল শস্য, পশম, স্পিরিট আর ক্ষৌমের কারবারি, তাদের একই রকমের গ্যারাণ্টি প্রয়োজন ছিল স্বৈরতন্ত্র আর আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে, তারা সরকারের বিরুদ্ধে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংবিধানের পক্ষে সমানই মতপ্রকাশ করেছিল। লক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হল রাজার পরিকল্পনা; তিনি টাকা পেলেন না, কিন্তু বাড়িয়ে তুললেন প্রতিপক্ষের ক্ষমতা। বিভিন্ন ডায়েটের পরবর্তী অধিবেশনগুলি হয়েছিল রাজার পক্ষে আরও দুর্ভাগ্যজনক। সেগুলি সবই চেয়েছিল বিভিন্ন সংস্কার, ১৮১৩ আর ১৮১৫ সালের প্রতিশ্রুতি পালন, সংবিধান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; কোন কোন ডায়েটে ঐ মর্মে গৃহীত প্রস্তাবগুলির ভাষা ছিল একটু অশিষ্টই, তাতে রুষ্ট রাজার বদমেজাজী জবাবগুলো আরও বাড়িয়ে তুলেছিল অনিষ্টটাকে।

সরকারের আর্থিক অসুবিধা বেড়ে চলেছিল ইতোমধ্যে। বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্যে বরাদ্দ-করা টাকা কাটা হয়েছিল: 'Seehandlung' (২০) নামে একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের হিসাবে এবং ঝুঁকিতে ফাটকাবাজি আর বাণিজ্য চালাত; সেটা দীর্ঘকাল যাবত ছিল রাষ্ট্রের টাকার দালাল, সেটার সঙ্গে বিভিন্ন জুয়াচুরির লেনদেন করা হয়েছিল — এইভাবে ঠাট বজায় রাখা গিয়েছিল কিছুকাল। রাষ্ট্রের কাগজে মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়ে কিছুটা সংগতিসংস্থান জোটান হয়েছিল; তাই ব্যাপারটাকে মোটের উপর বেশ ভালভাবেই গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ফন্দিফিকির ফুরিয়ে গিয়েছিল অচিরেই। আর-একটা পরিকল্পনা নিয়ে চেষ্টা করে দেখা হয়েছিল:

পরিমাণে। ১৮৪০ সাল থেকে বরাবর অনুরূপ ভাব-ধারণার প্রতি ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেবার ফলে সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম রীতিমাফিক হয়ে উঠেছিল জার্মানিতেও, আর সেই ১৮৪৩ সালেই বিভিন্ন সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা গিজগিজ করত সমস্ত সংবাদপত্রে। জার্মানিতে শিগ্‌গিরই গড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্রীদের একটা সম্প্রদায়, যেটা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল ভাব-ধারণার অভিনবত্বের চেয়ে দুর্বোধ্যতার জন্যেই বেশি। জার্মান দর্শনের জটিল ভাষায় ফরাসী ফুরিয়েপন্থী, সাঁ-সিমোঁপন্থী এবং অন্যান্য মতবাদের তরজমা করাই ছিল সেটার প্রধান কর্মপ্রচেষ্টা (২২)। এই গোষ্ঠীটা থেকে একেবারেই পৃথক জার্মান কমিউনিস্ট সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল প্রায় একই সময়ে।

১৮৪৪ সালে ঘটেছিল সাইলেসিয়ার তাঁতিদের হাঙ্গামা, তারপরে প্রাগ-এ ক্যালিকো-ছাপা কর্মীদের অভ্যুত্থান। সরকারের বিরুদ্ধে নয়, মালিকদের বিরুদ্ধে মেহনতীদের এইসব হাঙ্গামা নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল, এগুলি গভীর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং মেহনতী জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট প্রচারে নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল। তেমনি ১৮৪৭-এর দুর্ভিক্ষের বছর খাদ্যের জন্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও। সংক্ষেপে, যেভাবে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিপক্ষ সেটার পতাকাতলে সমবেত করেছিল সম্পত্তি-বিত্তবান শ্রেণীগুলির প্রধান অংশটাকে (বড় বড় সামন্ত ভূস্বামীদের ছাড়া), সেইভাবেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় শহরের শ্রমিক শ্রেণী মুক্তির জন্যে নির্ভর করছিল সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট মতবাদের উপর, যদিও তদানীন্তন সংবাদপত্র আইনের অবস্থায় সে সম্বন্ধে তাদের জানান সম্ভব ছিল যৎসামান্যমাত্র। শ্রমিকরা কী চাইত সে সম্বন্ধে তাদের খুব নির্দিষ্ট কোন ধারণা আশা করা যেত না — তারা শুধু জানত যা চাইত তার সবকিছু নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের কর্মসূচিতে ছিল না, আর নিয়মতান্ত্রিক ভাব-ধারণার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না তাদের চাহিদাগুলো।

জার্মানিতে তখন কোন পৃথক প্রজাতান্ত্রিক পার্টি ছিল না। লোকে তখন হয় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী, নইলে কমবেশি স্পষ্ট ধরনের সমাজতন্ত্রী কিংবা কমিউনিস্ট।

এমনসব উপাদান থাকায়, সামান্যতম সংঘর্ষও নিশ্চয়ই বিপ্লব ঘটাত।

যখন ঊর্ধ্বতন অভিজাতকুল এবং ঊর্ধ্বতন কর্মচারী আর সামরিক অফিসারেরা ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন; যখন নিম্নতন অভিজাতকুল, ব্যাপারী বুর্জোয়ারা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, সমস্ত মাত্রার বিদ্যালয় শিক্ষকেরা, এমনকি আমলাতন্ত্র আর সামরিক অফিসারদের নিম্নতর পদের লোকেরাও, এরা সবাই সম্মিলিত ছিল সরকারের বিরুদ্ধে; যখন এদের পিছনে ছিল বিক্ষুব্ধ কৃষক-সাধারণ এবং বড় বড় শহরের বিক্ষুব্ধ প্রলেতারিয়ানরা, যারা তখনকার মতো উদারপন্থী প্রতিপক্ষকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হাতে সবকিছু তুলে নেবার অজানা কথা বিড়বিড় করে বলছিল তখনই; যখন সরকারটাকে বলপূর্বক ঠেলে ফেলে দিতে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রস্তুত, আর বুর্জোয়াদের বলপূর্বক ঠেলে ফেলে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল প্রলেতারিয়ানরা — তখন সরকার একগুঁয়ে হয়ে যে পথে চলছিল তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। ১৮৪৮ সালের গোড়ায় জার্মানি ছিল একটা বিপ্লবের প্রাক্কালে, ফেব্রুয়ারি মাসের ফরাসী বিপ্লব ত্বরিত না করলেও এই বিপ্লব আসতই।

জার্মানির উপর প্যারিস-বিপ্লবের ক্রিয়াফল কী হয়েছিল সেটা আমরা দেখব পরের কিস্তিতে।

লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

৩

অন্যান্য জার্মান রাজ্য

১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সালে যেটা ছিল জার্মান আন্দোলনে সবাইকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সম্পূর্ণভাবে একমাত্র সেই রাজ্যটা, অর্থাৎ প্রাশিয়া বিষয়েই আমাদের আলোচনা গণ্ডিবদ্ধ ছিল গত কিস্তিতে। তবে জার্মানির একই কালপর্যায়ের অন্যান্য রাজ্যের উপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাবার সময় হয়েছে।

খুদে রাজ্যগুলো তো ১৮৩০ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময় থেকেই কনফেডারেশনের ডায়েটের অর্থাৎ অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার একনায়কত্বাধীন হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণভাবেই। কয়েকটা সংবিধান প্রবর্তিত

হয়েছিল, সেগুলি ছিল যেমন বৃহত্তর রাজ্যগুলির আদেশ-নির্দেশের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে, তেমনি সেগুলির রচয়িতা রাজন্যদের জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করার জন্যে এবং একেবারে কোন নির্দেশক নীতি ছাড়াই ভিয়েনা কংগ্রেসের গঠিত পাঁচমিশালী প্রদেশগুলির ঐক্য নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে — এইসব সংবিধান অসার হলেও ১৮৩০ আর ১৮৩১ সালের উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে খুদে রাজন্যদের নিজেদেরই কর্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক প্রতিপন্ন হয়েছিল। সেগুলোকে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। সেগুলি থেকে যাকিছু অবশিষ্ট থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা ছায়াও নয়; এইসব খুদে রাজ্যের অক্ষম পরিষদগুলিতে হীন চাটুবাদ মেশান যে অবনমিত বিরোধিতা প্রদর্শন তাতে অনুমত ছিল সেটার কোনক্রমে ফলপ্রদ হবার সম্ভাবনার কথা কল্পনা করা যেত শুধু কোন ভেল্কার, রোট্রেক কিংবা ডালমান-এর বাচাল আত্মসন্তুষ্টিতে।

অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার এইসব অধীনরাজ্যে পার্লামেণ্টারি শাসন গড়ে উঠবে এই সম্ভাবনার ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির বুর্জোয়াদের অপেক্ষাকৃত কর্মোদ্যোগী অংশগুলি আগে যত আশা করেছিল সেসবই তাদের ছাড়তে হল ১৮৪০ সালের ঠিক পরেই। প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সেটার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রেণীগুলি যেইমাত্র প্রাশিয়ায় পার্লামেণ্টারি শাসনের জন্যে সংগ্রামের গুরুসংকল্প প্রদর্শন করল, অমনি অস্ট্রিয়া ছাড়া সারা জার্মানিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের নেতৃত্ব করতে দেওয়া হল। এখন আর কেউ আপত্তি তুলবে না যে, মধ্য জার্মানির যেসব নিয়মতন্ত্রী পরে ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, যাদের পৃথক সভাগুলির জায়গার নাম অনুসারে যাদের বলা হয়েছিল গোথা পার্টি (২৩), তাদের কোষ কেন্দ্রটা ১৮৪৮ সালের অনেক আগেই যে পরিকল্পনা মনস্থ করেছিল সেটাকে সামান্য অদলবদল করে তারা ১৮৪৯ সালে উপস্থিত করেছিল সারা জার্মানির প্রতিনিধিদের কাছে। তাদের অভিপ্রায় ছিল — জার্মান কনফেডারেশন থেকে অস্ট্রিয়াকে একেবারেই বাদ দেবে, প্রাশিয়ার রক্ষণাধীনে স্থাপন করবে নতুন কনফেডারেশন, সেটার থাকবে নতুন সংবিধান আর ফেডারেল পার্লামেণ্ট, এবং অপেক্ষাকৃত নগণ্য রাজ্যগুলিকে কিছুটা বড় বড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবে। এই সবকিছু কার্যে পরিণত করার কথা ছিল

যেইমাত্র প্রাশিয়া দাঁড়াবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কাতারে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রবর্তন করবে, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র কর্মনীতি গ্রহণ করবে, আর এইভাবে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলির নিয়মতন্ত্রীদের নিজ নিজ সরকারের সত্যিকার নিয়ন্ত্রণ লাভ করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পের উদ্ভাবক ছিলেন হাইডেলবের্গের (বাডেন) প্রফেসর গের্ভিনাস। এইভাবে প্রুশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তির হবার কথা ছিল সাধারণভাবে জার্মানির বুর্জোয়াদের মুক্তির সংকেত, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীজোট গড়ার সংকেত; কেননা এখনই দেখা যাবে, একেবারেই অসভ্য দেশ বলে বিবেচিত হত অস্ট্রিয়া, সেদেশ সম্বন্ধে জানা ছিল যৎসামান্যই, আর সেই সামান্যটা দেশটির মানুষের পক্ষে সম্মানজনক ছিল না; কাজেই জার্মানির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য ছিল না অস্ট্রিয়া।

ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী প্রাশিয়ায় তাদের সমকক্ষদের পিছন পিছন এগিয়েছিল কমবেশি দ্রুত। পেটি বুর্জোয়ারা তাদের নিজ নিজ সরকারগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল করবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় 'স্বেচ্ছাচারের দাসদের' সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার সময়ে তারা যেসব রাজনীতিক ভুয়া বিশেষাধিকারের বড়াই করত সেগুলোকে ছেঁটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাদের বিরোধিতায় তখনও সুনির্দিষ্ট এমনকিছু ছিল না যাতে উচ্চতর বুর্জোয়াদের নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে স্পষ্ট-পৃথক স্বতন্ত্র তরফ হিসেবে তাদের উপর ছাপ পড়তে পারে। কৃষকদের মধ্যেও অসন্তোষ সমপরিমাণে বেড়ে চলছিল, কিন্তু একথা সুবিদিত যে, সর্বজনীন ভোটাধিকার যেখানে চালু আছে সেইসব দেশে ছাড়া জনসমষ্টির এই অংশটা নির্ঝঞ্ঝাট এবং শান্তিপূর্ণ সময়ে নিজ স্বার্থ কিছুতেই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে না এবং স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে নিজ অবস্থানে দাঁড়ায় না। শহরগুলির বিভিন্ন বৃত্তি আর ম্যানুফ্যাকচারের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের 'বিষে' সংক্রমিত হতে শুরু করেছিল, কিন্তু প্রাশিয়ার বাইরে আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল স্বল্পসংখ্যক, আর ম্যানুফ্যাকচারিং এলাকা ছিল আরও কম, তাই কার্যকরণ আর প্রচারের কেন্দ্রের অভাবের দরুন ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে এই শ্রেণীর আন্দোলন ছিল অত্যন্ত মন্থর।

প্রাশিয়ায়ও, ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতেও রাজনীতিক বিরুদ্ধতা প্রকাশ করায় দুষ্করতার ফলে জার্মান ক্যাথলিকতন্ত্র এবং মুক্ত সম্প্রদায়গুলো (২৪) এই দুটো সদৃশ ধর্মীয় প্রতিপক্ষ গোছের আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে রাষ্ট্রীয় চার্চের আশিসধন্য দেশগুলিতে, যেখানে রাজনীতিক আলোচনা শৃঙ্খলিত সেখানে ঐহিক ক্ষমতার প্রতি অদিব্য এবং বিপজ্জনক বিরোধিতা লুকন থাকে আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত পাপমুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত আপাত-স্বার্থশূন্য সংগ্রামে। নিজেদের কোন কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা যেগুলি হতে দেয় না এমন বহু সরকারই শহিদ সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং জনগণের ধর্মোন্মাদনা খুঁচিয়ে তুলতে দ্বিধা করবে। এইভাবে ১৮৪৫ সালের জার্মানিতে প্রত্যেকটি রাজ্যে রোমান-ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম কিংবা দুইই দেশের আইনের অপরিহার্য অংশ বলে গণ্য ছিল। তাছাড়া, প্রত্যেকটি রাজ্যে ঐ দুটোর একটার কিংবা উভয়েরই যাজকমণ্ডলী ছিল সরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই প্রটেস্ট্যাণ্ট কিংবা ক্যাথলিক ধর্মমতের উপর আক্রমণ, যাজকের কাজের উপর আক্রমণ ছিল সরকারেরই উপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ। জার্মান ক্যাথলিকতন্ত্রের বেলায় — সেটার অস্তিত্বই ছিল জার্মানির, বিশেষত অস্ট্রিয়া আর ব্যাভেরিয়ার ক্যাথলিক সরকারগুলির উপর আক্রমণ। ঐসব সরকার সেটাকে ধরেছিল ঐভাবেই। কিছুটা বৃটিশ এবং মার্কিন ইউনিটারিয়ানদের (২৫) অনুরূপ মুক্ত সম্প্রদায়গুলোর সদস্যরা, প্রটেস্ট্যাণ্ট ডিসেণ্টাররা প্রাশিয়ার রাজা এবং তাঁর প্রিয়পাত্র শিক্ষা আর যাজকীয় বিভাগের মন্ত্রী মিঃ এইকহর্ন-এর যাজকতান্ত্রিক এবং কঠোর গোঁড়ামির প্রতি বিরুদ্ধতা ঘোষণা করত প্রকাশ্যে। প্রথম সম্প্রদায়টা ক্যাথলিক দেশগুলিতে, দ্বিতীয়টা প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশগুলিতে — কিছুকালের জন্যে দ্রুত প্রসার ঘটেছিল এই সম্প্রদায়-দুটির ও উৎপত্তির ভিন্নতা ছাড়া কোন পার্থক্য ছিল না এদের মধ্যে। নীতির বেলায় — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে উভয়ে সম্পূর্ণভাবে একমত ছিল : সমস্ত স্থির-নির্দিষ্ট আপ্তবাক্য বাজে জিনিস। কোন সীমানির্দেশ না-থাকাটাই ছিল তাদের সারমর্ম। যেখানে সমস্ত জার্মান একত্রে মিলিত হতে পারে সেই মন্দির নির্মাণ করছিল বলে তারা জাহির করত। এইভাবে তারা ছিল তখনকার আর-একটা রাজনীতিক ধারণার ধর্মীয় রূপের প্রতিভূ — সে

ধারণাটা হল জার্মান ঐক্য, অথচ তারা কখনও নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারে নি।

স্পষ্টতই সমস্ত জার্মানের উপযোগিতা, অভ্যাস এবং রুচি অনুসারে প্রস্তুত করা একটা সাধারণী ধর্ম উদ্ভাবন ক'রে অন্তত ধর্মীয় ভিত্তিতে উল্লিখিত সম্প্রদায়-দুটি জার্মান ঐক্যের যে-ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিল সেটা বাস্তবিকই ছিল বহুবিস্তৃত, বিশেষত ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে। নেপোলিয়ন জার্মান সাম্রাজ্যটাকে ভেঙে দেবার পর থেকে (২৬) জার্মান সংস্থার সমস্ত disjecta membra*-র সম্মিলনীর জন্যে হাঁকটা ছিল বিদ্যমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষের সবচেয়ে ব্যাপক অভিব্যক্তি, সেটা সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে, যেখানে রাজসভা, প্রশাসনযন্ত্র আর ফৌজের ব্যয়বাহুল্য, সংক্ষেপে করের গুরুভার বেড়ে চলছিল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতা আর অক্ষমতার সমানুপাতে। কিন্তু কার্যে পরিণত হলে কী দাঁড়াবে এই জার্মান ঐক্য সে প্রশ্নে বিভিন্ন পক্ষের মতৈক্য ছিল না। বুর্জোয়ারা কোন গুরুতর বৈপ্লবিক ওলটপালট চায় নি, যেটাকে তারা 'সাধনসাধ্য' বিবেচনা করত বলে আমরা দেখেছি, অর্থাৎ প্রাশিয়ার নিয়মতান্ত্রিক শাসনের আধিপত্যে অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে সারা জার্মানির সম্মিলনী, তাতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। বিপজ্জনক ঝড়-ঝঞ্ঝা ডেকে না এনে তখন তার চেয়ে বেশি কিছু করা যেত না, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। পেটি বুর্জোয়ারা এবং এমনসব ব্যাপারে যতখানি মাথা ঘামাত তাতে কৃষককুল যে জার্মান ঐক্যের জন্যে এত উচ্চৈঃস্বরে সোরগোল করত তার কোন নির্দিষ্ট আকার তারা কখনও স্থির করে নি; অল্পকিছু কল্পনাবিলাসী মানুষ বিশেষ করে সামন্ততন্ত্রী প্রতিক্রিয়াপন্থী জার্মান সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের আশা রাখত; অল্পকিছু অজ্ঞ মানুষ, soi-disant** র‍্যাডিকালরা সুইস প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির ভক্ত ছিল, পরে যাতে তাদের মোহমুক্তি ঘটেছিল অতি হাস্যকরভাবে সেই কার্যক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তখনও তাদের হয় নি, তারা মতপ্রকাশ করেছিল ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের পক্ষে। এক অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের জন্যে তখন

---

* Disjecta membra: ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সদস্যরা। — সম্পাঃ

** Soi-disant: তথাকথিত। — সম্পাঃ

মতপ্রকাশের সাহস করেছিল কেবল সবচেয়ে চরমপন্থী পক্ষটা (২৭)। এইভাবে, আপনাতেই জার্মান ঐক্য সংক্রান্ত প্রশ্নটা ছিল অনৈক্য, বিরোধ এবং সম্ভাব্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি গৃহযুদ্ধের বিপদে ঠাসা।

তাহলে, সারসংক্ষেপ করলে, ১৮৪৭ সালের শেষে প্রাশিয়ার অবস্থা এবং জার্মানির ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলির অবস্থা ছিল এই। বুর্জোয়ারা নিজ ক্ষমতা উপলব্ধি করত, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যিক লেনদেন, শিল্পোৎপাদনশীলতা এবং শ্রেণী হিসেবে সাধারণী ক্রিয়াকলাপকে যে বেড়ি দিয়ে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র সেটাকে আর বেশি কাল বরদাস্ত না করতে তারা কৃতসংকল্প হয়েছিল; ভূমিসম্পত্তির মালিক অভিজাতকুলের একাংশ শুধু বাজার-চল পণ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল এতখানি যাতে তাদের স্বার্থ এবং কর্মব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়াদের মতোই, তাই তারা বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; নানা কর এবং কাজকারবারের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের জন্য বিক্ষুব্ধ ছিল, অসন্তোষ প্রকাশ করছিল অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাপারী শ্রেণী, কিন্তু সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার মাঝে যাতে তাদের অবস্থান নিরাপদ হয় এমন সংস্কারের কোন স্পষ্ট-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাদের ছিল না; এখানে সামন্ততান্ত্রিক জবরদস্তি আদায়, সেখানে সুদখোর, মহাজন আর উকিলদের দ্বারা উৎপীড়িত কৃষকেরা; ব্যাপক অসন্তোষে সংক্রমিত শহরের মেহনতী জনগণ সমানই ঘৃণা করত সরকারকে এবং শিল্পক্ষেত্রের বড় বড় পুঁজিপতিদের, তারা সমাজতান্ত্রিক আর কমিউনিস্ট ভাব-ধারণায় সংক্রমিত হচ্ছিল। সংক্ষেপে, মোটামুটি বুর্জোয়াদের পরিচালিত বিভিন্ন স্বার্থাধীন একগাদা পাঁচমিশালী প্রতিপক্ষ ছিল, আর সেই বুর্জোয়াদের প্রথম সারিতে এগোচ্ছিল প্রাশিয়ার এবং বিশেষত রাইন প্রদেশের বুর্জোয়ারা। অন্যদিকে ছিল বহু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের সরকারগুলি, তারা পরস্পরকে এবং বিশেষত প্রাশিয়ার সরকারকে অবিশ্বাস করত, যদিও আশ্রয়ের জন্যে তাদের নির্ভর করতে হত সেটার উপর। প্রাশিয়ায় জনমতের পরিত্যক্ত, এমনকি অভিজাতকুলেরও একাংশের পরিত্যক্ত এই সরকার নির্ভর করছিল ফৌজ আর আমলাতন্ত্রের উপর যা প্রতিদিনই আরও বেশি পরিমাণে প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াদের ভাব-ধারণায় সংক্রামিত হচ্ছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ছিল — এই সরকার ঐ সবকিছুর উপর

ছিল কথাটার ষোল-আনা আক্ষরিক অর্থেই কপর্দকশূন্য, যে-সরকার বুর্জোয়াদের প্রতিপক্ষতার মর্জির কাছে নতিস্বীকার না করে বেড়ে-চলা ঘাটতি পূরণের জন্যে এক কপর্দকও যোগাড় করতে পারত না। ক্ষমতার জন্যে বিদ্যমান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সময়ে কোন দেশের বুর্জোয়াদের এমন চমৎকার অবস্থান ছিল কি আর কখনও?

লণ্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

৪

অস্ট্রিয়া

এখন আমাদের বিচার-বিবেচনা করতে হবে অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে, এই যে দেশটি ১৮৪৮ সালের মার্চ মাস অবধি বৈদেশিক জাতিগুলির দৃষ্টির আড়ালে ছিল, প্রায় যেমনটা চীন ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গে কিছুকাল আগেকার যুদ্ধ পর্যন্ত(২৮)।

স্বভাবতই, এখানে আমরা বিচার-বিবেচনা করতে পারি শুধু জার্মান অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে। পোলীয়, হাঙ্গেরীয় কিংবা ইতালীয় অস্ট্রীয়রা আমাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ছে না, তবে ১৮৪৮ সাল থেকে যে পরিমাণে তারা জার্মান অস্ট্রীয়দের নিয়তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাতে তাদের ব্যাপার বিবেচনায় রাখতে হবে অতঃপর।

প্রিন্স মেটারনিখের সরকার নির্ভর করত দুটো নীতির উপর: প্রথমত, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন জাতিগুলির প্রত্যেকটাকে অনুরূপ অবস্থার অন্যান্য সমস্ত জাতিকে দিয়ে সংযত রাখা; দ্বিতীয়ত, সমর্থনের জন্যে সামন্ত জমিদার এবং বড় বড় ফটকা কারবারি শ্রেণী-দুটোর উপর নির্ভর করা, যা বরাবরই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রগুলির বুনিয়াদী নীতি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের ক্ষমতা আর প্রভাব দিয়ে এই শ্রেণী-দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে সরকারের কাজকর্ম চালাতে পারে একেবারে অবাধে। ভূমিসম্পত্তির মালিক অভিজাতদের গোটা আয়টা হত হরেক রকমের সামন্ততান্ত্রিক রাজস্ব থেকে,

যে পদদলিত ভূমিদাস শ্রেণীর কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদের জীবনযাত্রা চলত সেটার বিরুদ্ধে তাদের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপে সরকারটাকে তারা সমর্থন না করে পারত না। তাদের মধ্যে একটু কম ধনী অংশটা যখনই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত, যেমন হয়েছিল ১৮৪৬ সালে গ্যালিসিয়ায়, অমনি মেটারনিখ তাদের উপর লেলিয়ে দিতেন সেই ভূমিদাসদেরই, যারা নিজেদের অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ উৎপীড়কদের উপর অন্তত ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে লাভবান হত (২৯)। অন্যদিকে, দেশের সরকারী তহবিলে এক্সচেঞ্জের বড় পুঁজিপতিদের বিপুল হিসসাটা দিয়ে তারা বাঁধা ছিল মেটারনিখ সরকারের কাছে। অস্ট্রিয়া পূর্ণ ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৫ সালে, তারপরে ১৮২০ সাল থেকে ইতালিতে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপন ক'রে এবং বজায় রেখে অস্ট্রিয়া ১৮১০ সালে দেউলিয়া হয়ে যাবার সময়কার দায়-দেনা অংশত মিটিয়ে ফেলেছিল, আর শান্তি চুক্তির পরে ইউরোপের মস্ত টাকার বাজারে আর্থ সুনাম পুনঃস্থাপন করেছিল অচিরেই, আর এই আর্থ সুনাম বাড়ার সমানুপাতে সেটার সুযোগ নিচ্ছিল। এইভাবে ইউরোপের সমস্ত বড় বড় টাকার কারবারি তাদের পুঁজির একটা মোটা অংশ লগ্নি করেছিল অস্ট্রীয় তহবিলে। তারা সবাই দেশটির আর্থ সুনাম প্রতিপোষণ করতে আগ্রহান্বিত ছিল, আর প্রতিপোষিত হতে হলে অস্ট্রিয়ার সরকারী তহবিলে সবসময়ে নতুন নতুন ঋণের প্রয়োজন ছিল, তাই আগেই যা দিয়েছিল সেগুলোর সিকিউরিটির ক্রেডিট বজায় রাখার জন্যে তারা মাঝে মাঝে নতুন পুঁজি ধার দিতে বাধ্য হত। ১৮১৫ সালের পরে শান্তি ছিল দীর্ঘস্থায়ী; অস্ট্রিয়ার মতো হাজার বছরের প্রাচীন সাম্রাজ্য উলটে পড়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবই ছিল, তার ফলে মেটারনিখ সরকারের ক্রেডিট বেড়ে গিয়েছিল আশ্চর্য পরিমাণে, তাতে এমনকি ভিয়েনার ব্যাঙ্কার আর ফটকা কারবারিদের থেকেও অনপেক্ষ হয়ে গিয়েছিল এই সরকার, কেননা মেটারনিখ যেহেতু ফ্রাঙ্কফুর্টে আর আমস্টার্ডামে প্রচুর টাকা পেতে পারতেন, তাই অস্ট্রীয় পুঁজিপতিদের নিজের পদানত পেয়ে তিনি নিশ্চয়ই খুশি ছিলেন। তাছাড়া, অন্যান্য সমস্ত দিক থেকেও তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁর আয়ত্তে। ব্যাঙ্কার, ফটকা কারবারি আর সরকারী কণ্ট্রাক্টররা ফন্দি ক'রে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কাছ থেকে সবসময়ে যে মোটা মোটা মুনাফা তুলত

সেটা পুষিয়ে যেত তাদের জান-মালের উপর সরকারের হস্তগত প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা দিয়ে। কাজেই এই মহল থেকে বিরোধিতার লেশমাত্রও আসতে পারে বলে মনে হত না। এইভাবে সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী আর প্রভাবশালী শ্রেণী-দুটোর সমর্থন সম্বন্ধে মেটারনিখ নিশ্চিত ছিলেন, তাছাড়া তাঁর ছিল ফৌজ আর আমলাতন্ত্র, যার গঠন স্বৈরতন্ত্রের প্রয়োজনাদি অনুসারে আর উৎকৃষ্ট হতে পারত না। অস্ট্রীয় কৃত্যকে বেসামরিক আর সামরিক অফিসারদের নিয়ে রয়েছে তাদের একটা নিজস্ব জাত; তাদের বাপেরা 'কাইজারে'র খিদমত করেছিল, তাদের ছেলেরাও তাই করবে। দুই-মাথাওয়ালা ঈগলের পাখার তলে সমবেত বহুবিধ জাতিসত্তাগুলির কোনটার মানুষ তারা নয়। সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, পোল্যান্ড থেকে ইতালিতে, জার্মান প্রদেশগুলি থেকে ট্রান্সিলভানিয়াতে তারা স্থানান্তরিত হয় এবং বরাবর তাই হয়ে আসছে; হাঙ্গেরীয়, পোল্, জার্মান, রুমানীয়, ইতালীয়, ক্রোট্, যেকোন ব্যক্তির 'সাম্রাজ্যিক এবং রাজকীয়' কর্তৃত্বের ছাপ নেই, যার আছে কোন পৃথক জাতিগত চরিত্র, তাকে তারা সমানিহ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের কোন জাতিসত্তা নেই, কিংবা আসল অস্ট্রীয় জাতিটা কেবল তাদেরই নিয়ে। কোন বুদ্ধিমান এবং উদ্যমশীল সর্দারের হাতে এমন বেসামরিক এবং সামরিক তন্ত্রটা কতখানি সহজে-ব্যবহার্য এবং শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে সেটা স্পষ্টপ্রতীয়মান।

জনসমষ্টির অন্যান্য শ্রেণীর বেলায় -- ancien régime*-এর রাষ্ট্রনায়কোচিত মেজাজের মেটারনিখের বড় একটা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না তাদের সমর্থন। তাদের প্রসঙ্গে তাঁর কর্মনীতি ছিল শুধু একটাই: তাদের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব আদায় করে নাও কর হিসেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাখো নিরুপদ্রব করে। অস্ট্রিয়ায় ব্যাপারী আর ম্যানুফ্যাকচারিং বুর্জোয়াদের বৃদ্ধি মন্থরই ছিল। দানিউব নদীতে বাণিজ্য ছিল অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন; দেশটির বন্দর ছিল মাত্র একটা — ত্রিয়েস্ত, এই বন্দরের বাণিজ্য ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ম্যানুফ্যাকচাররা বিস্তর সংরক্ষণ পেত, সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে রহিত করার শামিল। কিন্তু এই

---

* — ancien régime — পুরন ব্যবস্থা। — সম্পাঃ

সুযোগ দেওয়া হয়েছিল প্রধানত তাদের করদান ক্ষমতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে, আর সেটাকে উলটো দিক থেকে সমভার করা হত ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্যের উপর অভ্যন্তরীণ বাধা-নিষেধ দিয়ে, গিল্ড এবং অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক কর্পোরেশনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, এগুলিকে সযত্নে প্রতিপোষণ করা হত যতক্ষণ তারা সরকারের উদ্দেশ্য আর অভিমত ব্যাহত না করত। খুদে ব্যাপারীদের আটকে রাখা হত এইসব মধ্যযুগীয় গিল্ডের সংকীর্ণ চৌহদ্দির ভিতরে, গিল্ডগুলো বিভিন্ন বৃত্তিকে সুবিধালাভের জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখত, এবং মেহনতী শ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষদের সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় সম্পূর্ণতই রহিত ক'রে ঐসব অনৈচ্ছিক সমিতির সদস্যদের জন্যে পুরুষানুক্রমিক সুস্থিতি গোছের কিছু যুগিয়ে দিত। শেষে, কৃষক আর মজুরকে দেখা হত নিছক করযোগ্য বস্তু হিসেবে, তাদের ব্যাপারে যেটুকুমাত্র যত্ন নেওয়া হত সেটা ছিল জীবনযাত্রার যে অবস্থায় তখন তারা ছিল এবং যে অবস্থায় তাদের আগে ছিল তাদের বাপেরা, যথাসম্ভব সেই একই অবস্থায় তাদের বজায় রাখার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা পুরন প্রতিষ্ঠিত পুরুষানুক্রমিক কর্তৃত্ব প্রতিপোষণ করা হত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিপোষণেরই ধরনে। খুদে প্রজা-খামারীর উপর জমিদারের, কারখানার মিস্ত্রির উপর ম্যানুফ্যাকচারারের, জার্নিম্যান আর শিক্ষানবিসের উপর খুদে কর্তার, ছেলের উপর বাপের কর্তৃত্ব সর্বত্র কঠোরভাবে বজায় রাখত সরকার, যেকোন রকমের অমান্যতার ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনেরই মতো শাস্তি দেওয়া হত — অস্ট্রীয় ন্যায়বিচারের সর্বজনীন হাতিয়ার লাঠি দিয়ে।

শেষে, কৃত্রিম সুস্থিতি সৃষ্টির এই সমস্ত চেষ্টাকে একটা সর্বাত্মক ব্যবস্থা হিসেবে গুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতির জন্যে অনুমত মানসিক খোরাক বেছে নেওয়া হত অতি যথাযথ সতর্কতা সহকারে, আর সেটা বিতরণ করা হত যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণে। শিক্ষা সর্বত্রই ছিল ক্যাথলিক যাজকবর্গের হাতে, তাদের সর্দাররা বড় বড় সামন্ত জমিদারদের মতো একই ধরনে বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে অক্ষুণ্ণ রাখায় গভীরভাবে আগ্রহান্বিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করা হত যাতে সেগুলি পয়দা করতে পারত শুধু বিশেষ ধরনের মানুষ, তারা জ্ঞানের এটা-ওটা বিশেষ

শাখায় মস্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারত কিংবা নাও-বা পারত, কিন্তু যেকোন ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে ব্যাপক সংস্কারমুক্ত উদার শিক্ষা প্রত্যাশিত সেটা তার থেকে বাদ ছিল। হাঙ্গেরিতে ছাড়া কোথাও কোন সংবাদপত্র প্রকাশনা ছিল না, আর রাজত্বের অন্যান্য সমস্ত জায়গায় হাঙ্গেরীয় কাগজগুলি নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ সাহিত্যের বেলায় -- এটার পরিধি এই শতাব্দীর মধ্যে বাড়ে নি; ২য় জোসেফের মৃত্যুর পরে পরিধিটাকে আবার সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছিল। সীমান্তের যেখানেই অস্ট্রীয় রাজ্য কোন সভ্য দেশের সন্নিহিত তার সর্বত্র কাস্টম-হাউস কর্মকর্তাদের কর্ডনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক'রে সাহিত্য-সংক্রান্ত সেন্সরদের কর্ডন স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে কোন বৈদেশিক পুস্তক কিংবা সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু সমকালের হানিকর মানসের সামান্যতম সংক্রমণ থেকেও মুক্ত বিশুদ্ধ কিনা তা দু'বার কিংবা তিন বার সম্যক্ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করার আগে অস্ট্রিয়ায় ঢুকতে না পারে।

১৮১৫ সালের পরে প্রায় তিরিশ বছর ধরে এই ব্যবস্থাটা অনুসারে কাজে আশ্চর্য সাফল্য ঘটেছিল। অস্ট্রিয়া প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছিল ইউরোপের কাছে, আর ইউরোপও প্রায় সমানই স্বল্পপরিচিত ছিল অস্ট্রিয়ায়। মনে হত, জনসমষ্টির প্রত্যেকটা শ্রেণীর এবং সমগ্র জনসমষ্টির সামাজিক অবস্থায় যেন সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটে নি। শ্রেণীগুলির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ যা-ই থাকুক -- এই বিদ্বেষের অস্তিত্ব মেটারনিখের পক্ষে ছিল শাসন চালাবার জন্যে আবশ্যক একটা প্রধান অবস্থা, আর উচ্চতর শ্রেণীগুলিকে নিজের সমস্ত জবরদস্তির আদায়ের হাতিয়ার করে তিনি এই বিদ্বেষটাকে এমনকি বাড়িয়েই তুলতেন এবং এইভাবে দোষভাগী করতেন তাদেরই; আর রাজ্যের অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি জনসাধারণের যতই ঘৃণা থাকুক, কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধে অসন্তোষ ছিল মোটের উপর সামান্যই কিংবা একটুও না। সম্রাট ছিলেন ভক্তিভাজন, -- এই ব্যবস্থাটার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে বৃদ্ধ প্রথম ফ্রান্জ যে কথাটা বলেছিলেন সেটা যেন সত্যই প্রতিপন্ন হচ্ছিল, তিনি বলেছিলেন; 'তবু এটা টিকে থাকবে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, আর মেটারনিখ।'

কিন্তু চলছিল একটা মন্থর প্রচ্ছন্ন আন্দোলন, সেটা মেটারনিখের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। ম্যানুফ্যাকচার ক্ষেত্রের এবং ব্যাপারী

বুর্জোয়াদের ধনদৌলত বেড়েছিল। ম্যানুফ্যাকচারে যন্ত্রপাতি আর স্টীমের শক্তি চালু হবার ফলে অন্যান্য সমস্ত জায়গার মতো অস্ট্রিয়ায়ও সমাজের গোটা গোটা শ্রেণীর পুরন সম্পর্ক এবং জীবনের পরিবেশ উলটেপালটে গিয়েছিল; এর ফলে ভূমিদাসেরা হয়ে উঠেছিল স্বাধীন মানুষ, আর ছোট খামারীরা হয়েছিল ম্যানুফ্যাকচারের মিস্ত্রি; পুরন সামন্ততান্ত্রিক বৃত্তিগত কর্পোরেশনগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছিল, তার অনেকগুলোর জীবনোপায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার ক্ষেত্রের নতুন জনসমষ্টির সর্বত্র সংঘাত ঘটছিল পুরন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে। কাজকারবার উপলক্ষে বুর্জোয়া মানুষকে ক্রমেই বেশি ঘন ঘন বিদেশে যেতে হচ্ছিল, তারা সাম্রাজ্যিক কাস্টম্‌স সীমান্তপারের সভ্য দেশগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবাস্তব তথ্যাদি চালু করেছিল; রেলপথ চালু হবার ফলে অবশেষে শিল্পক্ষেত্রের এবং মনোজাগতিক উভয় আন্দোলন ত্বরিত হয়েছিল। অস্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেও ছিল একটা বিপজ্জনক অংশ, সেটা হল হাঙ্গেরীয় সামন্ততান্ত্রিক সংবিধান এবং সেটার পার্লামেণ্টারি কার্যধারা, আর সরকার আর তার মিত্র ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে অভিজাতকুলের গরিব হয়ে পড়া প্রতিপক্ষ জনরাশির সংগ্রাম। ডায়েটের অবস্থানস্থল প্রেস্‌বুর্গ* ছিল ভিয়েনার একেবারে দ্বারদেশে। এইসব উপাদান মিলে শহরের বুর্জোয়াদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল একটি মনোভাব, যেটা ঠিক বিরোধিতার মনোভাব নয়, কেননা বিরোধিতা তখনও ছিল অসম্ভব, কিন্তু অসন্তোষের মনোভাব আর বিভিন্ন সংস্কারের জন্যে ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা, সেসব সংস্কারের প্রকৃতি ছিল ততটা নয় সাংবিধানিক, যতটা কিনা প্রশাসনিক। প্রাশিয়ার মতো এখানেও একই ধরনে আমলাতন্ত্রের একাংশ শামিল হয়েছিল বুর্জোয়াদের সঙ্গে। এই পুরুষানুক্রমিক আমলাকুলের মধ্যে ২য় জোসেফের রেওয়াজ বিস্মৃত হয় নি। সরকারের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত কর্মকর্তারা নিজেরাই কখনও কখনও বিভিন্ন সম্ভাব্য কাল্পনিক সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাত, তারা মেটার্নিখের 'পিতৃবৎ' স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে সেই সম্রাটের উন্নতিশীল এবং মানস স্বৈরতন্ত্র বেশি পছন্দ করত। কিছুটা গরিব অভিজাতদের একাংশও তেমনি

---

* স্লাভ নাম: ব্রাতিস্লাভা। — সম্পাঃ

বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, আর জনসমষ্টির নিম্নতর শ্রেণীগুলির সবসময়েই বিস্তর অভিযোগ ছিল সরকারের বিরুদ্ধে না হলেও তাদের উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে, এই শ্রেণীগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বুর্জোয়াদের সংস্কারমূলক আকাঙ্ক্ষা সমর্থন না করে পারে নি।

এই পরিবর্তনের পক্ষে উপযোগী একটা বিশেষ সাহিত্য-শাখা জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় এই সময়েই, ধরা যাক ১৮৪৩ কিংবা ১৮৪৪ সালে। অল্পকিছু অস্ট্রীয় লেখক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সমালোচক, আনাড়ী কবি, যাদের সবারই মেধা ছিল খুবই মামুলি ধরনের, কিন্তু যাদের ছিল ইহুদিসুলভ বিশেষ রকমের অধ্যবসায়, তারা লাইপজিগে এবং অস্ট্রিয়ার বাইরে অন্যান্য জার্মান শহরে কায়েমী হয়ে বসে মেটারনিখের নাগালের বাইরে থেকে অস্ট্রিয়ার ব্যাপার নিয়ে কয়েকখানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। তারা এবং তাদের প্রকাশকেরা 'ফলাও কারবার' চালিয়েছিল সেটা নিয়ে। ইউরোপীয় চীনের কর্মনীতির গোপনকথাটা অবগত হবার জন্যে উদগ্রীব ছিল সারা জার্মানি; বোহেমিয়ার* সীমান্ত দিয়ে পাইকারী গোপন চালান হয়ে পাওয়া এইসব বইপত্র সম্বন্ধে আরও বেশি কৌতূহলী ছিল অস্ট্রিয়ানরা নিজেরাই। এইসব বইপত্রে ফাঁস করা গোপনকথাগুলোর অবশ্য কোন বিরাট গুরুত্ব ছিল না; সেগুলোর শুভাকাঙ্ক্ষী রচয়িতারা যেসব সংস্কারের পরিকল্পনা তুলে ধরত সেগুলোতে যে নিরীহতার ছাপ থাকত সেটা রাজনীতিগত কুমারীত্বেরই শামিল। অস্ট্রিয়ায় কোন সংবিধান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হাসিল করার অসাধ্য বলে বিবেচিত হত। বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার, প্রাদেশিক ডায়েটগুলির অধিকতর অধিকার, বৈদেশিক বই আর সংবাদপত্র আসতে দেওয়া, সেন্সরশিপের কঠোরতাহ্রাস — এইসব ছাড়িয়ে বড় একটা এগোত না ঐসব সুশীল অস্ট্রিয়ানের রাজভক্ত এবং নম্র আকাঙ্ক্ষা।

যা-ই হোক, বাদবাকি জার্মানির সঙ্গে এবং জার্মানির ভিতর দিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সাহিত্যগত সংসর্গ রোধ করা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, সেটা সরকারবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে খুবই সহায়ক

* চেক্‌। — সম্পাঃ

হয়েছিল, আর অন্তত সামান্য পরিমাণে রাজনীতিক তথ্যাদি এনে দিয়েছিল অস্ট্রিয়ার জনসমষ্টির একাংশের নাগালের মধ্যে। এইভাবে, তখন সারা জার্মানিতে প্রবল ছিল যে রাজনীতিক এবং রাজনীতিক-ধর্মীয় আলোড়ন, সেটা ১৮৪৭ সালের শেষাশেষি আঁকড়ে ধরেছিল অস্ট্রিয়াকেও, যদিও কম মাত্রায়। অস্ট্রিয়ায় এই আলোড়নের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত নিঃশব্দ হলেও সেখানে যাদের উপর সেটা খাটান যেত এমন বৈপ্লবিক উপাদান ছিল যথেষ্টই। ছিল কৃষক, ভূমিদাস কিংবা সামন্ততান্ত্রিক প্রজা, — মনিবদের কিংবা সরকারী জবরদস্তির আদায় তাদের গংড়িয়ে ধংলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল; ছিল কারখানার মিস্ত্রিরা — ম্যানংফ্যাকচারারদের মর্জিমাফিক যেকোন শর্তে কাজ করতে তাদের বাধ্য করত পংলিসের লাঠি; আরও ছিল জার্নিম্যানরা, — গিল্ডগংলোর আইনকানংন তাদের নিজেদের বংত্তিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছিল; তারপর সওদাগরেরা — কাজকারবারের প্রতিপদে তারা অদ্ভুত-অসম্ভব নিয়মকানংনে হোঁচট খেত; ছিল ম্যানংফ্যাকচারাররা — তাদের সবসময়ে খটাখটি লাগত বিশেষ সংযোগ-সংবিধার জন্যে সতর্ক-যত্নশীল বংত্তিগত গিল্ডগংলো কিংবা লোভী এবং হস্তক্ষেপকারী আমলাদের সঙ্গে; আর বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, বিদ্বান মানংষেরা, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত কর্মকর্তারা, যারা বংথাই লড়ত অজ্ঞ এবং দাম্ভিক যাজকবর্গের বিরংদ্ধে, কিংবা গন্ডমংর্খ হংকুমদার উপরওয়ালাদের বিরংদ্ধে। সংক্ষেপে, একটাও শ্রেণী সন্তুষ্ট ছিল না, কেননা কখনও-কখনও সরকার যেসব ছোটখাটো সংযোগসংবিধা দিতে বাধ্য হত সেগংলো নিজের ক্ষতি করে নয়, কেননা সেটা রাজকোষের সামর্থ্যে কুলোত না, তা দিত ঊর্ধ্বতন অভিজাতকুল আর যাজকমন্ডলীর ক্ষতি করে। তাই মস্ত মস্ত ব্যাঙ্কার আর অর্থপতিদের বেলায় — ইতালির সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাবলি, হাঙ্গেরীয় ডায়েটের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা, আর সাম্রাজ্যের সর্বত্র অভিব্যক্ত অসন্তোষের অনভ্রান্ত মেজাজ এবং সংস্কারের জন্যে হাঁক-ডাকের প্রকৃতিটা এমন ছিল না যাতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দংঢ়তা এবং শোধক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের আস্থা মজবংত হতে পারে।

এইভাবে অস্ট্রিয়াও এগিয়ে চলছিল একটা বিরাট পরিবর্তনের দিকে — ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, এমন সময়ে ফ্রান্সে একটা ঘটনা ফেটে পড়ল,

যাতে আসন্ন ঝঞ্ঝাটা এসে পড়ল তৎক্ষণাৎ, বুড়ো ফ্রান্জ যে বলেছিলেন তাঁর আর মেটারনিখের জীবৎকালে ইমারতটা টিকে থাকবে, সেটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল।

লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৮৫১

৫

ভিয়েনার অভ্যুত্থান

১৮৪৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি লুই ফিলিপ প্যারিস থেকে বিতাড়িত হন, ঘোষিত হয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র। তারপরে ১৩ মার্চ ভিয়েনার মানুষ প্রিন্স মেটারনিখের ক্ষমতা চূর্ণ করে, তিনি কলঙ্কিত হয়ে দেশ থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। ১৮ মার্চ অস্ত্র-হাতে দাঁড়িয়ে যায় বার্লিনের মানুষ, আঠার ঘণ্টার দুর্দমনীয় লড়াইয়ের পরে রাজা তাদের হাতে আত্মসমর্পণ করলে তারা পরিতোষ লাভ করে। জার্মানির বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের রাজধানীগুলিতে কমবেশি প্রচণ্ড ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে যুগপৎ, সবগুলি সমানই সাফল্যমণ্ডিত হয়। জার্মান জনগণ প্রথম বিপ্লব নিষ্পন্ন না করলেও তারা অন্তত মোটামুটি প্রবৃত্ত হল বৈপ্লবিক কর্মজীবনে।

এইসব অভ্যুত্থানের ঘটনাবলি নিয়ে বিশদ আলোচনা আমরা এখানে করতে পারছি না; আমাদের যা ব্যাখ্যা করতে হবে সেটা হল সেগুলোর প্রকৃতি এবং সেগুলো সম্বন্ধে জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণীর মতাবস্থান।

বলা যেতে পারে ভিয়েনার বিপ্লব করেছিল প্রায় সর্বসম্মত জনসমষ্টি। ব্যাঙ্কার আর ফটকা কারবারিরা বাদে বুর্জোয়া, খুদে ব্যাপারী শ্রেণী, মেহনতীজন, প্রত্যেকেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সবার অতি ঘৃণ্য সরকারের বিরুদ্ধে, সে সরকার সর্বজনের বিরাগভাজন ছিল এতই যাতে সেটার সমর্থক সংখ্যাল্প অভিজাত আর অর্থপতিরা প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীকে মেটারনিখ এতখানি রাজনীতিক অজ্ঞতার মাঝে রেখেছিলেন যাতে প্যারিস থেকে অরাজকতা, সমাজতন্ত্র আর

সন্ত্রাসের রাজ সম্বন্ধে এবং পর্নজিপতি শ্রেণী আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে সংবাদাদি তাদের কাছে একেবারেই অবোধ্য হয়ে পড়ল। এই রাজনীতিক হাবাগবারা হয় এইসব খবরের কোন অর্থ করতে পারল না, নইলে মনে করল, ওগ্নলো হল তাদের ভয় খাইয়ে আজ্ঞান্নবর্তী করার জন্যে মেটারনিখের শয়তানী উদ্ভাবন। তাছাড়া, মেহনতীজনকে শ্রেণী হিসেবে সক্রিয় হতে, কিংবা নিজেদের স্পষ্ট-পৃথক শ্রেণী-স্বার্থের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতে তারা দেখে নি কখনও। সর্বজনঘৃণ্য সরকারটাকে উলটে দেবার জন্যে তখন অমন সাগ্রহে সম্মিলিত শ্রেণীগ্নলির মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দেবার সম্ভাবনা সংক্রান্ত কোন ধারণা তাদের ছিল না অতীত অভিজ্ঞতা থেকে। তারা দেখেছিল সংবিধান, জ্নরির বিচার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে মেহনতী জনগণ ছিল তাদের সঙ্গে একমত। এইভাবে, অন্তত ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে ব্নর্জোয়ারা আন্দোলনের সঙ্গে ছিল সর্বান্তঃকরণে, আর অন্যদিকে, আন্দোলনটা গোড়া থেকে তাদের করে দিয়েছিল (অন্তত তত্ত্বগতভাবে) রাজ্যের প্রাধান্যশালী শ্রেণী।

বিভিন্ন শ্রেণীর এই সম্মিলনী সবসময়েই যেকোন বিপ্লবের একটা কোন মাত্রায় আবশ্যিক শর্ত, কিন্তু এই সম্মিলনী দীর্ঘকাল টিকতে পারে না, এটা সমস্ত বিপ্লবেরই নিয়তি। সবার একই শত্র্নর বির্নদ্ধে যেইমাত্র জয়লাভ হয় অমনি বিজেতারা বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে প'ড়ে অস্ত্র ঘ্নরিয়ে ধরে পরস্পরের বির্নদ্ধে। শ্রেণীবিরোধের এই দ্রুত এবং আবেগোচ্ছল বিকাশই প্নরন এবং জটিল সামাজিক গঠনে বিপ্লবকে সামাজিক আর রাজনীতিক প্রগতির এমন প্রবল ক্রিয়াকর্তা করে তোলে; ঐসব প্রচন্ড আলোড়নের সময়ে একটার পরে একটা নতুন তরফের গড়ে ওঠা এবং দ্রুত বিকাশ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার এই অবিরাম প্রক্রিয়াটাই কোন জাতি সাধারণ পরিস্থিতিতে এক শতাব্দীতে যা করত তার চেয়ে বেশি পথ পার করিয়ে দেয় পাঁচ বছরে।

ভিয়েনার বিপ্লব ব্নর্জোয়াদের প্রাধান্যশালী শ্রেণী করে দিল তত্ত্বগতভাবে; অর্থাৎ কিনা, সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া স্নযোগস্নবিধাগ্নলো এমন ছিল যা কার্যে পরিণত করলে এবং কিছ্নকাল টিকিয়ে রাখা হলে ব্নর্জোয়াদের আধিপত্য হাসিল হত, সেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু বাস্তবে ঐ শ্রেণীর

আধিপত্য কায়েম হবার ধারেকাছেও পৌঁছল না। জাতীয় রক্ষিবাহিনী গড়া হল, তার ফলে অস্ত্র পেল বুর্জোয়ারা আর খুদে ব্যাপারীরা, তাতে ঐ শ্রেণীটা লাভ করল শক্তি আর গুরুত্ব দুইই, তা ঠিক; স্থাপিত হল বৈপ্লবিক, দায়িত্বশূন্য সরকার গোছের 'নিরাপত্তা কমিটি', তাতে বুর্জোয়াদের প্রাধান্য, তারা এসে গেল ক্ষমতার শীর্ষে, তা ঠিক। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মেহনতীরাও অংশত অস্ত্রসজ্জিত হল; লড়াই যতখানি হয়েছিল তাতে লড়াইয়ের আসল ধাক্কাটা সামলেছিল তারা আর ছাত্ররা; অস্ত্রে সুসজ্জিত এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চেয়ে ঢের ভালভাবে সুশৃঙ্খল প্রায় ৪০০০ ছাত্র হল বৈপ্লবিক বাহিনীর কেন্দ্রী উপাদান, আসল শক্তি, তখন তারা 'নিরাপত্তা কমিটির' হাতে নিছক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে রাজী ছিল না একদম। তারা 'নিরাপত্তা কমিটিকে' মানত, এমনকি তারা ছিল সেটার সবচেয়ে সোৎসাহ সমর্থক, তবু তারা ছিল স্বতন্ত্র গোছের এবং কিছুটা দুর্দান্ত সংস্থা, নিজেরা আলোচনাদি করত 'সভা-গৃহে', তারা থাকত বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের মাঝামাঝি অবস্থানে, অবিরাম আলোড়ন চালিয়ে সবকিছুকে আগেকার দৈনন্দিন নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায় থিতিয়ে যেতে দিত না, আর প্রায়ই নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিত 'নিরাপত্তা কমিটির' উপর। পক্ষান্তরে, মেহনতীজন প্রায় সবাই ছিল কাজছাড়া, রাষ্ট্রের খরচে তাদের পূর্তকার্যে কাজ দেওয়া আবশ্যক ছিল, সেজন্যে টাকা নিতে হত অবশ্য করদাতার পকেট থেকে কিংবা ভিয়েনার পৌর তহবিল থেকে। এই সবকিছু ভিয়েনার ব্যবসায়ীদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর না হয়ে পারে নি। বৃহৎ দেশের ধনী আর অভিজাত সভাসদদের ভোগ-ব্যবহারের জন্যেই ছিল নগরীর ম্যানুফ্যাকচার জাতদ্রব্য, সেগুলো স্বভাবতই বিপ্লবের ফলে এবং অভিজাত আর সভাসদদের পলায়নের দরুন একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; অচল হয়ে পড়েছিল বাণিজ্য। যাকে বলে 'আস্থা পুনঃস্থাপন' সেটার একটা উপায় ছিল না নিশ্চয়ই ছাত্র আর মেহনতী জনগণের চাঙ্গা করে রাখা আলোড়ন আর উত্তেজনা। এইভাবে, অল্প দিনের মধ্যে একদিকে বুর্জোয়া এবং অন্যদিকে দুর্দান্ত ছাত্র আর মেহনতীজনের মধ্যে সম্পর্কে ঔদাসীন্যের ভাব দেখা দিয়েছিল; এই ঔদাসীন্য দীর্ঘকালের মধ্যে পরিপক্ক হয়ে প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হয় নি, তার

কারণ পুরন হালচাল ফিরিয়ে আনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে মন্ত্রিসভা এবং বিশেষত রাজসভাসদেরা অপেক্ষাকৃত বৈপ্লবিক তরফগুলির সন্দেহ আর দুর্দান্ত ক্রিয়াকলাপে ন্যায্য বলে সমর্থন করছিল এবং এমনকি বুর্জোয়াদের চোখের সামনেই পুরন মেটারনিখী স্বৈরাচারের ভূতটাকে সর্বক্ষণ তুলে ধরছিল। এইভাবে কোন কোন নবার্জিত স্বাধীনতার উপর আক্রমণ কিংবা সেগুলিকে নষ্ট করার জন্যে সরকারের চেষ্টার দরুন ১৫ মে এবং আবার ২৬ মে ভিয়েনায় সমস্ত শ্রেণীর নতুন নতুন অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তার প্রত্যেক বারই জাতীয় রক্ষিবাহিনী বা সশস্ত্র বুর্জোয়া, ছাত্র এবং মেহনতি জনগণের মধ্যে মৈত্রীজোট আবার কিছুকালের জন্যে
হয়েছিল।

জনসমষ্টির অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে অভিজাত আর অর্থপতিরা অ
হয়েছিল, আর কৃষকেরা সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের একেবারে শেষ নিদর্শ
অবধি অপসারিত করতে ব্যাপৃত ছিল। ইতালির যুদ্ধের দরুন
এবং ভিয়েনা আর হাঙ্গেরি দরবারকে যেভাবে ব্যাপৃত রেখেছিল তার
কৃষকেরা চলতে পেরেছিল একেবারেই অবাধে এবং মুক্তির কর্মে
লাভ করেছিল জার্মানিতে অন্য যেকোন জায়গার চেয়ে বেশি অ
খুব অল্পকাল পরেই অস্ট্রিয়ার ডায়েটকে শুধু আগেই কৃষকদের কা
অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলিকে অনুমোদন করতে হয়েছিল; প্রিন্স শ্‌ভার্সেন
সরকার আর যা-ই পুনরুদ্ধার করতে পারুক না কেন, কৃষকের সামন্ত
গোলামি পুনঃস্থাপন করার সাধ্য হবে না কখনও। অস্ট্রিয়া যে
মুহূর্তে আবার অপেক্ষাকৃত শান্ত, এমনকি শক্তিশালী, তার প্রধান
হল এই যে, জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ কৃষকেরা বিপ্লবে
লাভবান হয়েছে আর পুনঃস্থাপিত সরকার আর যাকিছুর উপর
চালাক না কেন, কৃষককুলের জিতে নেওয়া এইসব প্রতীয়মান,
সুযোগসুবিধার উপর এখন অবধি হাত পড়ে নি।

লণ্ডন, অক্টোবর, ১৮৫১

৬

বার্লিনের অভ্যুত্থান

বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল বার্লিন। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে যা বলা হয়েছে তার থেকে ধারণা করা যেতে পারে, ভিয়েনায় এতে প্রায় সমস্ত শ্রেণীর যে সর্বসম্মত সমর্থন ছিল তার কাছাকাছিও ছিল না বার্লিনের কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন। প্রাশিয়ায় বুর্জোয়ারা ইতোমধ্যেই সরকারের সঙ্গে যথার্থ সংগ্রামে জড়িত ছিল। 'সম্মিলিত ডায়েট'-এর অধিবেশনের ফল হয়েছিল তাদের মধ্যে একটা কাটান-ছিঁড়েন। আসন্ন হয়ে উঠেছিল একটা বুর্জোয়া বিপ্লব, সেটা প্রথম বিস্ফোরণে ভিয়েনার মতোই সর্ববাদীসম্মত হতে পারত যদি না ঘটত ফেব্রুয়ারি মাসের প্যারিস বিপ্লব। সেই ঘটনা সবকিছুকে ত্বরান্বিত করেছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাশিয়ার বুর্জোয়ারা যে পতাকাতলে দাঁড়িয়ে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হচ্ছিল সেটা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ঐ বিপ্লবের পতাকা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ফ্রান্সে একেবারে ঠিক সেই ধরনের সরকার উৎখাত করেছিল যেমনটা প্রুশীয় বুর্জোয়ারা স্থাপন করতে যাচ্ছিল তাদের নিজেদের দেশে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘোষণা করেছিল সেটা ছিল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব; সেই বিপ্লব ঘোষণা করেছিল বুর্জোয়া সরকারের পতন এবং মেহনতীজনের মুক্তি। ওদিকে নিজেদের দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আলোড়ন ইতোমধ্যে ঢেরই হয়ে গিয়েছিল প্রুশীয় বুর্জোয়াদের বেলায়। সাইলেসিয়ার দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রথম বিভীষিকা কেটে যাবার পরে তারা এই আলোড়নটাকে নিজেদের অনুকূলে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা অবধি করেছিল। কিন্তু সেটাতে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের হিতকর আতঙ্ক বজায় ছিল সবসময়েই; তাই প্যারিস সরকারের নেতাদের তারা যখন দেখল, যাঁরা তাদের বিবেচনায় ছিলেন মালিকানা, শৃঙ্খলা, ধর্ম, পরিবার এবং আধুনিক বুর্জোয়াদের অন্যান্য কুলদেবতার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু, তৎক্ষণাৎ তাদের নিজেদের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ল। তারা বুঝল সন্ধিক্ষণটাকে চটপট কাজে লাগান দরকার এবং মেহনতী জনগণের আনুকূল্য

ছাড়া তারা পরাস্ত হবে, অথচ তাদের সাহসে কুলোল না। কাজেই প্রথম-প্রথম আংশিক এবং প্রাদেশিক বিস্ফোরণগুলিতে তারা সরকারের পক্ষাবলম্বন করল, বার্লিনে জনগণকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল, পাঁচ দিন ধরে জনগণ রাজ প্রাসাদের সামনে ভিড় করে খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করছিল এবং সরকারের পরিবর্তন দাবি করছিল। আর মেটারনিখের পতনের সংবাদের পরে রাজা* অবশেষে সামান্যকিছু অনুগ্রহ দান করলে বুর্জোয়াদের বিবেচনায় বিপ্লব সমাধা হল, রাজা তাঁর প্রজাদের সমস্ত সাধ মিটিয়েছেন বলে বুর্জোয়ারা হিজ ম্যাজেস্টিকে ধন্যবাদ জানাতে গেল। কিন্তু তারপরে এল জনতার উপর সৈন্যদের হামলা, ব্যারিকেড নির্মাণ, সংগ্রাম আর রাজবংশের পরাজয়। তখন সবকিছু বদলে গেল; যাদের পিছনে ফেলে রাখার ঝোঁক ছিল বুর্জোয়াদের সেই মেহনতী শ্রেণীকে সামনে এনে ফেলা হয়েছিল। শ্রমিকরা লড়ে জিতল এবং সহসা সচেতন হয়ে উঠল নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে। ভোটাধিকারের উপর, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর, জুরির সদস্য হবার অধিকারের উপর, সভা-সমাবেশের অধিকারের উপর বাধা-নিষেধগুলো বুর্জোয়াদের পক্ষে খুবই প্রীতিকর হত, কেননা সেগুলো শুধু তাদের নিচের শ্রেণীগুলিতেই প্রযোজ্য ছিল — সেগুলো তখন আর সম্ভব ছিল না। প্যারিসের 'অরাজকতা'র দৃশ্যাগুলোর পুনরাবৃত্তির বিপদ আসন্ন হয়ে উঠল। এই বিপদের মুখে আগেকার সমস্ত পার্থক্য ঘুচে গেল। বিজয়ী মেহনতীজন তখনও নিজের স্বার্থে কোন বিশেষ-নির্দিষ্ট দাবি প্রকাশ না করলেও তার বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গেল বহু বছরের মিত্র আর শত্রুরা, বুর্জোয়া এবং উলটে-ফেলা ব্যবস্থাটার সমর্থকদের মধ্যে মৈত্রীজোট গঠিত হল বার্লিনের ব্যারিকেডগুলোতেই। আবশ্যক সুযোগ-সুবিধা দিতে হল, কিন্তু যা অপরিহার্য তার চেয়ে বেশি কিছু নয়; 'সম্মিলিত ডায়েটে' প্রতিপক্ষ নেতাদের নিয়ে সরকার গড়া হবে বলে স্থির হল, সেটা ক্রাউন রক্ষা করতে খিদমতের প্রতিদানে পাবে পুরন শাসনব্যবস্থার সমস্ত ঠেকনো — সামন্ত অভিজাতকুল, আমলাতন্ত্র আর ফৌজের সমর্থন। এইসব শর্তেই মন্ত্রিসভা গড়ার কাজ হাতে নিলেন কাম্পহাউজেন এবং হান্‌জেমান মহাশয়েরা।

* চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্‌ম। — সম্পাঃ

জেগে-ওঠা জনগণ সম্বন্ধে নতুন মন্ত্রীদের আতঙ্কের মাত্রাটা ছিল এমনই যাতে তাদের চোখে প্রত্যেকটা উপায়ই ছিল বাঞ্ছিত, শুধু যদি সেটা কর্তৃত্বের টলে যাওয়া ভিত্তিটাকে একটু মজবুত করে। তারা, সেই হতভাগা ঠকে-যাওয়া জীবগুলি ভেবেছিল সাবেক ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হবার সমস্ত বিপদই কেটে গিয়েছিল, তাই 'শৃঙ্খলা' পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করেছিল গোটা পুরন রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে। একজনও পুরন আমলা কিংবা সামরিক অফিসার বরখাস্ত হল না; প্রশাসনের সাবেকী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটায় সামান্যতম পরিবর্তনও করা হল না। বৈপ্লবিক উদ্দীপনার প্রথম প্রাবল্যের মাঝে যেসব কর্মকর্তাকে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্রে তাদের আগেকার ঔদ্ধত্যের জন্যে জনগণ তাড়িয়ে দিয়েছিল, এমনকি তাদেরও পদে পুনর্বহাল করল ঐসব গুণী নিয়মতন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা। প্রাশিয়ায় বদলাল না কিছুই — মন্ত্রীদের চেহারাগুলো ছাড়া। এমনকি বিভিন্ন মন্ত্রিবিভাগে কর্মচারীদেরও ছোঁয়া হল না; যাদের নিয়ে হয়েছিল নব-উন্নীত শাসকদের দোহারদল, যারা ক্ষমতা আর পদ-পদবির ভাগ আশা করেছিল, সেই সমস্ত নিয়মতন্ত্রী চাকরিসন্ধানীদের বলা হল, আমলাতন্ত্রের লোকজন তখনও বিপদমুক্ত নয়, সেখানে যাতে রদ-বদল চলতে পারে সেইভাবে সুস্থিতি পুনঃস্থাপিত হওয়া অবধি তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

১৮ মার্চের অভ্যুত্থানের পরে চূড়ান্ত মাত্রায় অবমানিত হতাশাগ্রস্ত রাজা অচিরেই টের পেলেন এইসব 'উদারপন্থী' মন্ত্রীরা তাঁর পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, তিনিও তাদের পক্ষে ঠিক তেমনই প্রয়োজনীয়। বিপ্লব সিংহাসনখানাকে অব্যাহতি দিয়েছিল; 'অরাজকতা'র পথে বিদ্যমান শেষ প্রতিবন্ধক ছিল সিংহাসনখানা, তাই উদারপন্থী বুর্জোয়ারা এবং তখন মন্ত্রিসভায় তাদের নেতারা ক্রাউনের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখতে সর্বতোভাবে আগ্রহান্বিত ছিল। সেটা আবিষ্কার করতে রাজার এবং তাঁকে ঘিরে-থাকা প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রণাদাতাদের দেরি হয় নি; যেসব ছোটখাটো সংস্কার মাঝে মাঝে সাধন করতে মনস্থ করা হয়েছিল, এমনকি সেগুলোর ব্যাপারেও মন্ত্রিসভার এগোতে গেলে বাধা দেবার জন্যে তারা ঐ পরিস্থিতি দিয়ে লাভবান হয়েছিল।

সাম্প্রতিক বলপূর্বক পরিবর্তনগুলোতে একটা বিধানিক চেহারা গোছের

কিছু দেওয়াটা ছিল মন্ত্রিসভার প্রথম উৎকণ্ঠার বিষয়। জনগণের যাবতীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও জনগণের বিধিবদ্ধ এবং নিয়মতান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে 'সম্মিলিত ডায়েটের' অধিবেশন ডাকা হল পরিষদের নতুন নির্বাচনী আইন পাস করাবার জন্যে, ক্রাউনের সঙ্গে একমত হয়ে ঐ পরিষদের নতুন সংবিধান রচনা করবার কথা ছিল। নির্বাচন হবার কথা ছিল পরোক্ষ, ভোটদাতা-সাধারণ নির্বাচিত করত কিছুসংখ্যক নির্বাচক, আর তারা তখন নির্বাচিত করত প্রতিনিধিদের। সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দুই-ভাগের নির্বাচনব্যবস্থা পাস হয়েছিল। তারপরে 'সম্মিলিত ডায়েটকে' বলা হয়েছিল আড়াই কোটি ডলার ঋণের জন্যে, তার বিরোধিতা করেছিল জনতার তরফ, কিন্তু সেটাতেও সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।

মন্ত্রিসভার এইসব কাজকর্ম খুবই দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল জনতার তরফের, এখন যেটা নাম নিয়েছে গণতান্ত্রিক তরফ। খুদে ব্যাপারী আর দোকানদার শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এই তরফের পতাকাতলে বিপ্লবের শুরুতে মেহনতী জনগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সম্মিলিত হয়েছিল, এই তরফ দাবি করেছিল যেমনটা ছিল ফ্রান্সে তেমনি সরাসর এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, এক-কক্ষের বিধানসভা, এবং নতুন শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে ১৮ মার্চের বিপ্লবের পূর্ণ এবং প্রকাশ্য স্বীকৃতি। তরফের অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী অংশটা এইভাবে 'গণতন্ত্রায়িত' রাজতন্ত্র পেলে সন্তুষ্ট হত; আখেরে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দাবি করেছিল অপেক্ষাকৃত আগুয়ান অংশটা। ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মান জাতীয় পরিষদকে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে মানতে সম্মত ছিল উভয় অংশ; আর নিয়মতন্ত্রী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এই সংস্থাটার সার্বভৌমত্বকে মহা বিভীষিকা বলে ভাব দেখিয়েছিল, তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল সেটাকে তারা পুরোদস্তুর বৈপ্লবিক বলে মনে করত।

শ্রমিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র আন্দোলন বিপ্লবের ফলে কিছুকালের জন্যে ভেঙে গিয়েছিল। আন্দোলনের সাক্ষাৎ চাহিদাগুলি এবং পরিস্থিতি এমন ছিল যাতে প্রলেতারিয়ান তরফের কোন বিশেষ নির্দিষ্ট দাবিই সামনে তুলে ধরা চলত না। বাস্তবিকই, যতক্ষণ না মেহনতী জনগণের স্বতন্ত্র কর্মকাণ্ডের জমিন প্রস্তুত হচ্ছিল, যতক্ষণ না চালু হচ্ছিল সরাসর এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার, একটু বড় এবং একটু ছোট ৩৬টা রাজ্য যতক্ষণ জার্মানিকে কেটে অগুন্তি

টুকরোয় ভাগ করে রাখছিল, ততক্ষণ প্রলেতারিয়ান তরফ আর কী করতে পারত তাদের পক্ষে সর্বগুরুত্বপূর্ণ প্যারিসের আন্দোলন লক্ষ্য করা ছাড়া, আর যেসব অধিকারের সাহায্যে পরে তাদের নিজেদের স্বার্থে লড়াই সম্ভব হত সেগুলি হাসিল করার জন্যে খুদে দোকানদারদের সঙ্গে মিলে সংগ্রাম করা ছাড়া?

তখন মাত্র তিনটে বিষয়ে রাজনীতিক কর্মকান্ড দিয়ে প্রলেতারিয়ান তরফ নিজেকে মূলত পৃথক করে নিয়েছিল খুদে ব্যাপারী শ্রেণী বা মর্থাভিহিত গণতান্ত্রিক তরফ থেকে: প্রথমত, ফরাসী আন্দোলন সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ধরনে ধারণা করার ব্যাপারে, সে-প্রসঙ্গে প্যারিসের চরমপন্থী তরফটাকে গণতন্ত্রীরা বিরুদ্ধ সমালোচনা করত, আর প্রলেতারিয়ান বিপ্লবপন্থীরা সেটাকে সমর্থন করত; দ্বিতীয়ত, এক অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ঘোষণা করায়, যেখানে গণতন্ত্রীদের মধ্যে অতি প্রচন্ড চরমপন্থীরাও শুধু ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সাহস করত; আর তৃতীয়ত, প্রত্যেকটা ব্যাপারে কর্মকান্ডের সেই বৈপ্লবিক সাহস এবং তৎপরতা দেখানোতে, যে ব্যাপারে পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এবং প্রধানত তাদের নিয়ে গড়া যেকোন তরফের ঊনতা থাকে সবসময়ে।

মেহনতী জনসাধারণ বিপ্লবের শুরুতে ছিল গণতন্ত্রীদের লেজুড়, সেই জনগণকে গণতন্ত্রীদের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনতে প্রলেতারিয়ান বা যথার্থ বৈপ্লবিক তরফ কৃতকার্য হয়েছিল খুবই ক্রমে ক্রমে মাত্র। তবে গণতন্ত্রী নেতাদের দ্বিধা, দুর্বলতা এবং ভীরুতা বাদবাকিটা করেছিল যথাসময়ে, এখন বলা যেতে পারে, গত বছরের প্রচন্ড আলোড়নগুলোর একটা প্রধান ফল হল এই যে, যেখানেই শ্রমিক শ্রেণী আদৌ অনল্প জনরাশি হিসেবে একত্রিত আছে সেখানে তারা সেই গণতান্ত্রিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত যেটা ১৮৪৮ আর ১৮৪৯ সালে তাদের নিয়ে গিয়েছিল অশেষ ভুল-ভ্রান্তি আর দুর্ভাগ্যের মধ্যে। কিন্তু আমাদের আগেভাগে আলোচনা না করাই ভাল; গণতন্ত্রী ভদ্রলোকদের কাজের মাঝে দেখতে পাবার প্রচুর সুযোগই আমাদের দেবে এই দু'বছরের ঘটনাবলি।

অস্ট্রিয়ারই মতো প্রাশিয়ার কৃষককুল অবিলম্বে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে বিপ্লব থেকে লাভবান হয়েছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত

কম সক্রিয়তা দিয়ে, এখানে তাদের উপর সামন্ততন্ত্রের পেষণ মোটের উপর ঠিক তত কঠোর ছিল না। কিন্তু আগে বিবৃত কারণে প্রুশীয় বুর্জোয়ারা অবিলম্বেই চলে গিয়েছিল কৃষকদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে অপরিহার্য মিত্রদের বিরুদ্ধে। যেটাকে বলা হয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানার উপর আক্রমণ তাতে বুর্জোয়াদের মতো সমানই আতঙ্কিত গণতন্ত্রীরাও কৃষকদের সমর্থন করে নি; এইভাবে, তিন মাসের মুক্তির পরে, বিশেষত সাইলেসিয়ায় কত রক্তাক্ত সংগ্রাম আর সামরিক নিধনের পরে গতকাল অবধি সামন্ততন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়াদের হাত দিয়ে সামন্ততন্ত্র পুনঃস্থাপিত হল। এর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য তথ্য তোলা যায় না তাদের বিরুদ্ধে। শ্রেষ্ঠ মিত্রদের বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে নি ইতিহাসে আর কোন তরফ; বুর্জোয়া তরফের কপালে আরও যত শাস্তি আর অবমাননা থাকুক, তার প্রতিটি কণাই সেটার প্রাপ্য হয়েছে এই একটা কাজ দিয়েই।

লন্ডন, অক্টোবর, ১৮৫১

৭

ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ

আমাদের পাঠকদের হয়ত স্মরণে আছে, এর আগের ছ'টা প্রবন্ধে ভিয়েনায় ১৩ মার্চ এবং, বার্লিনে ১৮ মার্চের জনগণের দুটো মস্ত বিজয় অবধি জার্মানির বৈপ্লবিক আন্দোলন নিয়ে আমরা আলোচনা চালিয়েছিলাম। অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া উভয় দেশে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে এবং সমস্ত ভবিষ্য কর্মনীতির পরিচালনাকর নিয়ম হিসেবে উদারপন্থী বা বুর্জোয়াদের নীতি ঘোষিত হতে আমরা দেখেছি; কর্মকাণ্ডের এই দুটো মস্ত কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র লক্ষণীয় পার্থক্য হল এই যে, দু'জন ধনী ব্যবসায়ী সর্বশ্রী কাম্পহাউজেন এবং হান্‌জেমান মারফত উদারপন্থী বুর্জোয়ারা সরাসরি ক্ষমতা দখল করল প্রাশিয়ায়; আর অস্ট্রিয়ায় বুর্জোয়াদের রাজনীতিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল অনেক কম, সেখানে উদারপন্থী আমলাতন্ত্র

ক্ষমতায় এসে খোলাখুলি ঘোষণা করল তারা ক্ষমতা হাতে নিল বুর্জোয়াদের মোক্তারনামায়। সমাজের যেসব পার্টি আর শ্রেণী আগে পুরন সরকারের প্রতিপক্ষতায় সম্মিলিত ছিল সেগুলো বিজয়ের পরে, এমনকি সংগ্রামের সময়েই নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তাও আমরা দেখেছি; দেখেছি বিজয়ের ফলে একমাত্র যারা লাভবান হল সেই উদারপন্থী বুর্জোয়ারা কিভাবে অবিলম্বে আগের দিনের মিত্রদের থেকে মুখ ফেরাল, অপেক্ষাকৃত অগ্রসর প্রকৃতির প্রত্যেকটি শ্রেণী বা তরফের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করল এবং মৈত্রীজোট বাঁধল বিজিত সামন্ততান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক পক্ষের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, বৈপ্লবিক নাট্যের শুরু থেকেই স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল যে, অপেক্ষাকৃত বেশি র‍্যাডিকাল বিভিন্ন তরফের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে ছাড়া উদারপন্থী বুর্জোয়ারা বিজিত কিন্তু যা বিনষ্ট নয় সেই সামন্ততান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক তরফের বিরুদ্ধে কোট বজায় রাখতে পারে না, তেমনি অধিকতর র‍্যাডিকাল এই জনগণের খরস্রোতের বিরুদ্ধে সামন্ত অভিজাতকুল আর আমলাতন্ত্রের সহায়তাও তাদের সমানই প্রয়োজন। এইভাবে বেশ স্পষ্টই হয়ে গিয়েছিল যে, নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখা এবং দেশের প্রথা-প্রতিষ্ঠানাদিকে নিজেদের চাহিদা আর ভাব-ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নেবার মতো যথেষ্ট শক্তি অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় বুর্জোয়াদের ছিল না। উদারপন্থী বুর্জোয়া মন্ত্রিসভা ছিল শুধু একটা সাময়িক বিরতিস্থল, যেখান থেকে পরিস্থিতির সম্ভাব্য ফের অনুসারে দেশটিকে হয় এগিয়ে যেতে হত ঐকিক প্রজাতন্ত্রবাদের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পর্বে, নইলে ফিরে যেতে হত পুরন যাজকীয়-সামন্ততান্ত্রিক আর আমলাতান্ত্রিক রাজে। যা-ই হোক, আসল, চূড়ান্ত সংগ্রাম তখনও আসে নি; মার্চের ঘটনাবলি দিয়ে লড়াই সবে শুরু হয়েছিল।

অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া জার্মানির দুটি শাসনরত রাজ্য, তাই ভিয়েনায় কিংবা বার্লিনে প্রত্যেকটা চূড়ান্ত বিজয় নিষ্পত্তিকর হত সারা জার্মানির ক্ষেত্রে। এইভাবে, এই দুটি শহরে ১৮৪৮ সালের ঘটনাবলি যে পরিমাণে অগ্রসর হয়েছিল তাতে জার্মান বিষয়াবলির গতি নির্ধারিত হয়ে গেল। কাজেই গৌণ রাজ্যগুলিতে সংঘটিত আন্দোলনের ব্যাপারে ফিরে আসাটা নিষ্প্রয়োজনই হত, বাস্তবিকপক্ষে আমরা কেবল অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার

ব্যাপার নিয়ে বিচার-বিবেচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারতাম -- যদি এইসব গৌণ রাজ্যের অস্তিত্বের ফলে এমন একটা সংস্থা দেখা না দিত যেটার অস্তিত্বই ছিল জার্মানির অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং অনতিপূর্ববর্তী বিপ্লবের অসম্পূর্ণতার লক্ষণীয় প্রমাণ, এই সংস্থাটা এতই অস্বাভাবিক, সেটার অবস্থানেরই ফলে এতই হাস্যকর, অথচ নিজস্ব গুরুত্বে এতই ভরপুর, যাতে ইতিহাস খুব সম্ভব কখনও সেটার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারবে না। এই সংস্থাটা হল মাইন্-পাড়ের ফ্রাঙ্কফুর্টের তথাকথিত **জার্মান জাতীয় পরিষদ**।

ভিয়েনায় আর বার্লিনে জনগণের বিজয়ের পরে সারা জার্মানির একটা প্রতিনিধি পরিষদ হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিল। কাজেই নির্বাচিত হয়েছিল এই সংস্থা, সেটার অধিবেশন হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে পুরন ফেডারেটিভ ডায়েটের পাশে। জনগণ আশা করেছিল, জার্মান জাতীয় পরিষদ বিতর্কনীয় সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করবে এবং সমগ্র জার্মান কনফেডারেশনের সর্বোচ্চ বিধানিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ চালাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে, ফেডারেটিভ ডায়েট সেটার অধিবেশন ডেকেছিল, কিন্তু সেটার ক্রিয়াকলাপ স্থির করে দেয় নি কোনভাবে। সেটার ডিক্রিগুলোর আইন হিসেবে বলবত্তা থাকবে, না সেগুলো হবে ফেডারেটিভ ডায়েটের কিংবা পৃথক পৃথক সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ, তা কেউ জানত না। পরিষদের সামান্যতম কর্মোদ্যোগ থাকলে এই জটিলতার মাঝে সেটা জার্মানিতে সবচেয়ে লোক-বিরাগভাজন কর্পোরেট সংস্থা ফেডারেটিভ ডায়েটটাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করে তার জায়গায় নিজ সদস্যদের মধ্য থেকে লোক বেছে নিয়ে কায়েম করত ফেডারেল সরকার। জার্মান জনগণের সার্বভৌম সংকল্পের একমাত্র আইনগত প্রতিভূ বলে নিজেকে ঘোষণা করা দরকার ছিল সেটার এবং এইভাবে নিজের একেবারে প্রত্যেকটা ডিক্রিতে আইনগত বলবত্তা আরোপ করতে হত। সেটা সর্বোপরি নিজের আয়ত্তে নিত একটা সংগঠিত এবং সশস্ত্র শক্তি যা দেশের মধ্যে সরকারগুলোর পক্ষ থেকে আসা যেকোন বিরোধিতা দমন করার জন্যে যথেষ্ট হত। বিপ্লবের সেই গোড়ার দিককার সময়ে এই সবকিছু ছিল সহজ, খুবই সহজ। কিন্তু পরিষদটার বেশির ভাগ সদস্য ছিল উদারপন্থী অ্যাটর্নি আর পুঁথিবাগীশ অধ্যাপক, পরিষদটা ভান করত সেটা যেন জার্মান মনীষা আর বিজ্ঞানের একেবারে সারমর্মেরই প্রতিরূপ, কিন্তু আসলে সেটা ছিল

শুধু এমন একটা মঞ্চ যেখানে বুড়ো আর অবসন্ন রাজনীতিকেরা সারা জার্মানির চোখের সামনে প্রদর্শন করত তাদের অনৈচ্ছিক হাস্যকর প্রকৃতি এবং যেমন কর্মের তেমনি চিন্তনের অক্ষমতা — এমন পরিষদের কাছ থেকে উল্লিখিত কাজকর্ম প্রত্যাশা করাটা হত বড়ই বেশিকিছু। বুড়িদের এই পরিষদ সেটার অস্তিত্বের প্রথম দিনটা থেকেই সমস্ত জার্মান সরকারের যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের সাফল্যটার চেয়ে বেশি ভয় করত সামান্যতম জন-আন্দোলনকে। সেটা আলোচনাদি চালাত ফেডারেটিভ ডায়েটের চোখের সামনে, তার উপর নিজ ডিক্রিগুলোর প্রতি ফেডারেটিভ ডায়েটের অনুমোদনের কাঙাল ছিল প্রায়, কেননা সেটার প্রথম সিদ্ধান্তগুলি জারি হওয়া দরকার ছিল ঐ জঘন্য সংস্থাটাকে দিয়ে। নিজ সার্বভৌমত্ব মজবুত করার পরিবর্তে সেটা অমন বিপজ্জনক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে চলত। জনগণের সশস্ত্র শক্তি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখার বদলে সেটা সরকারগুলোর যাবতীয় অত্যাচার সম্বন্ধে চোখ বুজে থেকে পরবর্তী ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করত। সেটার একেবারে চোখের সামনেই মেইনৎসকে অবরোধের অবস্থায় রেখে সেখানকার মানুষকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল — জাতীয় পরিষদ নড়েও নি। পরে সেটা অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ইয়োহানকে জার্মানির রীজেন্ট নির্বাচিত করেছিল এবং সেটার সমস্ত সিদ্ধান্ত আইন হিসেবে বলবৎ হবে বলে ঘোষণা করেছিল। তবে কিনা, আর্চডিউক ইয়োহানকে এই নতুন সম্মানিত পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল শুধু সবকটা সরকারের সম্মতি পাবার পরে, আর পরিষদ নয়, তাঁকে নিযুক্ত করেছিল ফেডারেটিভ ডায়েট। পরিষদের ডিক্রিগুলোর আইনগত বলবত্তা — এই বিষয়টাকে বিভিন্ন বৃহত্তর সরকারগুলো কখনও মানে নি, পরিষদ নিজেও কখনও তা বলবৎ করে নি, কাজেই সেটা থেকে গিয়েছিল অনিশ্চিত অবস্থায়। এইভাবে দেখা দিয়েছিল একটা অদ্ভুত দৃশ্য: একটা পরিষদ নিজেকে একটা মহান এবং সার্বভৌম জাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করে অথচ নিজ দাবি মান্য করাবার জন্যে সেটার কখনও সংকল্পও নেই, শক্তিও না। এই জাতীয় পরিষদের বিতর্কের কোন ব্যবহারিক ফলাফল ছিল না, এমনকি ছিল না কোন তত্ত্বগত মূল্যও, কেননা এইসব বিতর্কে বিভিন্ন সেকেলে বাতিল দর্শন আর আইন সম্প্রদায়ের বহুব্যবহৃত অতি মামুলি বিষয়বস্তুর অবিকল পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই থাকত

না। সেই পরিষদে উচ্চারিত, বরং বলা ভাল স্পষ্টোক্ত প্রত্যেকটা বাক্য অনেক আগেই হাজার বার ছাপা হয়েছে হাজারগুণ ভালভাবে।

এইভাবে, জার্মানির নতুন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাহির করা সংস্থাটা সবকিছু যেমনটা পেয়েছিল সেইভাবেই রেখে দিল। তাই দীর্ঘকালের চাহিদা জার্মানির সম্মিলন হাসিল করা তো দূরের কথা, দেশের শাসকদের মধ্য থেকে অতি নগণ্য সম্রাটকেও এই পরিষদ বেদখল করল না; জার্মানির পৃথক পৃথক প্রদেশের মধ্যে মিলনের সম্পর্কটাকে সেটা ঘনিষ্ঠতর করল না; প্রাশিয়া থেকে হানোভারকে এবং অস্ট্রিয়া থেকে প্রাশিয়াকে আলাদা করে দেয় যে কাস্টম্সের বেড়া সেটাকে ভাঙার জন্যে পরিষদ এক-পাও এগোল না; প্রাশিয়ার সর্বত্র নদী-নৌবাহের ক্ষেত্রে জঘন্য প্রতিবন্ধক মাসুল তুলে দেবার সামান্যতম চেষ্টাও করল না। তবে এই পরিষদ কাজ করল যত কম, ততই বেশি করল তর্জন-গর্জন। পরিষদ গড়ল একটা জার্মান নৌবহর— কেবল কাগজপত্রে; পোল্যান্ড আর শ্লেজ্‌ভিগ দখল করল; সেটা জার্মান অস্ট্রিয়াকে ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দিল, অথচ জার্মানিতে অস্ট্রীয় সৈন্যবাহিনীর নিরাপদ আশ্রয়ে অস্ট্রীয়দের পিছু তাড়া করে যেতে ইতালীয়দের বাধা দিল; প্রায়ই হুর্‌রে ধ্বনি তুলল ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশে, আর অভ্যর্থনা করল হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রদূতদের, তারা অবশ্য জার্মানি সম্বন্ধে তালগোল পাকান ধারণা যতটা নিয়ে এসেছিল দেশে ফিরেছিল তার চেয়ে ঢের বেশিটা নিয়ে।

বিপ্লবের শুরুতে এই পরিষদটা ছিল সমস্ত জার্মান সরকারের জুজুবুড়ি। এই পরিষদের আইনগত যোগ্যতা কী সেটাকে অনির্দিষ্টতার মাঝে ছেড়ে রাখা আবশ্যক ছিল বলেই সরকারগুলো ভেবেছিল পরিষদের কর্মকান্ড হবে খুবই একনায়কত্বমূলক এবং বৈপ্লবিক। তাই এইসব সরকার এই ভয়ঙ্কর সংস্থাটার প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্যে খুবই বিস্তৃত একদফা ষড়যন্ত্র সাজিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু দেখা গেল তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে সৌভাগ্যই ছিল বেশি, কেননা সরকারগুলো নিজেদের কাজ নিজেরা যেমনটা করতে পারত তার চেয়ে ভালভাবেই সেটা করল ঐ পরিষদ। বিধান পরিষদগুলির অধিবেশন আহ্বান করাই ছিল এইসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রধান উপাদানটা, তার ফলে শুধু ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিই তাদের বিধানমণ্ডলগুলির

অধিবেশন ডাকল শুধু তাই নয়, প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়াও তাদের সংবিধান-সভা দুটোর অধিবেশন ডাকল। ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রতিনিধি-সভার মতো এই দুটোতেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল উদারপন্থী বুর্জোয়াদের কিংবা তাদের মিত্র উদারপন্থী ব্যবহারজীবী এবং আমলাতন্ত্রীদের, আর প্রত্যেকটাতে বিষয়াবলির গতিমুখের পরিবর্তন ঘটল প্রায় একই রকমের। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, জার্মান জাতীয় পরিষদ ছিল একটা কাল্পনিক দেশের পার্লামেন্ট, কেননা যা-ই হোক, যা ছিল পরিষদের নিজেরই অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যক প্রথম উপাদান, অর্থাৎ সম্মিলিত জার্মানি গঠন করা, তা সেটা পরিহার করল; সেটা তার নিজের সৃষ্টি একটা কাল্পনিক সরকারের কাল্পনিক ব্যবস্থাবলি নিয়ে আলোচনা করল, যেসব ব্যবস্থা কখনও কার্যে পরিণত হবার মতো ছিল না, আর পাস করল বিভিন্ন কাল্পনিক প্রস্তাব যেগুলো কারও ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় সংবিধান-সভা দুটো অন্তত ছিল সত্যিকারের পার্লামেন্ট, যা ভাঙত এবং গড়ত সত্যিকারের মন্ত্রীদের, আর যাদের সঙ্গে তাদের লড়তে হত সেই রাজন্যদের উপর অন্তত কিছুকালের জন্যে জোর করে চাপিয়ে দিত নিজেদের সিদ্ধান্তগুলিকে। সে-দুটোও ছিল ভীতু, বৈপ্লবিক সংকল্পের প্রসারিত অভিমতের ঊনতা ছিল তাদের; সে-দুটোও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা পুনঃস্থাপিত করেছিল সামন্ততান্ত্রিক, আমলাতান্ত্রিক এবং সামরিক স্বৈরতন্ত্রের হাতে। তবে কিনা, সে-দুটো অন্তত আশু আগ্রহজনক বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে এই পৃথিবীর মাটিতে বাস করতে বাধ্য ছিল, যখন ফ্রাঙ্কফুর্টের দমবাজেরা 'স্বপ্নের কল্পনারাজ্যে', 'im Luftreich des Traums'* বিচরণ করতে পারলে যেমনটা তেমন সুখী হত না আর কখনও। এইভাবে বার্লিন আর ভিয়েনার সংবিধান-সভার আলোচনা হল জার্মানির বৈপ্লবিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বসম্পন্ন অঙ্গ, কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্টের সমষ্টিগত ভাঁড়ামির পণ্ডিতীপনায় আগ্রহান্বিত হয় শুধু সাহিত্যঘটিত এবং প্রাচীন দুর্লভ বস্তুর সংগ্রাহকেরা।

দেশের জঘন্য অঞ্চলগত বিভাগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং ধ্বংস করে দেয়

* হাইনে, 'জার্মানি। এক শীতকালীন কাহিনী', ৭ম পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

জাতির সমষ্টিগত শক্তিকে, সেটার অবসান ঘটাবার প্রয়োজন গভীরভাবে বোধ ক'রে জার্মানির মানুষ কিছুকালের জন্যে আশা করেছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ হল অন্তত নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু সেই পণ্ডিতমানী চক্রের বালসুলভ আচরণ জাতীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল অচিরেই। মালমোয়ে-র যুদ্ধবিরতি উপলক্ষে তাদের লজ্জাকর আচরণ (সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮) (৩১) লক্ষ্য করে জনসাধারণের ক্রোধ আর ঘৃণা ফেটে পড়েছিল এই সংস্থাটার বিরুদ্ধে, সেটা জাতিকে মুক্ত উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র দেবে বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু যার জুড়ি মেলে না এমন ভীরুতার বশবর্তী হয়ে সেটা তার বদলে বর্তমান প্রতিবৈপ্লবিক ব্যবস্থা যে-ভিত্তির উপর নির্মিত সেটাকে আগেকার মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিল।

লন্ডন, জানুয়ারি, ১৮৫২

৮

পোলরা, চেকরা এবং জার্মানরা

পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে যা বলা হয়েছে তা থেকে ইতোমধ্যে স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, ১৮৪৮ সালের মার্চ মাসের বিপ্লবের পরে একটা নতুন বিপ্লব না ঘটলে জার্মানিতে সবকিছু এই ঘটনার আগে যা ছিল সেখানেই ফিরে যেত, সেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবে যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুটার উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চেষ্টা করছি সেটা এমনই জটিল ধরনের যাতে যাকে বলা যেতে পারে জার্মান বিপ্লবের বৈদেশিক সম্পর্ক সেটাকে বিবেচনায় না রেখে পরবর্তী ঘটনাবলি স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই বৈদেশিক সম্পর্কের ধরনটা ছিল স্বরাষ্ট্রীয় বিষয়াবলির ধরনেরই মতো জটিল।

একথা সুবিদিত যে, একেবারে এলবা, সালে আর বোহেমীয় বনভূমি*

---

* চেক বনভূমি। — সম্পাঃ

অবধি জার্মানির গোটা পূর্বার্ধটাকে গত হাজার বছরে স্লাভ বংশোদ্ভূত আক্রমণকারীদের হাত থেকে জয় করে নেওয়া হয়। এইসব রাজ্যক্ষেত্রের বেশির ভাগটাকে জার্মানায়িত করা হয়েছে এবং এর ফলে গত কয়েক শতাব্দী ধরে সমস্ত স্লাভ জাতিসত্তা আর ভাষা সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয়েছে। একেবারেই বিচ্ছিন্ন অল্পকিছু অবশেষ, মোট এক লাখের কম মানুষ (পোমেরানিয়ায় কাসুবিয়ানরা, লুসাশিয়ায় ভেন্দ বা সোর্বিয়ানরা) বাদে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীরা বস্তুত জার্মান। কিন্তু প্রাচীন পোল্যান্ডের সমগ্র সীমান্ত বরাবর এবং চেক্-ভাষাভাষী অঞ্চল বোহেমিয়ায় আর মরাভিয়ায় অবস্থাটা অন্য রকম। এখানে প্রত্যেকটা এলাকায় দুটো জাতিসত্তা মিশে আছে, শহরগুলি সাধারণভাবে কমবেশি জার্মান, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে স্লাভপ্রাধান্য, যদিও সেখানেও সেটা ক্রমে ভেঙে যাচ্ছে এবং জার্মান প্রভাবের সমানে অগ্রগতির মুখে পিছু হঠছে।

এমন অবস্থার কারণটা এই। শার্লেমেনের আমল থেকে বরাবর জার্মানরা সবচেয়ে ক্ষান্তিহীন এবং অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা চালিত করেছে পূর্ব ইউরোপকে জয়, উপনিবেশিত কিংবা অন্তত সভ্য করার জন্যে। এল্‌বা আর ওদের নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সামন্ত অভিজাতকুলের দেশজয়গুলো এবং প্রাশিয়ায় আর লিভনিয়ায় নাইটদের সামরিক সম্প্রদায়ের সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশগুলো ব্যাপারী আর ম্যানুফ্যাকচারিং বুর্জোয়াদের দ্বারা জার্মানীকরণের ঢের বেশি বিস্তৃত এবং কার্যকর প্রণালীর জমিনই প্রস্তুত করেছিল শুধু, বাদবাকি পশ্চিম ইউরোপের মতো জার্মানিতেও এই বুর্জোয়ারা সামাজিক এবং রাজনীতিক গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল পনর শতক থেকে। স্লাভরা এবং বিশেষত পশ্চিম-স্লাভরা (পোল্‌রা আর চেক্‌রা) নিতান্তই কৃষিজীবী জাতি, বাণিজ্য আর ম্যানুফ্যাকচার কখনও তারা বড় একটা পছন্দ করত না। তার পরিণতি হল এই যে, এইসব অঞ্চলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং নগর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারজাত সমস্ত জিনিসের উৎপাদন পড়েছিল জার্মান পরদেশীদের হাতে, আর কৃষিজাত দ্রব্যের সঙ্গে ঐসব পণ্যের বিনিময়ের ব্যাপারটা হয়ে পড়েছিল শুধু ইহুদিদের একচেটে, কোন জাতিসত্তার অন্তর্গত হলে এরা এইসব অঞ্চলে নিশ্চয়ই স্লাভদের চেয়ে বেশি পরিমাণে জার্মানই। সমগ্র পূর্ব ইউরোপেই অবস্থাটা এই রকমের, যদিও কিছু কম

মাত্রায়। পিটার্সবুর্গে, পেশ্‌ট্-এ, ইয়াস্‌সিতে, এমনকি কনস্টান্টিনোপ্‌লেও অদ্যাবধি কারিগর, ছোট দোকানদার, খুদে ম্যানুফ্যাকচারার হল জার্মান, আর মহাজন, শুঁড়ি, হকার — এইসব জনবিরল অঞ্চলে সে খুবই ভারি লোক — খুবই সাধারণ ইহুদি, যার মাতৃভাষা হল ভীষণ বিকৃত জার্মান। শহর, বাণিজ্য এবং ম্যানুফ্যাকচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্তী স্লাভ এলাকাগুলিতে জার্মান উপাদানটার গুরুত্ব নিয়মিতভাবে বাড়ছিল, সেটা আরও বেড়ে গিয়েছিল যখন দেখা যায় মানস সংস্কৃতির প্রায় প্রত্যেকটা উপাদান আমদানি করতে হয় জার্মানি থেকে। জার্মান ব্যাপারী আর কারিগরের পরে স্লাভ মাটিতে এসে কায়েমী হয়ে বসেছিল জার্মান পাদরি, জার্মান বিদ্যালয়-শিক্ষক, জার্মান পণ্ডিত। শেষে, সামাজিক বিকাশধারায় বিজাতীয়করণের ধীর কিন্তু নিশ্চিত অগ্রগতির পরে গেল শুধু নয়, তার থেকে বহুগুণ আগে চলে গেল বিজেতা বাহিনীগুলোর লৌহ পদক্ষেপ, কিংবা কূটনীতির সাবধানী, সুপরিকল্পিত হস্তমুষ্টি। এইভাবে, ঐসব সন্নিহিত এলাকায় জার্মান ঔপনিবেশিকদের কাছে বিভিন্ন সরকারী জমিদারি বিক্রি করে এবং তা তাদের অনুদান হিসেবে দিয়ে, ম্যানুফ্যাক্টরি স্থাপন করার জন্যে জার্মান পুঁজিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, ইত্যাদি উপায়ে, এবং প্রায়ই ঐ অঞ্চলের পোল্‌ বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে নিদারুণ স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা অবলম্বন করে পোল্যান্ডের প্রথম বিভাগের পর থেকে পশ্চিম প্রাশিয়া আর পজ্‌নানের মস্ত মস্ত অংশকে জার্মানায়িত করা হয়েছে।

সুতরাং, গত সত্তর বছরে জার্মান আর পোলীয় জাতিসত্তার মধ্যকার সীমারেখা একেবারেই বদলে গেছে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সঙ্গেসঙ্গেই জাগিয়ে তুলেছিল সমস্ত উৎপীড়িত জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের দাবি এবং তাদের নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই মীমাংসা করার অধিকারের দাবি, তাই ১৭৭২ সালের আগে (৩২) প্রাচীন পোলীয় প্রজাতন্ত্রের সীমান্তের ভিতরে দেশ পুনঃস্থাপনের জন্যে পোল্‌রা তৎক্ষণাৎ দাবি তুলল. এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। জার্মান এবং পোলীয় জাতিসত্তার মধ্যকার সীমানির্দেশক হিসেবে ধরলে এই সীমান্ত এমনকি তখনও অচলিত হয়ে পড়েছিল. তা ঠিক: সেটা আরও বেশি প্রতিবছর জার্মানীকরণের অগ্রগতির ফলে। তবে কিনা, পোল্যান্ড পুনঃস্থাপনের জন্যে জার্মানরা এতই উৎসাহ জাহির করেছিল যাতে

তাদের নিশ্চয়ই অনুমান করা দরকার যে, তাদের সহানুভূতির আন্তরিকতার প্রথম প্রমাণ হিসেবে লুঠের **তাদের** হিস্সাটাকে ছেড়ে দিতে বলা হবে। অন্য দিকে, প্রধানত জার্মানদের অধ্যুষিত গোটা গোটা এলাকা, বড় বড় পুরোপুরি জার্মান শহর কি ছেড়ে দিতে হবে এমন একটা জাতির হাতে যেটা কৃষিক্ষেত্রের ভূমিদাসপ্রথার ভিত্তিতে স্থাপিত সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা ছাড়িয়ে এগোবার সামর্থ্যের কোন প্রমাণই তখন অবধি কখন দেয় নি? প্রশ্নটা জটিলই ছিল বটে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধেই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য মীমাংসা; তখন আমূল পরিবর্তিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে সীমানির্দেশের প্রশ্নটাকে করা হত একই শত্রুর বিরুদ্ধে নিরাপদ সীমান্ত কায়েম করা সংক্রান্ত প্রধান প্রশ্নটার সঙ্গে তুলনায় গৌণ। পুবে সম্প্রসারিত বিরাট অঞ্চল পেয়ে পোল্‌রা তাদের দাবিতে পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নমনীয় এবং পরিমিত হত; আর যা-ই হোক, রিগা আর মিতাভা* তাদের কাছে দান্‌জিগ আর এলবিং**-এর মতো সমানই গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচিত হত। এইভাবে জার্মানিতে আগুয়ান তরফটি ইউরোপের মূলভূখণ্ডের আন্দোলন চালু রাখার জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আবশ্যক বিবেচনা ক'রে, এবং পোল্যান্ডের এমনকি একাংশেরও জাতীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে এমন যুদ্ধ বাধা অবশ্যম্ভাবী মনে ক'রে পোল্‌দের সমর্থন করল। তখন আধিপত্যশালী উদারপন্থী বুর্জোয়া তরফ স্পষ্ট বুঝতে পারল রাশিয়ার সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধে তাদের পতন ঘটবে — ঐ যুদ্ধের ফলে পরিচালনে এসে যাবে অপেক্ষাকৃত সক্রিয় এবং কর্মতৎপর লোকজন, কাজেই জার্মান জাতিসত্তার সম্প্রসারের জন্যে উৎসাহ-আগ্রহের ভান করে তারা পোলীয় বৈপ্লবিক আলোড়নের প্রধান কেন্দ্র প্রুশীয় পোল্যান্ডকে ভাবী জার্মান সাম্রাজ্যের অপরিহার্য অংশ বলে ঘোষণা করল। উত্তেজনার প্রথম দিনগুলিতে পোল্‌দের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙা হল লজ্জাকরভাবে; সরকারের মঞ্জুরি অনুসারে প্রস্তুত-করা পোলীয় সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ এবং ধ্বংস করা হল প্রুশীয় গোলন্দাজবাহিনী দিয়ে; ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসেই, বার্লিন বিপ্লবের পরে মাত্র ছ'সপ্তাহের মধ্যেই পোলীয় আন্দোলন

* লাতভীয় নাম: ইয়েল্‌গাভা। — সম্পাঃ

** পোলীয় নাম: গ্দান্স্ক এবং এল্‌ব্লং। — সম্পাঃ

বিধ্বস্ত করা হল, পুনরুজ্জীবিত হল পোল্ আর জার্মানদের মধ্যে জাতিগত বৈরিতা। রুশী স্বৈরশাসকের এই বিপুল এবং অপরিমেয় খিদমত করেছিলেন উদারপন্থী ব্যাপারী-মন্ত্রিদ্বয় কাম্পহাউজেন আর হান্‌জেমান। আরও বলা দরকার, পোল্যান্ড অভিযান ছিল প্রুশীয় ফৌজকে পুনঃসংগঠিত করার এবং আত্মপ্রত্যয় দেবার প্রথম উপায়, আর সেই ফৌজই পরে উদারপন্থী পার্টিকে বিতাড়িত করেছিল এবং সর্বশ্রী কাম্পহাউজেন আর হান্‌জেমানের অনেক কষ্ট করে সযত্নে গড়ে-তোলা আন্দোলনটাকে বিধ্বস্ত করেছিল। 'যা দিয়ে তারা অপরাধ করেছিল, তাই দিয়ে তাদের শাস্তি হল।' লেদ্রু-রলাঁ থেকে শাঙ্গার্নিয়ের, আর কাম্পহাউজেন থেকে হাইনাউ পর্যন্ত —১৮৪৮ আর ১৮৪৯ সালের সমস্ত হঠাৎ নবাবের পরিণতি ঘটেছিল এমনই।

জাতিসত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল বোহেমিয়ায়ও। কুড়ি লক্ষ জার্মান এবং চেক্-ভাষাভাষী তিরিশ লক্ষ স্লাভদের অধ্যুষিত এই অঞ্চলটার মস্ত মস্ত ঐতিহাসিক অনুস্মৃতি ছিল, সেগুলির প্রায় সবই চেক্‌দের আগেকার আধিপত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে কিনা, ১৫ শতকে হুস্‌সাইটদের যুদ্ধের (৩৩) পর থেকে ভেঙে পড়েছিল স্লাভ বংশের এই শাখাটার প্রতাপ; চেক্-ভাষাভাষী প্রদেশগুলি ভাগ-ভাগ হয়ে গিয়েছিল, একটা ভাগ ছিল বোহেমিয়া রাজ্য, আর-একটা ছিল রাজন্য-শাসিত মরাভিয়া, আর তৃতীয়টা ছিল স্লোভাকদের কার্পেথিয়ান পার্বত্য অঞ্চল, সেটা হাঙ্গেরির অংশ। মরাভীয়দের আর স্লোভাকদের জাতিগত অনুভূতি আর প্রাণশক্তির সমস্ত নিদর্শন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল অনেককাল আগেই, যদিও তাদের ভাষা বজায় ছিল বহুলাংশে। বোহেমিয়া চার দিকের তিন দিক থেকে ঘেরা ছিল সম্পূর্ণভাবে জার্মান অঞ্চল দিয়ে। বোহেমিয়ার নিজের অঞ্চলে জার্মানদের বিস্তর উন্নতি হয়েছিল; এমনকি রাজধানী প্রাগেও জাতিসত্তা-দুটি সংখ্যায় মোটামুটি সমকক্ষই ছিল; আর সর্বত্রই পুঁজি, বাণিজ্য, শিল্প এবং মানস সংস্কৃতি ছিল জার্মানদের হাতে। চেক্ জাতিসত্তার প্রধান সমর্থক প্রফেসর পালাস্‌কি নিজে একজন খেপে-যাওয়া জার্মান বিদ্বান্ ছাড়া কিছু নন, এখনও তিনি নির্ভুল এবং বৈদেশিক স্বরাঘাত ছাড়া চেক্ ভাষা বলতে পারেন না। চেক্ জাতিসত্তা লুপ্তপ্রায় -- গত চার-শ' বছর ধরে ইতিহাসে জানা প্রত্যেকটা তথ্য অনুসারে লুপ্তপ্রায়, কিন্তু যেমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে, সেটা আগেকার

প্রাণশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে একটা শেষ চেষ্টা করেছিল ১৮৪৮ সালে, তবে, যাবতীয় বৈপ্লবিক বিচার-বিবেচনা থেকে অনপেক্ষভাবে, সেই চেষ্টার ব্যর্থতা থেকে এটা প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, অতঃপর বোহেমিয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে কেবল জার্মানির একটা অংশ হিসেবেই, যদিও সেটার বাসিন্দাদের একাংশ আরও কয়েক শতাব্দী ধরে কথা বলে চলতে পারে একটা অ-জার্মান ভাষায় (৩৪)।

লণ্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

৯

সর্ব-স্লাভ সমন্বয়নীতি। শ্লেজ্‌ভিগ-হোল্‌স্টাইনের যুদ্ধ

বোহেমিয়া এবং ক্রোয়েশা (স্লাভ জাতির আর-একটি ছত্রভঙ্গ অঙ্গ, যেটার প্রতি হাঙ্গেরীয়দের আচরণ হল বোহেমিয়ার প্রতি জার্মানদের আচরণের মতো) ছিল ইউরোপের মূলভূমিতে যা 'সর্ব-স্লাভ সমন্বয়নীতি' বলে পরিচিত সেটার উৎপত্তিস্থল। স্বাধীনভাবে জাতি হিসেবে বিদ্যমান থাকার মতো যথেষ্ট শক্তি বোহেমিয়ারও ছিল না, ক্রোয়েশারও না। তাদের নিজ নিজ জাতিসত্তা ক্রমে ক্ষয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণের ক্রিয়াফলে, তাতে কোন জাতিসত্তাকে গিলে ফেলে অপেক্ষাকৃত তেজীয়ান কোন জাতি, সেটা অবশ্যম্ভাবী, তারা স্বাতন্ত্র্য গোছের কিছু পুনঃস্থাপনের আশা করতে পারত শুধু অন্যান্য স্লাভ জাতির সঙ্গে মৈত্রীজোট বেঁধে। ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ পোল্, সাড়ে চার কোটি রুশী, ৮০ লক্ষ সার্বীয় আর বুলগেরীয় — এই গোটা ৮ কোটি স্লাভদের নিয়ে পরাক্রমশালী কনফেডারেশন গড়ে পবিত্র স্লাভভূমি থেকে অনধিকার-প্রবেশকারী তুর্কীদের, হাঙ্গেরীয়দের এবং, সর্বোপরি, ঘৃণ্য কিন্তু প্রয়োজনীয় 'Niemetz' — জার্মানদের খেদিয়ে দেওয়া কিংবা ঝাড়ে-মূলে বিনষ্ট করা যায় তো! এইভাবে, ইতিহাস বিজ্ঞানে অল্প কয়েক জন পল্লবগ্রাহী স্লাভের অধ্যয়নকক্ষে ফাঁদা হয়েছিল এই হাস্যকর ইতিহাসবিরোধী আন্দোলন; সভ্য পশ্চিমকে বর্বর পূবের অধীন করা,

শহরকে গ্রামাঞ্চলের বশবর্তী, বাণিজ্য, ম্যানুফ্যাকচার আর মানস সংস্কৃতিকে স্লাভ ভূমিদাসদের আদিম ধরনের কৃষির বশীভূত করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, তার চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু এই হাস্যকর তত্ত্বের পিছনে ছিল **রুশ সাম্রাজ্যের** ভয়ঙ্কর বাস্তবতা, এই সাম্রাজ্য প্রত্যেকটা নড়াচড়া দিয়ে জাহির করে যে, সারা ইউরোপকে খাস ভূমিসম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার ন্যায্য দাবিদার হল স্লাভ জাতি, বিশেষত এই জাতির একমাত্র কর্মতৎপর অংশ রুশীরা; এই সাম্রাজ্যের সেণ্ট পিটার্সবুর্গ আর মস্কো এই দুটো রাজধানী থাকতেও, প্রত্যেকটি রুশী কৃষক যেটাকে মনে করে তার ধর্ম আর জাতির আদত রাজধানী সেই **'জারের নগরী'** (কনস্টান্টিনোপল্, রুশ ভাষায় বলে ৎসারিগ্রাদ, অর্থাৎ জারের নগরী) প্রকৃতপক্ষে তাদের সম্রাটের বাসস্থান না হওয়া পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য এখনও সেটার ভারকেন্দ্র পায় নি; গত ১৫০ বছরে এই সাম্রাজ্য যত যুদ্ধ বাধিয়েছে তার কোনটায় রাজ্যক্ষেত্র হারায় নি, প্রত্যেকটায় রাজ্যক্ষেত্র জিতে নিয়েছে। রুশী কর্মনীতি যেসব ষড়যন্ত্র দিয়ে সর্ব-স্লাভ সমন্বয়ের অভিনব তত্ত্বটাকে সমর্থন করেছিল সেটা মধ্য ইউরোপে সুবিদিত; রুশী কর্মনীতির অভীষ্টের পক্ষে এই তত্ত্বটার চেয়ে উপযোগী আর কিছুই উদ্ভাবিত হতে পারত না। এইভাবে, সর্ব-স্লাভ সমন্বয়ের সমর্থক বোহেমীয়রা আর ক্রোয়েশীয়রা, কেউ ইচ্ছাপূর্বক, কেউ অজানতে কাজ করেছিল রাশিয়ার সরাসর স্বার্থে; বৈপ্লবিক কর্মব্রতের প্রতি তারা বেইমানি করেছিল শুধু জাতিসত্তার আদলটুকুর জন্যে, সেটা হলে তাদের বরাতে জুটত বড়জোর রুশ প্রভাবাধীন পোলীয় জাতিসত্তার মতো অবস্থা। তবে পোল্‌দের সম্মানার্থে এটা বলতেই হবে যে, এইসব সর্ব-স্লাভ সমন্বয়ের ফাঁদে তারা কখনও গুরুতরভাবে জড়িয়ে পড়ে নি; অল্পকিছু অভিজাত হয়ে উঠেছিল ঘোর সর্ব-স্লাভ সমন্বয়পন্থী, তারা জানত তাদের নিজেদের কৃষক ভূমিদাসদের বিদ্রোহের চেয়ে রাশিয়ার অধীনতা থেকে তারা হারাত কম।

বোহেমীয়রা আর ক্রোয়েশীয়রা তখন সার্ব স্লাভীয় মৈত্রীজোটের প্রস্তুতির জন্যে একটা সাধারণ স্লাভ কংগ্রেস ডেকেছিল প্রাগে (৩৫)। অস্ট্রীয় সৈন্যদলের হস্তক্ষেপ না হলেও এই কংগ্রেস ব্যর্থ প্রতিপন্ন হত। স্লাভ ভাষা আছে কয়েকটা, সেগুলির মধ্যে পার্থক্য ইংরেজী, জার্মান আর সুইডেনীয় ভাষার মধ্যকার পার্থক্যেরই মতো, কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ হলে বক্তাদের

কথা সবার বোধগম্য করার মতো কোন একটা ভাষা ছিল না। ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে দেখা হয়েছিল, সেটা ছিল অধিকাংশের কাছে সমানই অবোধগম্য, বেচারা স্লাভ-উৎসাহীদের একমাত্র অভিন্ন অনুভব ছিল জার্মানদের বিরুদ্ধে সবার একই ঘৃণা, তারা শেষে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল ঘৃণ্য জার্মান ভাষায়, একমাত্র যেটা তারা সবাই বুঝত! কিন্তু ঠিক তখনই প্রাগে সমবেত হচ্ছিল আর-একটা স্লাভ কংগ্রেস, সেটা ছিল গ্যালিসীয় ল্যান্সার, ক্রোয়েশীয় আর স্লোভাক গ্রিনেডিয়ার এবং বোহেমীয় গোলন্দাজ আর কুইর্যাসিয়াররের, আর এই আসল, সশস্ত্র স্লাভ কংগ্রেস ভিন্দিশ্‌গ্রেৎস-এর সেনাপতিত্বে চব্বিশ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে কাল্পনিক স্লাভ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের শহর থেকে খেদিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল।

অস্ট্রিয়ার সংবিধান-ডায়েটে বোহেমীয়, মরাভীয়, দলমেশীয় এবং অংশত পোলীয় ডেপুটিরা (অভিজাত) ঐ পরিষদে জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রণালীবদ্ধ লড়াই চালিয়েছিল। এই পরিষদে জার্মানরা এবং পোল্‌দের একাংশ (গরিব হয়ে পড়া অভিজাতেরা) ছিল বৈপ্লবিক অগ্রগতির প্রধান সমর্থক। স্লাভ ডেপুটিদের প্রধান অংশটা তাদের বিরোধিতা করেছিল, এইভাবে নিজেদের সমগ্র আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাটাকে স্পষ্ট প্রদর্শন করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তারা এতখানি নেমে গিয়েছিল যাতে যে অস্ট্রীয় সরকার প্রাগে তাদের সভা ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল সেটারই সঙ্গে মিলে চালিয়েছিল গুপ্ত যোগসাজশ আর চক্রান্ত। এই কলঙ্কজনক আচরণের জন্যে তারা প্রতিফলও পেয়েছিল। ১৮৪৮ সালে অক্টোবর অভ্যুত্থানের সময়ে তারা সরকারকে সমর্থন করেছিল, এই ঘটনা থেকে শেষে সংবিধান-ডায়েটে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল; সেই প্রায় পুরোপুরি স্লাভ ডায়েটটাকে ভেঙে দিয়েছিল অস্ট্রীয় সৈনিকেরা, প্রাগ কংগ্রেসেরই মতো, আর সর্ব-স্লাভ সমন্বয়পন্থীরা ফের নড়াচড়া করলে তাদের জেলে পোরা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। আর তারা পেয়েছে শুধু এই যে, অস্ট্রীয় কেন্দ্রীকরণের ফলে এখন সর্বত্রই খর্ব হচ্ছে স্লাভ জাতিসত্তা, এই পরিণামের জন্যে তারা দায়ী করতে পারে শুধু নিজেদের উন্মত্ততা আর অন্ধতাকেই।

হাঙ্গেরি এবং জার্মানির সীমান্ত সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকলে আর-একটা ঝগড়া নিশ্চয়ই হত সেখানে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত,

সেখানে কোন ছুতো ছিল না, উভয় জাতির স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকায় তারা সংগ্রাম চালিয়েছিল একই শত্রুদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ অস্ট্রীয় সরকার এবং সর্ব-স্লাভ সমন্বয়পন্থী উন্মত্ততার বিরুদ্ধে। এই সমঝতায় মুহূর্তের জন্যেও কোন গোলযোগ ঘটে নি। কিন্তু ইতালীয় বিপ্লব জার্মানির অন্তত একাংশকে পারস্পরিক ধ্বংসকর যুদ্ধে জড়িয়ে নিয়েছিল; জন-মনের বিকাশ পিছিয়ে রাখতে মেটারনিখীয় ব্যবস্থাটা কতখানি কৃতকার্য হয়েছিল তার একটা প্রমাণ হিসেবে এখানে বলা দরকার, যারা ১৮৪৮ সালের প্রথম ছ'মাসে ভিয়েনায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল সেই লোকেরাই উৎসাহে ভরপুর হয়ে ইতালীয় দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে ফৌজে যোগ দিয়েছিল। তবে ভাব-ধারণার এই শোচনীয় তালগোল পাকান অবস্থা দীর্ঘকাল চলে নি।

শেষে, শ্লেজ্‌ভিগ আর হোল্‌স্টাইন নিয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ। জাতিসত্তা, ভাষা এবং প্রবণতার দিক থেকে অঞ্চল-দুটি তর্কাতীতভাবেই জার্মান, তাছাড়া, সামরিক, নৌবাহিনী এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যিক কারণে জার্মানির পক্ষে প্রয়োজনীয়। গত তিন বছর ধরে অঞ্চল-দুটির বাসিন্দারা ডেনমার্কের প্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছে। অধিকন্তু, সন্ধিচুক্তি সংক্রান্ত অধিকার তাদেরই। মার্চের বিপ্লবের ফলে ডেন্‌দের সঙ্গে তাদের প্রকাশ্য সংঘাত ঘটে, আর জার্মানি তাদের সমর্থন করে। পোল্যান্ডে, ইতালিতে, বোহেমিয়ায় এবং পরে হাঙ্গেরিতে সামরিক অভিযান যৎপরোনাস্তি সতেজে চালান হলেও, এক্ষেত্রে, এই একমাত্র জনযুদ্ধে, অন্তত অংশত এই একমাত্র বৈপ্লবিক যুদ্ধে কিন্তু নিষ্পত্তিহীন অভিযান আর পাল্টা-অভিযানের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, আর প্রয়োগ করা হয়েছিল বৈদেশিক কূটনীতিক হস্তক্ষেপ, যার ফলে বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধবিগ্রহের পরে সমাপ্তিটা হয় অতি শোচনীয়। এই যুদ্ধের মধ্যে জার্মান সরকারগুলি প্রত্যেকটা উপলক্ষে শ্লেজ্‌ভিগ-হোল্‌স্টাইন বৈপ্লবিক ফৌজের প্রতি বেইমানি করে এবং যখন ফৌজটা ছত্রভঙ্গ কিংবা ভাগ-ভাগ হয়ে পড়ে তখন ইচ্ছে করে সেটাকে ডেন্‌দের হাতে কচু-কাটা হতে দেয়। একই আচরণ করা হয় জার্মান স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর প্রতি।

কিন্তু জার্মান নামটা যখন এইভাবে চতুর্দিক থেকে শুধু ঘৃণাই কুড়োয়, জার্মান নিয়মতান্ত্রিক এবং উদারপন্থী সরকারগুলো আনন্দে গদ্‌গদ

হয়ে উঠেছিল। পোলীয় আর বোহেমীয় আন্দোলন-দুটিকে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পেরেছিল। সর্বত্র তারা জিইয়ে তুলেছিল পুরন জাতিগত শত্রুতা, সেটা অতঃপর জার্মানদের, পোলদের ইতালীয়দের সমস্ত সাধারণী সমঝতা এবং কর্মকান্ড রোধ করেছিল। মানুষকে তারা গৃহযুদ্ধ এবং সৈন্যদের দমন-পীড়নের দৃশ্যে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। প্রুশীয় ফৌজ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল পোল্যান্ডে, অস্ট্রীয় ফৌজ — প্রাগে; শ্লেজভিগে আর লম্বার্ডিতে বৈপ্লবিক হলেও অদূরদর্শী নওজোয়ানের অঢেল প্রচুর দেশপ্রেমের (হাইনের ভাষায় 'die patriotische Überkraft'*) পরিণাম হয়েছিল শত্রুর ছটরা-গুলিতে বিনাশ, সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়ার আদত হাতিয়ার উভয় নিয়মিত ফৌজ বিদেশীদের উপর জয়লাভের সাহায্যে সাধারণের সুনজর পুনঃপ্রাপ্তির অবস্থায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা আবার বলি: অপেক্ষাকৃত অগ্রসর তরফের বিরুদ্ধে অভিযানের উপকরণ হিসেবে উদারপন্থীদের দ্বারা শক্তিশালী করে তোলা এই ফৌজ-দুটো যেইমাত্র কিছু পরিমাণ আত্মবিশ্বাস আর শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করেছিল, অমনি তারা ঘুরে উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পুরন ব্যবস্থার লোকজনকে ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত করেছিল। রাডেটস্কি যখন আদিজে নদীর পিছনে তাঁর শিবিরে ভিয়েনার 'দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের' প্রথম হুকুম পেয়েছিলেন, তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন: 'এই মন্ত্রীরা কারা? তারা তো অস্ট্রিয়ার সরকার নয়! এখন আমার শিবিরে ছাড়া কোথাও নেই অস্ট্রিয়া; আমি আর আমার ফৌজ -- আমরাই অস্ট্রিয়া; ইতালীয়দের যখন আমরা গুঁড়িয়ে দেব, তখন আমরা সাম্রাজ্য পুনর্জয় করব সম্রাটের জন্যে!' বৃদ্ধ রাডেটস্কি ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু ভিয়েনার অক্ষম, 'দায়িত্বশীল' মন্ত্রীরা কর্ণপাত করে নি তাঁর কথায়।

লন্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

* হাইনে, 'প্যারিসে রাত্রের পাহারাওয়ালার আগমন' ('আধুনিক কবিতাগুচ্ছ' থেকে)। — সম্পাঃ

প্যারিসের বিদ্রোহ। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ

১৮৪৮ সালে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকেই ইউরোপ মহাদেশে বৈপ্লবিক খরস্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; প্রথম বিজয়ে লাভবান হয়েছিল সমাজের যেসব শ্রেণী সেগুলি অবিলম্বে বিজিতদের সঙ্গে মৈত্রীজোট গড়ে এটা ঘটিয়েছিল। ফ্রান্সে পেটি বুর্জোয়ারা এবং বুর্জোয়াদের প্রজাতান্ত্রিক অংশটা রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। জার্মানিতে আর ইতালিতে বিজয়ী বুর্জোয়ারা জনগণ আর পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সামন্ত অভিজাতবর্গ, সরকারী আমলাতন্ত্র এবং ফৌজের সমর্থন প্রার্থনা করেছিল। সম্মিলিত রক্ষণপন্থী এবং প্রতিবৈপ্লবিক তরফগুলি প্রাবল্য আবার পুনরুদ্ধার করেছিল অচিরেই। ইংলণ্ডে একটা অকালিক এবং খারাপভাবে আয়োজিত জন-বিক্ষোভপ্রদর্শন (১০ এপ্রিল) আন্দোলনের পার্টির পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরাজয়ে পরিণত হয়েছিল (৩৬)। ফ্রান্সে দুটি অনুরূপ আন্দোলন (১৬ এপ্রিল (৩৭) এবং ১৫ মে (৩৮)) সমানেই পরাস্ত হয়েছিল। ইতালিতে রাজা-বোমা* নিজ কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছিলেন ১৫ মে এক-ঘায়ে (৩৯)। জার্মানিতে পৃথক পৃথক নতুন বুর্জোয়া সরকারগুলি এবং তাদের নিজ নিজ সংবিধান-সভা সংহত হয়ে উঠেছিল; ঘটনাবহুল ১৫ মে ভিয়েনায় জনগণের যে জয় হয়েছিল সেটা ছিল শুধু গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা, সেটাকে জন-কর্মতৎপরতার শেষ সফল ঝলকানি বলে ধরা যেতে পারে। মনে হচ্ছিল হাঙ্গেরিতে আন্দোলন বয়ে গেল সম্পূর্ণ বৈধতার নিরুপদ্রব খাতে; আর পোলীয় আন্দোলনকে প্রুশীয় বেয়নেট অংকুরে বিনষ্ট করল, যা আমরা দেখেছি আমাদের আগের একটা কিস্তিতে। তবে ঘটনাবলি শেষপর্যন্ত কোন্ দিকে মোড় ঘুরবে সেটা তখনও কিছুতেই নির্ধারিত হয়ে যায় নি, আর বিভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক

---

* দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড। — সম্পাঃ

তরফগুলির খোয়া যাওয়া প্রতি ইঞ্চি জমিন চূড়ান্ত কর্মকান্ডের জন্যে তাদের কাতারগুলিকে ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে সংহতই করেছে শুধু।

সেই চূড়ান্ত কর্মকান্ড ঘনিয়ে আসছিল। সেটা গড়া যেত কেবল ফ্রান্সেই; কেননা, বৈপ্লবিক সংগ্রামে ইংলন্ড যতক্ষণ কোন অংশগ্রহণ করছিল না, আর জার্মানি থাকছিল বিভক্ত হয়ে, ততক্ষণ জাতীয় স্বাধীনতা, সভ্যতা এবং কেন্দ্রীকরণের কারণে ফ্রান্সই ছিল চারদিককার দেশগুলিতে মহা আলোড়নের প্রেরণা সঞ্চারিত করার একমাত্র দেশ। এইভাবে, ১৮৪৮ সালে ২৩ জুন (৪০) প্যারিসে যখন শুরু হল রক্তাক্ত সংগ্রাম, যখন পর-পর প্রত্যেকটি তার কিংবা ডাকের সংবাদ ইউরোপের চোখের সামনে এটা স্পষ্ট খুলে ধরল যে, সেটা ছিল একদিকে মেহনতী জনসাধারণ এবং অন্য দিকে প্যারিসের জনসমষ্টির অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর (ফৌজের সমর্থিত) মধ্যে সংগ্রাম, যখন লড়াই চলল কয়েক দিন ধরে, আধুনিক গৃহযুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে যেটার উত্তেজনা-অস্থিরতার কোন জুড়ি নেই, অথচ কোন পক্ষেরই প্রাধান্য প্রতীয়মান হল না — তখন প্রত্যেকের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, এটাই সেই চূড়ান্ত মস্ত লড়াই যেটা অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হলে সমগ্র ইউরোপকে ছেয়ে ফেলবে নতুন নতুন বিপ্লবের মহাপ্লাবনে, আর সেটা দমিত হলে প্রতিবৈপ্লবিক শাসন পুনঃস্থাপিত হবে অন্তত সাময়িকভাবে।

প্যারিসের প্রলেতারিয়ানরা পরাস্ত হল, নিহত হল ব্যাপকভাবে, বিধ্বস্ত হল, সেটা এতখানি কার্যকর হয়েছিল যাতে অদ্যাবধি তারা সেই আঘাত থেকে সামলে উঠতে পারে নি। অবিলম্বে ইউরোপের সর্বত্র নতুন এবং পুরন রক্ষণপন্থী আর প্রতিবিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেটা এতই ধৃষ্ট যাতে দেখা গিয়েছিল ঘটনাটার গুরুত্ব তারা বুঝেছিল কত ভালভাবে। পত্র-পত্রিকার উপর হামলা চলেছিল সর্বত্র, সভা-সমিতির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হয়েছিল, প্রত্যেকটা ছোট মফস্বল শহরে প্রত্যেকটা সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে জনগণকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল, ঘোষণা করা হয়েছিল অবরোধের অবস্থা, কাভেনিয়াকের শেখান নতুন ধরনের সামরিক গতিবিধি এবং কৌশল অনুসারে সৈন্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, ফেব্রুয়ারি মাসের পরে সেই প্রথম বার প্রতিপন্ন হল যে, কোন প্রকান্ড শহরে জন-অভ্যুত্থানের অজেয়তার ধারণাটা একটা বিভ্রান্তি; সৈন্যবাহিনীগুলোর সম্মান

পুনঃস্থাপিত হল; গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার লড়াইগুলিতে সৈনিকেরা তদবধি সবসময়ে হেরে যেত — তারা এমনকি এই ধরনের লড়াইয়েও নিজেদের দক্ষতা সম্বন্ধে আস্থা ফিরে পেল।

জার্মানিতে সাবেক সামন্ততান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক তরফ এমনকি তাদের সাময়িক মিত্র বুর্জোয়াদের কাছ থেকেও অব্যাহতি পাবার এবং মার্চের ঘটনাবলির আগেকার অবস্থায় জার্মানিকে পুনঃস্থাপিত করার প্রথম-প্রথম নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করে এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে, সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে প্যারিসের শ্রমিকদের ঐ পরাজয়ের সময় থেকে। আবার রাষ্ট্রে নিষ্পত্তিকর ক্ষমতা হল ফৌজ, আর ফৌজের মালিক ছিল না বুর্জোয়ারা, মালিক ছিল তারা নিজেরাই। ১৮৪৮ সালের আগে প্রাশিয়ায় নিম্নতন শ্রেণীর অফিসারদের একাংশের বেশকিছুটা ঝোঁক দেখা যেত নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে — এমনকি সেই প্রাশিয়ায়ও বিপ্লবের ফলে ফৌজে চালু হওয়া বিশৃঙ্খলার দরুন ঐ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নওজোয়ানেরা আবার অনুগত হয়ে ওঠে। কোন সাধারণ সৈনিক যেইমাত্র অফিসারদের সম্পর্কে অল্পস্বল্প স্বাধীন আচরণ করে অমনি শৃঙ্খলা আর অকুণ্ঠ আজ্ঞাপালনের আবশ্যকতা অফিসারদের কাছে স্পষ্টপ্রতীয়মান হয়ে ওঠে। পরাস্ত অভিজাত আর আমলারা তখন নিজেদের সামনে পথ দেখতে শুরু করে; ফৌজ তখন অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে সম্মিলিত, ছোটখাটো অভ্যুত্থানে এবং বৈদেশিক যুদ্ধবিগ্রহে জয়ের ফলে তারা উচ্ছ্বসিত, ফরাসী সৈনিকদের সবে অর্জিত মস্ত সাফল্য সংরক্ষণে তারা যত্নশীল — এই ফৌজকে জনগণের সঙ্গে অবিরাম ছোটখাটো সংঘাতে শুধু জড়িয়ে রাখলেই নিষ্পত্তিকর মুহূর্তটা এসে পড়লে এই ফৌজ একটা প্রচণ্ড আঘাতে বিপ্লবপন্থীদের চূর্ণবিচূর্ণ করবে এবং ঠেলে সরিয়ে দেবে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারিয়ানদের। এমন নিষ্পত্তিকর আঘাত হানার উপযুক্ত মুহূর্ত এসেছিল শিগ্‌গিরই বটে।

গ্রীষ্মকালে জার্মানিতে বিভিন্ন তরফ যেসব কখনও অদ্ভুত কিন্তু প্রধানত ক্লান্তিকর পার্লামেণ্টারি কাজকর্ম এবং স্থানীয় সংঘর্ষে ব্যাপৃত ছিল সেগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যেগুলোর একটা থেকেও কোন ব্যবহারিক ফল ফলে নি এমন বহু পার্লামেণ্টারি জয় সত্ত্বেও বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থকেরা খুবই সাধারণভাবে

বোধ করেছিল যে, প্রান্তবর্তী তরফগুলির মাঝামাঝি জায়গায় তাদের অবস্থান প্রতিদিনই টিকিয়ে রাখায় অসাধ্য হয়ে উঠেছিল আরও বেশি পরিমাণে, কাজেই কখনও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মৈত্রীর জন্যে চেষ্টা করতে, আর পরদিন অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক তরফগুলির অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে তারা বাধ্য। এই অবিরাম দোদুল্যমানতা তাদের প্রকৃতিটাকে জনমতের কাছে চূড়ান্ত মাত্রায় স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছিল, আর তখন ঘটনাবলি যেভাবে মোড় ঘুরছিল তাতে তারা যে পরিমাণে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়েছিল সেটা থেকে তখনকার মতো লাভবান হয়েছিল প্রধানত আমলাতন্ত্রী আর সামন্ততন্ত্রীরা।

শরৎকালের শুরুতে বিভিন্ন তরফের আপেক্ষিক মতাবস্থান এতই তাক্তবিরক্ত আর দোষদর্শী হয়ে উঠেছিল যাতে নিষ্পত্তিকর লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। গণতান্ত্রিক আর বৈপ্লবিক জনগণ এবং ফৌজের মধ্যে প্রথম লড়াই হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্টে। গৌণ লড়াই মাত্র হলেও, এতে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ফৌজ অর্জন করেছিল আদৌ লক্ষণীয় প্রথম শ্রেষ্ঠত্ব, সেটার ফলিত ক্রিয়া হয়েছিল মস্ত। ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদের স্থাপিত শখের সরকারটাকে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সঙ্গে এমন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করতে দিয়েছিল, সেটা খুবই স্পষ্টপ্রতীয়মান কারণেই, যাতে শ্লেজ্‌ভিগের জার্মানদের সমর্পণ করা হয়েছিল ডেনমার্কের প্রতিহিংসার কাছে শুধু তাই নয়, ডেনিশ যুদ্ধের ভিত্তিতে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া কমবেশি বৈপ্লবিক নীতিগুলিকেও তাতে ত্যাজ্য করা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে এই যুদ্ধবিরতি দুই-তিন ভোটের জনসংখ্যাধিক্যে বাতিল হয়েছিল। এই ভোটের পরে এসেছিল ভুয়ো মন্ত্রিত্ব সংকট, কিন্তু তিন দিন পরে পরিষদ ঐ ভোট পুনর্বিবেচনা করেছিল, ঐ ভোট নাকচ করতে এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। জনসাধারণের ঘৃণা আর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল এই লজ্জাকর কার্যধারার ফলে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া হয়ে গিয়েছিল, তবে ফ্রাঙ্কফুর্টে যথেষ্ট সৈন্য আনান হয়েছিল আগেই, অভ্যুত্থান দমন হয়েছিল ছ'ঘণ্টা লড়াইয়ের পরে। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হয়েছিল জার্মানির অন্যান্য জায়গায় (বাডেন-এ, কলোন্‌-এ), কিন্তু সেগুলির একই পরাজয় ঘটেছিল।

এই প্রারম্ভিক লড়াইয়ের ফলে প্রতিবিপ্লবের তরফের একটা মস্ত সুবিধে

হয়েছিল: অন্তত বাহ্যত পুরোপুরি সাধারণের গণনির্বাচন থেকে উদ্ভূত একমাত্র সরকার ফ্রাঙ্কফুর্টের সাম্রাজ্যিক সরকার এবং জাতীয় পরিষদও সাধারণের দৃষ্টিতে অধঃপতিত হয়ে গেল। সাধারণের সংকল্পের অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে সৈনিকদের বেয়নেটের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল এই সরকার এবং এই পরিষদ। তারা দুর্নামভাগী হল; যে সামান্য শ্রদ্ধা তারা তদবধি হয়ত দাবি করতে পারত, তাও গেল; নিজেদের উৎপত্তি অস্বীকার করার ফলে, জনবিরোধী সরকারগুলি এবং তাদের সৈন্যদের উপর নির্ভরের ফলে সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি, তাঁর মন্ত্রীরা এবং ডেপুটিরা অতঃপর একেবারেই নাস্তি হয়ে গেল। অক্ষম কল্পনাবিলাসী লোকগুলির সংস্থাটার পাঠান প্রত্যেকটা নির্দেশ, প্রত্যেকটা অনুরোধ, প্রত্যেকটা ডেপুটেশনকে প্রথমে অস্ট্রিয়া, তারপরে প্রাশিয়া এবং পরে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিও কতখানি অবজ্ঞাভরে দেখত সেটা আমরা দেখতে পাব শিগ্‌গিরই।

জুন মাসের ফরাসী লড়াইয়ের যে মহা প্রতিধ্বনি হয়েছিল, সেই কথায় আমরা এখন আসছি — যে ঘটনা জার্মানির পক্ষে নিষ্পত্তিকর হয়েছিল ফ্রান্সে প্যারিসের প্রলেতারিয়ানদের সংগ্রামেরই মতো। আমরা বলছি ১৮৪৮ সালে অক্টোবর মাসের বিপ্লব এবং তারপরে ভিয়েনার উপর প্রচণ্ড আক্রমণের কথা। তবে এই লড়াইয়ের গুরুত্ব এমনই, আর যেসব বিভিন্ন পরিস্থিতি সেটার অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ কারণ সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে 'Tribune'-এর স্তম্ভগুলির এতটা অংশ লাগবে, যাতে সেটা নিয়ে একটা পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

লন্ডন, ফেব্রুয়ারি, ১৮৫২

১১

ভিয়েনার অভ্যুত্থান

আমরা এখন সেই নিষ্পত্তিকর ঘটনাটার বিষয় ধরছি যেটা ছিল জুন মাসের প্যারিসের অভ্যুত্থানের সঙ্গে তুলনীয় জার্মানির ঘটনাবলি যা একটামাত্র

আঘাতে প্রতিবৈপ্লবিক তরফের অনুকূলে পাল্লা ভারি করে দিয়েছিল: ১৮৪৮ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনার অভ্যুত্থান।

১৩ মার্চের বিজয়ের পরে ভিয়েনায় বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান কী ছিল সেটা আমরা দেখেছি। আমরা আরও দেখেছি জার্মান অস্ট্রিয়ার আন্দোলন কিভাবে অস্ট্রিয়ার অ-জার্মান প্রদেশগুলির ঘটনাবলির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছিল এবং ঘটনাবলি দিয়ে ব্যাহত হয়েছিল। তাহলে, জার্মান অস্ট্রিয়ার এই শেষ এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড অভ্যুত্থান ঘটার কারণগুলো নিয়ে সংক্ষেপে সমীক্ষা করাটাই শুধু আমাদের বাকি আছে।

মেটারনিখীয় সরকারের প্রধান বেসরকারী অবলম্বন ছিল উপরতলার অভিজাতেরা আর ফটকা-ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা; এমনকি মার্চের ঘটনাবলির পরেও সরকারের ব্যাপারে তারা প্রাধান্যশীল প্রভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল দরবার, ফৌজ আর আমলাতন্ত্রের সাহায্যেই শুধু নয়, সেটা আরও বেশি পরিমাণে 'অরাজকতা'র বিভীষিকার সাহায্যে, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বুর্জোয়াদের মধ্যে। জনমত যাচাই করার জন্যে তারা শিগগিরই সাহস করে অল্প কয়েকটা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল — যেমন, 'সংবাদপত্র আইন' (৪১), একটা নিরাকার ধরনের 'অভিজাত সংবিধান' (৪২), সাবেকী 'সামাজিক বর্গ' বিভেদের ভিত্তিতে একটা 'নির্বাচনী আইন' (৪৩)। আধা-উদারপন্থী, ভীরু, অযোগ্য আমলাদের নিয়ে গড়া তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা ১৪ মে তারিখে ঝুঁকি নিয়ে এমনকি জনগণের বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংগঠনের উপর সরাসরি হামলা করেছিল — জাতীয় রক্ষিবাহিনী এবং অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের (৪৪) প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া কেন্দ্রীয় কমিটিটিকে তারা ভেঙে দিয়েছিল, এই সংস্থাটা গঠিত হয়েছিল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে আহ্বান করার বিশেষ-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। কিন্তু কর্মটা ১৫ মে তারিখের অভ্যুত্থানটাকে খুঁচিয়েই তুলেছিল শুধু, সেটার জোরে সরকার কমিটিটিকে স্বীকার করতে, সংবিধান আর নির্বাচনী আইন রদ করতে, এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার অনুসারে নির্বাচিত সংবিধান-ডায়েটকে নতুন বুনিয়াদী বিধান রচনা করার ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরদিন একটা সাম্রাজ্যিক উদ্‌ঘোষণায় এই সবকিছু অনুমোদন করা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধিরা ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী তরফেরও, তারা

জনগণের অর্জিত সাফল্যের উপর নতুন হামলা চালাতে প্রবৃত্ত করাল তাদের 'উদারপন্থী' সহযোগীদের। আন্দোলনের তরফের দৃঢ়ঘাঁটি, অবিরাম আলোড়নের কেন্দ্র 'অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন' ঠিক এই জন্যেই ভিয়েনার অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী বার্গারদের পক্ষে আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল। ২৬ মে একটা সরকারী ডিক্রি দিয়ে সেটাকে ভেঙে দেওয়া হল। এই আঘাতটা হয়ত কৃতকার্য হতে পারত যদি এটাকে বলবৎ করা হত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর একটা অংশকে দিয়েই শুধু, কিন্তু সরকার তাদেরও বিশ্বাস করত না বলে সামনে নিয়ে এল সৈন্যদের, আর অমনি জাতীয় রক্ষিবাহিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের সঙ্গে মিলিত হল এবং এইভাবে ব্যর্থ করে দিল সরকারী পরিকল্পনাটাকে।

কিন্তু সম্রাট* এবং তাঁর দরবার ইতোমধ্যে ভিয়েনা ছেড়ে গিয়েছিলেন ১৬ মে তারিখে এবং পালিয়ে গিয়েছিলেন ইনস্‌ব্রুকে। এখানে তাদের ঘিরে ছিল অন্ধভক্ত তিরলীয়রা, তাদের অঞ্চলে সার্দো-লম্বার্ডীয় ফৌজের আক্রমণের আশংকা থেকে তাদের রাজানুগত্য আবার চাগিয়ে উঠেছিল; সেখানে ছিল রাডেটস্কির সৈন্যদের নৈকট্যের অবলম্বন, ইনস্‌ব্রুক ছিল তার কামানের গোলার পাল্লার ভিতরে; এখানে প্রতিবিপ্লবের তরফ এমন একটা আশ্রয় পেল যেখান থেকে অনিয়ন্ত্রিত, অলক্ষিত এবং নিরাপদ থেকে সেটা নিজের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে সমবেত করতে পারে, এবং সেটার চক্রান্তজাল আবার ছড়িয়ে দিতে পারে সারা দেশে। যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হল রাডেটস্কির সঙ্গে, ইয়েলাচিচের সঙ্গে আর ভিন্দিশ্‌গ্রেৎসের সঙ্গে, তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসনিক চক্রের মধ্যকার নির্ভরযোগ্য লোকজনের সঙ্গে; আবার নানা চক্রান্ত ফাঁদা হল স্লাভ সর্দারদের সঙ্গে; এইভাবে প্রতিবৈপ্লবিক গুপ্ত চক্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্যে গড়ে তোলা হল একটা সত্যিকারের শক্তি, আর ওদিকে বৈপ্লবিক জনগণের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ এবং আসন্ন সংবিধান-সভার বিতর্কের মধ্যে ক্ষয়ে যেতে দেওয়া হল ভিয়েনার অক্ষম মন্ত্রীদের স্বল্পকালীন এবং ক্ষীণ জনপ্রিয়তা। এইভাবে, রাজধানীর আন্দোলনটাকে

* প্রথম ফার্ডিন্যান্ড। — সম্পাঃ

কিছুকালের জন্যে নিজের মতো থাকতে দেওয়া হল; ফ্রান্সের মতো কেন্দ্রীকৃত এবং সমরূপ দেশে এমন কর্মনীতির ফলে আন্দোলনের তরফ নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠত, কিন্তু এখানে, অস্ট্রিয়ায় পাঁচমিশালি রাজনীতিক পিণ্ডটার বেলায় এই কর্মনীতি হল প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শক্তি পুনঃসংগঠিত করার সবচেয়ে নিরাপদ একটা উপায়।

ভিয়েনায় বুর্জোয়ারা স্থির করল, পর-পর তিনটে পরাজয়ের পরে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান-ডায়েটের মুখে দরবারের তরফ আর কোন প্রতিপক্ষ নয়, এটা মনে করে তারা ক্রমাগত বেশি পরিমাণে ক্লান্তি আর অনীহার মাঝে গা ছেড়ে দিল এবং চিরকেলে রব তুলল শৃঙ্খলা আর শান্তির জন্যে; প্রচণ্ড আন্দোলন-আলোড়ন এবং তজ্জনিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলায় পড়ে এই শ্রেণীটাকে এই মনোভাবে ধরে। অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে ম্যানুফ্যাকচারজাত জিনিসের উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বিলাসসামগ্রীতে গণ্ডিবদ্ধ, সেগুলোর জন্যে চাহিদা বিপ্লবের পর থেকে এবং দরবারের পলায়নের ফলে অনিবার্যভাবেই ছিল সামান্য। নিয়মিত শাসনপ্রণালী এবং দরবার ফিরে এলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাড়-বাড়ন্ত ঘটার আশা করা যেত — ঐ প্রত্যাবর্তনের জন্যে হাঁক-ডাক বুর্জোয়াদের মধ্যে সর্বাত্মক হয়ে উঠল। জুলাই মাসে সংবিধান-ডায়েটের উদ্বোধন উপলক্ষে উল্লাস করা হল বৈপ্লবিক যুগের অবসান হিসেবে। তেমনই অভিনন্দিত হল দরবারের প্রত্যাবর্তন, -- ইতালিতে রাডেটস্কির জয়গুলোর পরে এবং ডোব্‌ল্‌হফের প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার অধিষ্ঠানের পরে দরবার জন-খরস্রোতের সম্মুখীন হতে সাহস করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করেছিল নিজেকে, তার সঙ্গে সঙ্গে, ডায়েটে স্লাভ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে ষড়যন্ত্রগুলো নিষ্পন্ন করার জন্যে ভিয়েনায় দরবারের উপস্থিতি আবশ্যক মনে করল। সংবিধান-ডায়েট যখন আলোচনা করছিল সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব-বন্ধন এবং অভিজাতদের জন্যে বেগার খাটুনি থেকে কৃষকদের মুক্ত করার আইন নিয়ে, তখন পরম কুশলী একটা আঘাতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছিল দরবার। ১৯ আগস্ট সম্রাটকে দিয়ে জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে পরিদর্শন করার প্রস্তাব পেশ করা হল। রাজপরিবার, অমাত্যরা, জেনেরালরা পাল্লা দিয়ে স্তাবকতা করল সশস্ত্র বার্গারদের, এরা নিজেদেরকে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি

হিসেবে স্বীকৃত দেখে ইতোমধ্যে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। তার ঠিক পরেই মন্ত্রিসভায় একমাত্র লোকগ্রাহ্য মন্ত্রী ম. শ্‌ভার্টসেরের সই করা একটা ডিক্রি প্রকাশিত হল, কর্মহীন মেহনতীদের তদবধি দেওয়া সরকারী সাহায্য তাতে বাতিল করা হল। ফতে হল ফন্দিটা। শ্রমিকরা বিক্ষোভপ্রদর্শন করল; বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিবাহিনী দাঁড়াল তাদের মন্ত্রীটির ডিক্রির পক্ষে; তারা 'নৈরাজ্যবাদীদের' উপর আক্রমণ করল; নিরস্ত্র, প্রতিরোধে বিরত শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বহুসংখ্যক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করল ২৩ আগস্ট তারিখে। এইভাবে ভেঙে গেল বৈপ্লবিক বাহিনীর শক্তি আর ঐক্য। বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম ভিয়েনায়ও ফেটে পড়ল রক্তাক্ত বিস্ফোরণে, আর প্রতিবৈপ্লবিক চক্রিদল বুঝল তাদের প্রধান আঘাত হানার দিন ঘনিয়ে এল।

তারা কোন্ নীতির ভিত্তিতে কাজ চালাতে মনস্থ করেছে সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার সুযোগ অচিরেই জুটিয়ে দিল হাঙ্গেরির ব্যাপার। ৫ অক্টোবর সরকারী 'Wiener Zeitung' (৪৫) পত্রিকায় প্রকাশিত সাম্রাজ্যিক ডিক্রিতে হাঙ্গেরির ডায়েট ভেঙে দেবার ঘোষণা করে ক্রোয়েশিয়ার বান্ ইয়েলাচিচ্‌কে করা হল দেশটির বেসামরিক এবং সামরিক গভর্নর, ইয়েলাচিচ্ — দক্ষিণ-স্লাভ প্রতিক্রিয়াশীলতার নেতা, তিনি হাঙ্গেরির বিধিসংগত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধরত ছিলেন। ডিক্রিটাতে হাঙ্গেরির কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর ছিল না। তার সঙ্গে সঙ্গে, ভিয়েনার সৈন্যদলকে যুদ্ধসজ্জায় এগিয়ে গিয়ে ইয়েলাচিচের কর্তৃত্ব বলবৎ করার জন্যে নির্দিষ্ট ফৌজের অংশ হতে নির্দেশ দেওয়া হল। তবে কিনা, এতে করে শয়তানিটা প্রকাশ হয়ে পড়ল বড্ড বেশি স্পষ্টভাবে; ভিয়েনায় প্রত্যেকেই উপলব্ধি করল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হল নিয়মতন্ত্রসম্মত শাসন সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর ছাড়াই একটা ডিক্রিকে আইনগত বলবত্তা দিতে সম্রাট চেষ্টা করায় সেই ডিক্রিতেই ঐ নীতি পদদলিত হয়। ৬ অক্টোবর জনগণ, অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন, ভিয়েনার জাতীয় রক্ষিবাহিনী সবাই একত্রে বিদ্রোহী হয়ে সৈন্যদলের যাত্রায় বাধা দিল। কিছু কিছু গ্রিনেডিয়ার চলে গেল জনগণের পক্ষে; অল্পকালের লড়াই হল জন-বাহিনী এবং সৈন্যদলের মধ্যে; জনগণের হাতে নিহত হল যুদ্ধ মন্ত্রী লাতুর, সন্ধ্যা

নাগরে জনগণ হল বিজেতা। ইতোমধ্যে, স্টুলভেইসেনবুর্গে* পের্সেলের হাতে পরাস্ত হয়ে বান্ ইয়েলাচিচ্ আশ্রয় নিয়েছিলেন ভিয়েনার কাছে জার্মান-অস্ট্রীয় রাজ্যক্ষেত্রে। তাঁকে সমর্থন করতে যুদ্ধযাত্রা করার কথা ছিল ভিয়েনার সৈন্যদলের, সেটা তাঁর সুস্পষ্ট বিরোধী এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিল; আর সম্রাট এবং দরবার আবার পালিয়ে গেলেন আধা-স্লাভ অঞ্চলের ওল্মুট্স** শহরে।

কিন্তু ওলমুট্সে গিয়ে দরবার দেখল পরিস্থিতিটা ইন্সব্রুকের অবস্থা থেকে খুবই পৃথক। তখন দরবার অবিলম্বে বিপ্লবের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার মতো অবস্থায় ছিল। সেটাকে ঘিরে ছিল সংবিধান-সভার স্লাভ ডেপুটিরা, তারা দলে দলে ভিড় করে গিয়েছিল ওলমুট্সে, আর ঘিরে ছিল রাজ্যের সমস্ত জায়গা থেকে আগত স্লাভীয় উৎসাহীরা। তাদের বিবেচনায় অভিযানটা হত স্লাভতন্ত্র পুনঃসংস্থাপনের এবং যা স্লাভ্ভূমি বলে গণ্য ছিল সেখানে দুটো অনধিকার-প্রবেশকারীর বিরুদ্ধে, জার্মান আর মাগিয়ারের বিরুদ্ধে উন্মূলনের যুদ্ধ। ভিয়েনার চারপাশে সমবেত সৈন্যদলগুলির তখনকার সেনাপতি প্রাগ-বিজয়ী ভিন্দিশ্গ্রেৎস সঙ্গেসঙ্গেই হয়ে উঠলেন স্লাভ জাতিসত্তার বীর-নায়ক। সমস্ত দিক থেকে এসে তাঁর সৈন্যদল দ্রুত কেন্দ্রীভূত হল। ইয়েলাচিচের সৈন্যদল এবং ভিয়েনার প্রাক্তন গ্যারিসনের সঙ্গে শামিল হবার জন্যে ভিয়েনা অভিমুখী রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট মার্চ করে চলল বোহেমিয়া, মরাভিয়া, স্টিরিয়া, উচ্চ অস্ট্রিয়া এবং ইতালি থেকে। এইভাবে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক হয়েছিল ষাট হাজারের বেশি সৈনিক, তারা সাম্রাজ্যিক নগরীটিকে সমস্ত দিক থেকে ঘেরাও করতে শুরু করেছিল অচিরেই, শেষে নিষ্পত্তিকর আক্রমণ চালাতে সাহস করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে তারা এগিয়েছিল ৩০ অক্টোবর।

ভিয়েনায় ইতোমধ্যে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং অসহায় ভাব। জয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা আবার 'অরাজক' মেহনতী শ্রেণীগুলির প্রতি তাদের পুরন অবিশ্বাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মেহনতীজনের

---

* হাঙ্গেরীয় নাম: সেকেশ্ফেখের্ভার। — সম্পাঃ

** চেক্ নাম: ওলমউৎস। — সম্পাঃ

প্রতি সশস্ত্র বুর্জোয়ারা ছ' সপ্তাহ আগে যে আচরণ করেছিল সেকথা এবং সাধারণভাবে বুর্জোয়াদের অস্থির, দোদুল্যমান কর্মনীতির কথা মনে রেখে মেহনতীজনেরা বুর্জোয়াদের হাতে নগরীর প্রতিরক্ষা ন্যস্ত করতে রাজী না হয়ে অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সংগঠন দাবি করল নিজেদেরই জন্যে। সাম্রাজ্যিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার গুরুদের অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন শ্রেণী-দুটির মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রকৃতিটা বুঝতে, এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনগুলো উপলব্ধি করতে অপারক হল সম্পূর্ণভাবে। তখন বিভ্রান্তি জন-মনে, বিভ্রান্তি শাসক পরিষদগুলিতে। ডায়েটের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ জার্মান ডেপুটিরা এবং অল্প কয়েক জন বিপ্লবী পোলীয় ডেপুটি ছাড়া ওলমুট্সের বন্ধুদের তরফে গোয়েন্দার ভূমিকায় অবতীর্ণ অল্পকিছু স্লাভরা অধিবেশন চালাতে থাকল অবিরাম। কিন্তু সক্রিয় কার্যকলাপের বদলে তারা সমস্ত সময় নষ্ট করতে থাকল নিয়মতান্ত্রিক প্রথা-রীতির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে না গিয়ে সাম্রাজ্যিক ফৌজকে বাধা দেবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিতর্কে। ভিয়েনার প্রায় সমস্ত জন-সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া 'নিরাপত্তা কমিটি' প্রতিরোধ করতে কৃতসংকল্প হলেও তাতে প্রাধান্য ছিল বার্গার আর খুদে ব্যাপারী সংখ্যাগরিষ্ঠের, তারা কমিটিকে কোন দৃঢ়সংকল্প, তেজীয়ান কর্মধারা নিয়ে এগিয়ে চলতে দিল না। অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের কমিটি বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস করল, কিন্তু তারা পরিচালকের ভূমিকা নিতে সক্ষম ছিল না কোনক্রমেই। মেহনতীরা ছিল অবিশ্বাসভাজন, নিরস্ত্র, অসংগঠিত, তারা পুরন আমলের মানসিক বন্দিত্ব থেকে বড় একটা বেরিয়ে আসে নি, তাদের সবে জেগে উঠছিল নিজেদের সামাজিক অবস্থান এবং উপযুক্ত রাজনীতিক কর্মধারা সম্বন্ধে জ্ঞান নয়, সেটা সহজজ্ঞানমাত্র — তারা নিজেদের কথা শোনাতে পারত শুধু উচ্চরব মিছিল দিয়ে, তারা তখনকার দুষ্করতা প্রসঙ্গে উপযুক্ত এবং প্রস্তুত হবে তা আশা করা যেত না। কিন্তু অস্ত্র পাওয়ামাত্র শেষ পর্যন্ত লড়তে তারা প্রস্তুত ছিল — জার্মানিতে বিপ্লবের সময়ে তারা যেমনটা ছিল বরাবর।

এই ছিল ভিয়েনার হালচাল। বাইরে — ইতালিতে রাডেট্স্কির জয়গুলির জন্যে উচ্ছ্বসিত পুনঃসংগঠিত অস্ট্রীয় ফৌজ; ষাট কিংবা সত্তর হাজার অস্ত্রে সুসজ্জিত, সুসংগঠিত সৈনিক, তারা সুপরিচালিত না হলেও

তাদের অন্তত ছিল সেনাপতিরা। ভিতরে — বিভ্রান্তি, শ্রেণীবিরোধ, বিশৃঙ্খলা: জাতীয় রক্ষিবাহিনী, যেটার একাংশ আদৌ না লড়তে কৃতসংকল্প, একাংশ অস্থিরসংকল্প, শুধু সবচেয়ে ক্ষুদ্রাংশটা ক্রিয়াকলাপের জন্যে প্রস্তুত; প্রলেতারিয়ান জনরাশি, তারা সংখ্যায় বিশাল, কিন্তু নেতৃবিহীন, যাদের কোন রাজনীতিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, প্রায় বিনা কারণেই তারা আতঙ্কগ্রস্ত কিংবা ক্রোধে-উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠতে পারত, ছড়িয়ে দেওয়া প্রত্যেকটা মিথ্যা গুজবের শিকার, লড়তে খুবই আগ্রহী, কিন্তু অন্তত শুরুতে অস্ত্রহীন, আর অবশেষে যখন তারা লড়াইয়ে পরিচালিত হয় তখন অসম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত এবং সামান্যই সংগঠিত; যখন মাথার উপর ছাদ প্রায় জ্বলছে সেই অবস্থায় তাত্ত্বিক মারপেঁচ নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত অসহায় ডায়েট; প্রেরণা কিংবা কর্মশক্তি বর্জিত একটা নেতৃত্বকর কমিটি। সবকিছু বদলে গিয়েছিল মার্চ আর মে মাসের দিনগুলি থেকে, যখন প্রতিবৈপ্লবিক শিবির ছিল বিভ্রান্তিময়, আর একমাত্র সংগঠিত শক্তি ছিল যেটাকে সৃষ্টি করেছিল বিপ্লব। এমন সংগ্রামের পরিণাম সম্বন্ধে সংশয় বড় একটা থাকতে পারত না, আর যাকিছু সংশয় হয়ত-বা ছিল সেটার নিষ্পত্তি করে দিয়েছিল ৩০ আর ৩১ অক্টোবর এবং ১ নভেম্বরের ঘটনাগুলি।

লন্ডন, মার্চ, ১৮৫২

১২

ভিয়েনায় ঝটিকা আক্রমণ। ভিয়েনার প্রতি বেইমানি

ভিন্দিশ্‌গ্রেৎসের একত্র-করা ফৌজ শেষে যখন ভিয়েনায় আক্রমণ শুরু করেছিল তখন প্রতিরক্ষার জন্যে যে শক্তি হাজির করা গিয়েছিল সেটা ছিল ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর শুধু একটা অংশকে আনা হয়েছিল পরিখায়। তাড়াহুড়ো করে শেষে একটা প্রলেতারিয়ান রক্ষিবাহিনী গড়া হয়েছিল বটে, কিন্তু জনসমষ্টির সবচেয়ে

সংখ্যাবহু, সবচেয়ে নির্ভয় এবং সবচেয়ে তেজীয়ান এই অংশটাকে এইভাবে কাজে আনার চেষ্টাটার বিলম্বের দরুন সেটা অসদ্ব্যবহার করায় এবং শৃঙ্খলার প্রথম-প্রথম মূল উপাদানগুলিতে এতই কম অভ্যস্ত ছিল যাতে সেটা প্রতিরোধ করতে পারত না। তিন থেকে চার হাজার জনের অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন ভালভাবে তালিম দেওয়া ছিল, কিছু পরিমাণ শৃঙ্খলা ছিল তাদের, তারা ছিল সাহসী এবং উৎসাহী — সেটাই হল, সামরিক দিক থেকে বলতে গেলে, নিজ কাজটা করতে কৃতকার্য হতে পারার মতো একমাত্র শক্তি। ওদিকে, ইয়েলাচিচের দস্যুদঙ্গলগুলো তাদের অভ্যাসাদির প্রকৃতির অনুসারেই একবাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে, একগলি থেকে অন্য গলিতে লড়াইয়ে খুবই কাজের, তাদের হিসেবে না ধরলেও ভিন্দিশগ্রেৎসের ঢের বেশি সংখ্যাবহু নিয়মিত সৈনিকদের বিরুদ্ধে অল্পকিছু নির্ভরযোগ্য জাতীয় রক্ষিদল এবং সশস্ত্র প্রলেতারিয়ানদের তালগোল পাকান পিন্ডটা সমেত ঐ অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন আর কী? ভিন্দিশগ্রেৎস যেগুলোর অমন যথেচ্ছ অপব্যবহার করত সেই বহুসংখ্যক এবং নিখুঁতভাবে সজ্জিত কামানশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার জন্যে বিদ্রোহীদের হাতে অল্পকিছু পুরন, জীর্ণ, খারাপভাবে স্থাপিত এবং অযত্নে রক্ষিত কামানই-বা কী?

বিপদ যতই কাছিয়ে আসতে থাকল, ততই বেড়ে চলল ভিয়েনায় বিশৃঙ্খলা। রাজধানী থেকে কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করে ছিল পেৎসেলের হাঙ্গেরীয় ফৌজ, সাহায্যের জন্য সেটাকে ডাকতে শেষ মুহূর্ত অবধি যথেষ্ট কর্মতৎপর হয়ে উঠতে পারল না ডায়েট। 'নিরাপত্তা কমিটি' পাস করল বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রস্তাব, সশস্ত্র জনগণেরই মতো তারা নিজেরাই গুজব আর পাল্টা-গুজবের জোয়ার-ভাটার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ভাসছিল আর নামছিল। সবাই একমত ছিল শুধু একটা ব্যাপারে — সেটা হল মালিকানা মানা করা; আর সেটা করা হয়েছিল অমন সময়ের পক্ষে প্রায় হাস্যকর মাত্রায়। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার ব্যাপারে করা হয়েছিল যৎসামান্যই। উপস্থিত লোকেদের মধ্যে কেউ পারলে ভিয়েনাকে উদ্ধার করতে পারতেন একটিমাত্র মানুষ — বেম্, জন্মসূত্রে স্লাভ তিনি তখন ভিয়েনার একজন প্রায় অজ্ঞাত বিদেশী, সর্বজনীন অবিশ্বাসের মাঝে অসহায় হয়ে তিনি সেকাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। অধ্যবসায়ী হলে তাঁকে হয়ত রাষ্ট্রদ্রোহী

হিসেবে লিঙ্ক্ করা হতে পারত। বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মেসেনহাউসের যতটা ছিলেন এমনকি সাবল্টার্ন অফিসারও নয়, বরং ঔপন্যাসিক, তিনি ছিলেন করণীয় কাজটার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। অথচ আট মাসের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরেও জনগণের তরফ তাঁর চেয়ে বেশি সামর্থ্যসম্পন্ন কোন সামরিক কর্মী পয়দা করতে কিংবা সংগ্রহ করতে পারে নি। লড়াই শুরু হয়েছিল এই পরিস্থিতিতে। ভিয়েনার মানুষের প্রতিরক্ষার উপকরণ ছিল যৎপরোনাস্তি সামান্য এবং সৈন্যশ্রেণীগুলিতে সামরিক দক্ষতা আর সংগঠন ছিল না একেবারেই, এটা বিবেচনায় রাখলে বলতে হয়, অতি বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধই তারা করেছিল। বেম্ যখন সেনাপতি ছিলেন তখন অনেক জায়গায় 'ফাঁড়িটাকে শেষ সৈনিক বেঁচে থাকা অবধি রক্ষা করো' নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হত। কিন্তু জয় হল শক্তির। দীর্ঘ এবং প্রশস্ত সড়কে, শহরতলির প্রধান প্রধান বীথিকাগুলিতে ব্যারিকেডের পরে ব্যারিকেড উড়িয়ে দিল সাম্রাজ্যিক কামানশ্রেণী; লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় ক্রোট্রা দখল করল পুরন শহরের ঢালুর সামনেকার গৃহশ্রেণী। হাঙ্গেরীয় ফৌজের একটা ক্ষীণ এবং বিশৃঙ্খল আক্রমণ সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতির সময়ে, যখন পুরন শহরের কোন কোন সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করেছিল, দ্বিধা করছিল এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল কেউ কেউ, নতুন করে প্রতিরোধব্যবস্থা প্রস্তুত করছিল অ্যাকাডেমিক লিজিয়নের অবশিষ্টাংশ, তখন একজায়গায় প্রবেশ করেছিল সাম্রাজ্যিক বাহিনী আর সেই সর্বাত্মক বিশৃঙ্খলার মাঝে বিজিত হয়েছিল পুরন শহর।

এই বিজয়ের অব্যবহিত পরিণতি — সামরিক আইনের পাশবিকতা আর নিধনকাণ্ড, ভিয়েনার উপর লেলিয়ে-দেওয়া স্লাভ দস্যুদঙ্গলের অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতা আর জঘন্যতা — এসব খুবই সুবিদিত, তাই এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। পরবর্তী পরিণতি নিয়ে, ভিয়েনায় বিপ্লবের পরাজয় জার্মানির বিষয়াবলিতে যে সম্পূর্ণ নতুন মোড় ঘুরিয়ে দিল সেটা নিয়ে আমাদের পরে মন্তব্য করার কারণ ঘটবে। ঝটিকা আক্রমণে ভিয়েনা দখল প্রসঙ্গে দুটো বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা বাকি আছে। ঐ শহরের ছিল দুটি মিত্র: হাঙ্গেরীয়রা এবং জার্মান জনগণ। কোথায় ছিল তারা এই কঠোর পরীক্ষার সময়ে?

আমরা দেখেছি, সদ্য-মুক্ত মানুষের যাবতীয় উদারতাসম্পন্ন ভিয়েনাবাসীরা যে কর্মব্রতসাধনে এগিয়েছিল সেটা আখেরে তাদের নিজেদের হলেও প্রথমত এবং সর্বোপরি ছিল হাঙ্গেরীয়দের কর্মব্রত। অস্ট্রীয় সৈন্যদলগুলো হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে অভিযান করে সেটা বরদাস্ত করার চেয়ে তারা বরং প্রথম এবং সবচেয়ে প্রচণ্ড আক্রমণটাকে করল নিজেদের অভিমুখী। তারা এই মহৎ কাজটা করল তাদের মিত্রদের সমর্থনে, আর ইয়েলাচিচের বিরুদ্ধে কৃতকার্য হাঙ্গেরীয়রা তাঁকে তাড়িয়ে দিল ভিয়েনার দিকে, এবং এই জয় দিয়ে ভিয়েনা শহর আক্রমণ করবে যে সৈন্যবাহিনী সেটার শক্তি বাড়িয়ে দিল। এই পরিস্থিতিতে, ভিয়েনায় ডায়েটকে নয়, 'নিরাপত্তা কমিটি' কিংবা ভিয়েনার অন্য কোন সরকারী সংস্থাকে নয়, **ভিয়েনার বিপ্লবকে** বিলম্ব না করে এবং প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত শক্তি দিয়ে সমর্থন করাই ছিল হাঙ্গেরির স্পষ্ট কর্তব্য। ভিয়েনা লড়ে দিয়েছিল হাঙ্গেরির প্রথম লড়াই সেকথা হাঙ্গেরি যদি-বা ভুলেও গিয়ে থাকত, তবু নিজ নিরাপত্তার গরজেই হাঙ্গেরির ভোলা চলত না যে, ভিয়েনা ছিল হাঙ্গেরীয় স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাঘাঁটি, আর ভিয়েনার পতনের পরে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যিক সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির সম্মুখীন হতে পারে না আর কিছুই। তবে কিনা, ভিয়েনা অবরোধ এবং সেখানে ঝটিকা আক্রমণের সময়ে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে হাঙ্গেরীয়রা যা বলতে পারে এবং বলেছে তা আমরা জানি: তাদের নিজেদের সংগ্রামী শক্তির অপ্রতুল অবস্থা, ভিয়েনায় ডায়েট কিংবা অন্য কোন সরকারী সংস্থা তাদের ডেকে নিতে অসম্মত হল, নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে অবস্থান আবশ্যক ছিল, জার্মান কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া এড়াবার প্রয়োজন। হাঙ্গেরীয় ফৌজের অপ্রতুল অবস্থা প্রসঙ্গে কথা হল এই যে, ভিয়েনার বিপ্লব এবং ইয়েলাচিচের উপস্থিতির পরবর্তী প্রথম দিনগুলিতে স্থায়ী সৈন্যদল হিসেবে কিছুই আবশ্যক ছিল না, কেননা অস্ট্রীয় স্থায়ী সৈন্যদল মোটেই কেন্দ্রীভূত ছিল না; স্টুলভেইসেনবুর্গে লড়েছিল যে লান্ডস্টুর্ম শুধু তাই দিয়েই ইয়েলাচিচের বিরুদ্ধে প্রথম জয়টার পর সেটাকে সতেজে কঠোরতা বজায় রেখে চালিয়ে গেলেই ভিয়েনার মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটাবার জন্যে এবং সেদিন থেকে ছ'মাস অবধি অস্ট্রীয় ফৌজের যেকোন সমাবেশ মুলতবি করার জন্যে সেটাই যথেষ্ট হত। যুদ্ধে, বিশেষত বৈপ্লবিক

যুদ্ধবিগ্রহে কোন স্পষ্ট-নিশ্চিত সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত কার্যকলাপের দ্রুততা হল প্রথম নিয়ম; আর কোন দ্বিধা না করে আমরা বলতে পারি, **নিছক সামরিক কারণেই,** ভিয়েনার মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটার আগে পের্সেলের থামা উচিত ছিল না। এতে কিছু ঝুঁকি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু কিছু ঝুঁকি না নিয়ে কেউ কখনও কোন লড়াই জিতেছে কি? ১ কোটি ২ লক্ষ হাঙ্গেরীয়দের বিরুদ্ধে দেশজয় অভিযান করত যে সৈন্যবাহিনী সেটাকে নিজেদের অভিমুখী করাবার সময়ে কোন ঝুঁকি নেয় নি কি ভিয়েনার চার লক্ষ মানুষ? অস্ট্রীয়রা একত্র হওয়া অবধি হাঙ্গেরীয়দের অপেক্ষা করা, এবং শ্ভেখাটের কাছে যে পরাজয় অবধারিত ছিল তাতে নিষ্ফল ক্ষীণ শক্তিপ্রদর্শন ছিল সামরিক ভুল; নিশ্চয়ই ইয়েলাচিচের ভেঙে-দেওয়া দস্যুদলের বিরুদ্ধে স্থিরসংকল্প ভিয়েনা অভিযানের চেয়ে বেশি ঝুঁকি ছিল ঐ ভুলে।

কিন্তু, বলা হয়, কোন সরকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া হাঙ্গেরীয়দের অমন অগ্রগতিতে জার্মান রাজ্যক্ষেত্র লঙ্ঘন করা হত, ফ্রাঙ্কফুর্টে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হত, সর্বোপরি সেটা হত হাঙ্গেরীয়দের কর্মব্রতের যা শক্তি সেই আইনগত আর নিয়মতান্ত্রিক কর্মনীতি বর্জন। কিন্তু, ভিয়েনায় সরকারী সংস্থাগুলি তো ছিল নাস্তি বস্তু! হাঙ্গেরির সপক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সেটা কি ডায়েট, সেটা কি কোন গণতান্ত্রিক কমিটি? না, হাঙ্গেরির স্বাধীনতার জন্যে প্রথম লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধরেছিল যে ভিয়েনার মানুষ, কেবল তারাই? ভিয়েনায় অমুক কিংবা অমুক সরকারী সংস্থার পক্ষাবলম্বন করা জরুরী ছিল তা নয় — বৈপ্লবিক ঘটনাধারার অগ্রগতিতে অচিরেই উলটে পড়তে পারত এবং পড়ত ঐ সমস্ত সরকারী সংস্থা, একমাত্র যা বিবেচ্য বিষয় ছিল সেটা হল বৈপ্লবিক আন্দোলনের উন্নতি, খাস জন-কর্মকাণ্ডেরই অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি, একমাত্র সেটাই আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারত হাঙ্গেরিকে। উভয়ের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ভিয়েনা এবং সাধারণভাবে জার্মান অস্ট্রিয়ার মৈত্রী বজায় থাকলে, এই বৈপ্লবিক আন্দোলন পরে কোন্ রূপ ধারণ করতে পারত সেটা ছিল ভিয়েনার মানুষের ব্যাপার, হাঙ্গেরীয়দের নয়। কিন্তু কথাটা হল, একটাকিছু বিধিবদ্ধ গোছের প্রাধিকারের জন্যে হাঙ্গেরীয় সরকারের জিদটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিনা কার্যপ্রণালীর কিছুটা অনিশ্চিত বৈধতার জন্যে একটা ভানের প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ, যে ভানটা

হাঙ্গেরিকে উদ্ধার না করলেও অন্তত, একটা পরবর্তী কালে, ইংরেজ বুর্জোয়া দর্শকদের কাছে খুব ভালই লেগেছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মানির কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে সম্ভাব্য বিরোধের ছুতোটা তো একেবারেই অসার। ভিয়েনায় প্রতিবিপ্লবের বিজয় দেখে ফ্রাঙ্কফুর্টের কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপ্রস্তাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল; সেখানে বিপ্লব সেটার শত্রুদের পরাস্ত করার জন্যে আবশ্যক সহায়তা পেলে তারা বিচলিত হত সমানই। আর শেষে, বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক জমিন হাঙ্গেরি ছেড়ে যেতে পারে নি, এই মস্ত যুক্তিটা বৃটিশ ফ্রীট্রেডারদের (৪৬) কাছে খুবই পর্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে এটা কখনও যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। ধরা যাক ভিয়েনার মানুষ যদি ১৩ মার্চ এবং ৬ অক্টোবর 'বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক' উপায় আঁকড়ে ধরে থাকত তাহলে কোথায় থাকত 'বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক' আন্দোলন এবং সমস্ত গৌরবময় লড়াই যা হাঙ্গেরির প্রতি সেই প্রথম সভ্য দুনিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল? ঠিক যে বিধিসংগত এবং নিয়মতান্ত্রিক জমিনে হাঙ্গেরীয়রা ১৮৪৮ এবং ১৮৪৯ সালে দাঁড়িয়েছিল বলে দৃঢ়োক্তি করা হয় সেটাকে তাদের জন্যে জিতে দিয়েছিল ভিয়েনার মানুষের ১৩ মার্চের চূড়ান্ত অবৈধ এবং অনিয়মতান্ত্রিক বিদ্রোহ। হাঙ্গেরির বৈপ্লবিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এমনটা বলা উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে যে, নিছক বৈধ উপায় ব্যবহার করার মতো দ্বিধা-সংকোচ যে নিদারুণ অবজ্ঞা করে এমন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শুধু সেই উপায় প্রয়োগ করতে চাইবার ভানটা একেবারেই বাজে; আর এর সঙ্গে আমরা আরও বলতে পারি, গ্যোর্গেই এই বৈধতার চিরকেলে ভানটাকে আঁকড়ে ধরে সরকারের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে না ধরলে, জেনারেলের প্রতি গ্যোর্গেই ফৌজের অনুরক্তি এবং ভিলাগোশের কলঙ্কজনক বিপর্যয় অসম্ভব হত (৪৭)। আর, নিজেদের সম্মান রক্ষা করার জন্যে হাঙ্গেরীয়রা যখন অবশেষে ১৮৪৮ সালে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে লেইথা পার হয়ে গিয়েছিল সেটা কি অবিলম্ব এবং স্থিরসংকল্প আক্রমণের মতো একেবারে সমানই অবৈধ ছিল না?

হাঙ্গেরির প্রতি আমরা কোন বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করি নে, তা সবাই জানে। সংগ্রামের সময়ে আমরা হাঙ্গেরিকে সমর্থন করেছিলাম;

আমাদের বলার অধিকার আছে, আমাদের পত্রিকা 'Neue Rheinische Zeitung'(৪৮) হাঙ্গেরির কর্মবৃত্তকে জার্মানিতে জনসাধারণ্যে বিদিত করার জন্যে অন্য সবার চেয়ে বেশি করেছে; পত্রিকাটি ম্যাগিয়ার আর স্লাভদের মধ্যে সংগ্রামের প্রকৃতিটার ব্যাখ্যা দিয়েছে, হাঙ্গেরীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে এক-প্রস্থ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি এইভাবে প্রশংসাভাজন হয়েছে যে, হাঙ্গেরীয়দেরই এবং 'প্রত্যক্ষদর্শীদের' রচনাগুলি সমেত বিষয়টা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকটা পরবর্তী বইয়ে সেগুলি হয়েছে কুম্ভিলকবৃত্তির বস্তু। আমরা এখনও মনে করি, ইউরোপের মূলভূমিতে যেকোন ভবিষ্য আলোড়নে হাঙ্গেরি হল জার্মানির প্রয়োজনীয় এবং অকৃত্রিম মিত্র। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অবাধে সবকিছু বলবার অধিকার প্রসঙ্গে আমরা আমাদের স্বদেশবাসীদের প্রতি খুবই কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছি; তাছাড়া, আমাদের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা চাই ঐতিহাসিক পক্ষপাতশূন্যতা অনুসারে, আমরা বলতে চাই, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভিয়েনার মানুষের উদার নির্ভীকতা ছিল হাঙ্গেরীয় সরকারের সাবধানী বিমৃশ্যকারিতার চেয়ে ঢের বেশি মহৎই শুধু নয়, অধিকতর দূরদর্শীও বটে। আর জার্মান হিসেবে আমরা আরও বলতে চাই, হাঙ্গেরীয় অভিযানের যাবতীয় জমকাল জয় আর চমৎকার লড়াইয়ের সঙ্গে আমরা বিনিময় করতে রাজী হব না আমাদের স্বদেশবাসীদের, ভিয়েনার মানুষের সেই স্বতঃস্ফূর্ত একক অভ্যুত্থান আর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ যা হাঙ্গেরিকে ফৌজ সংগঠিত করার সময় দিয়েছিল, যে ফৌজ করেছিল ঐসব মস্ত মস্ত কাজ।

ভিয়েনার দ্বিতীয় মিত্র ছিল জার্মান জনগণ। কিন্তু তারা সর্বত্র ভিয়েনাবাসীদের মতো একই সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট, বাডেন, কলোনকে একটু আগেই পরাস্ত করে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। বার্লিনে আর ব্রেসলাউয়ে* জনগণ খড়্গহস্ত ছিল ফৌজের বিরুদ্ধে; যেকোন দিন তাদের মধ্যে হাতাহাতি লেগে যেতে পারত। এমনটাই ছিল সংগ্রামের প্রত্যেকটা স্থানীয় কেন্দ্রে। সর্বত্রই ছিল নানা অমীমাংসিত প্রশ্ন, যেগুলোর সমাধান হতে পারত কেবল অস্ত্রবলেই। জার্মানির সাবেক খণ্ড-খণ্ড অবস্থা এবং

* পোল নাম: ভ্রোৎস্লাভ। — সম্পাঃ

বিকেন্দ্রীকরণ চলতে থাকার সর্বনাশা পরিণতি তীব্রভাবে অনুভূত হল সেই প্রথম তখন। প্রত্যেকটা রাজ্যে, প্রত্যেকটা প্রদেশে, প্রত্যেকটা শহরে বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল মূলত একই, কিন্তু সেগুলোকে সর্বত্র তুলে ধরা হল বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, সর্বত্র সেগুলোর পরিপক্বতার মাত্রা হল বিভিন্ন। এইভাবে ভিয়েনার ঘটনাবলির চূড়ান্ত গুরুত্ব প্রত্যেকটা এলাকায় উপলব্ধ হলেও ভিয়েনার মানুষকে বিপদে সাহায্য করা কিংবা তাদের অনুকূলে গতিপরিবর্তনের আশায় কোথাও কোন গুরুত্বপূর্ণ আঘাত হানার সম্ভাবনা ছিল না। এইভাবে, তাদের সাহায্য করার জন্যে ফ্রাঙ্কফুর্টের পার্লামেণ্ট আর কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ছাড়া কেউই আর রইল না। তাদের কাছে সবদিক থেকে আবেদন গেল, কিন্তু তারা করল কী?

ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট এবং পুরন ফেডারেটিভ ডায়েটের সঙ্গে সেটার অত্যাচারী সংগ্রামে পয়দা করা জারজ সন্তান তথাকথিত কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ভিয়েনার আন্দোলন থেকে উপকৃত হল: তারা জাহির করল তাদের ডাহা নাস্তিত্ব। আমরা আগেই দেখেছি, এই ধূর্ত পরিষদটা সতীত্ব খুইয়েছিল অনেক আগেই, আর তরুণ-বয়সী হয়েও সেটা ইতোমধ্যে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলছিল এবং বকবকানি আর ভুয়ো-কূটনীতিক নীচবৃত্তির যাবতীয় ছলাকলায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠছিল। গোড়ায় সেটাকে ছেয়ে ছিল ক্ষমতার এবং জর্মানির পুনরুজ্জীবন আর একত্বের স্বপ্ন এবং বিভ্রম, তার থেকে অবশিষ্ট রইল শুধু এক-প্রস্থ চটকদার টিউটনিক ফাঁকাবুলি, যা আওড়ান হত যেকোন উপলক্ষে, আর রইল নিজ গুরুত্ব এবং জনসাধারণের সহজবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সদস্যের দৃঢ়প্রত্যয়। বর্জন করা হল গোড়াকার অতি-সরল ভাব; জার্মান জনগণের প্রতিনিধিরা হয়ে উঠলেন বিষয়বুদ্ধিতে পোক্ত মানুষ, অর্থাৎ কিনা, তাঁরা বুঝে ফেললেন তাঁরা করবেন যত কম আর বকবক করবেন যত বেশি, ততই নিরাপদ হবে জার্মানির ভাগ্যক্ষেত্রে সালিস হিসেবে তাঁদের অবস্থান। নিজেদের কার্যবাহকে তাঁরা অনাবশ্যক বিবেচনা করলেন তা নয়; ঠিক তার উলটো। কিন্তু তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সমস্ত সত্যিকারের প্রশ্ন তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ ক্ষেত্র বলে সেগুলো নিয়ে উচ্চবাচ্য না করাই ভাল। তাঁরা অবশেষে যে নিয়তির কবলিত হয়েছিলেন সেটারই উপযুক্ত গুরুত্ব আর অধ্যবসায় সহকারে তাঁরা 'লোয়ার এম্পায়ারে'র একদল বিজ্ঞাপিত ডাক্তারের মতো

আলোচনা করলেন সভ্য জগতের সর্বত্র অনেক আগেই মীমাংসিত বিভিন্ন তত্ত্বগত নীতিসূত্রাদি নিয়ে, কিংবা যৎসামান্য ব্যবহারিক প্রশ্নাবলি নিয়ে, যে আলোচনা কখনও কোন ব্যবহারিক ফলে পৌঁছয় নি। সদস্যদের পারস্পরিক শিক্ষণের ল্যাংকাস্টারীয় বিদ্যালয় (৪৯) গোছের এই পরিষদ তাই সদস্যদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁরা এই প্রত্যয়ের বশবর্তী হলেন যে, জার্মান জনগণের যতখানি প্রত্যাশা করার অধিকার ছিল তার চেয়ে বেশিই করছিল ঐ পরিষদ; আর তাঁদের কোন ফলে পৌঁছতে বলার ঔদ্ধত্য যার হত এমন প্রত্যেকে তাঁদের বিবেচনায় ছিল দেশদ্রোহী।

ভিয়েনার অভ্যুত্থান ফেটে পড়লে সেটা সম্বন্ধে তোলা হল একগাদা প্রশ্ন, বিতর্ক, প্রস্তাব আর সংশোধনী; সেগুলো অবশ্য ছিল নিষ্ফল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ আবশ্যক হল। সেখান থেকে ভিয়েনায় পাঠান হল দু'জন কমিসার — ভূতপূর্ব উদারপন্থী মিঃ ভেল্কার এবং মিঃ মোস্‌লে। জার্মান একত্বের এই দুই দুঃসাহসী কর্মব্রতীর বীরকীর্তি এবং আশ্চর্য অভিযানগুলির সঙ্গে তুলনায় ডন্ কুইক্সোট আর সাঙ্কো পাঞ্জার সফর একটা ওডিসির বিষয়বস্তু হতে পারে। তাঁদের ভিয়েনায় যাবার সাহস হয় নি, ভিন্দিশগ্রেৎস তাঁদের প্রতি তর্জন-গর্জন করেন, ভাহা মূর্খ সম্রাটটি* সবিস্ময় কৌতূহল প্রকাশ করেন, আর মন্ত্রী স্টাডিয়ন ধোঁকা দেন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে। ফ্রাঙ্কফুর্টের কার্যবিবরণী থেকে বোধ হয় একমাত্র যে অংশটা জার্মান সাহিত্যে স্থান পাবে সেটা তাঁদের পাঠান বার্তা আর রিপোর্টগুলি; সেগুলো মিলিয়ে হয়েছে একটা রেডিমেড নিখুঁত বিদ্রূপাত্মক রমন্যাস, আর ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদ এবং সেটার সরকারের কলঙ্কের একটা চিরস্থায়ী স্মৃতিনিদর্শন।

ভিয়েনায় জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্ব তুলে ধরার জন্যে পরিষদের বাম পক্ষও (৫০) সেখানে পাঠিয়েছিল দু'জন কমিসার — মিঃ ফ্রোবেল এবং মিঃ রবার্ট ব্লুম। বিপ্লব কাছিয়ে এলে ব্লুম ঠিকই বিবেচনা করেছিলেন যে, সেখানে লড়া হবে জার্মান বিপ্লবের প্রধান লড়াইটা, তিনি ঐ ব্যাপারে জীবন পণ করতে মনস্থ করেছিলেন দ্বিধা না করে। তার বিপরীতে ফ্রোবেলের মত ছিল এই যে, ফ্রাঙ্কফুর্টে নিজ পদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের জন্যে নিজেকে

* প্রথম ফার্ডিনান্ড। — সম্পাঃ

নিরাপদ রাখা তাঁর কর্তব্য। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে সবচেয়ে বাকপটুদের একজন বলে গণ্য ছিলেন ব্লুম; তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। কোন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারি পরিষদে তাঁর বাকপটুতা পরীক্ষায় টিকত না; ভিন্নমতের জার্মান ধর্মপ্রচারকের মতো অগভীর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যাসক্ত, আর দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতা এবং ব্যবহারিক বাস্তবিকতার সঙ্গে পরিচয় দুইয়েরই অভাব থাকত তাঁর যুক্তিগুলিতে। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন 'পরিমিত গণতন্ত্রের' পক্ষে, সেটা একটা অনির্দিষ্ট ধরনের বস্তু, সেই মত পোষণ করা হত বরং সেটার নীতিতে নির্দিষ্টতার অভাবেরই কারণে। তবে এই সবকিছু সত্ত্বেও রবার্ট ব্লুম ছিলেন স্বভাবগুণেই পুরোদস্তুর যদিও কিছুটা মার্জিত প্লিবিয়ান; নিষ্পত্তিকর মুহূর্তগুলিতে তাঁর অনির্দিষ্ট তাই অনিশ্চিত রাজনীতিক মত আর জ্ঞানকে ছাপিয়ে যেত তাঁর প্লিবিয়ান সহজজ্ঞান এবং প্লিবিয়ান কর্মতৎপরতা। এমনসব মুহূর্তে নিজ ক্ষমতার সাধারণ মান অনেকটা ছাড়িয়ে উঠতেন তিনি।

এইভাবে, ভিয়েনায় এক নজরেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হতে হবে সেখানে, ফ্রাঙ্কফুর্টের ভবিষ্য মার্জিত বিতর্কগুলির মাঝে নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ মনস্থির করে ফেললেন, একেবারেই ছাড়লেন পিছু হঠার ধারণা, বৈপ্লবিক বাহিনীতে একটা পরিচালন পদ নিলেন, আর তাঁর আচরণে দেখা গেল অসাধারণ স্থিরবুদ্ধি এবং সংকল্প। বেশ কিছুকাল ধরে শহর দখল পিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং ডানিউব নদীতে টাবোর সেতু পুড়িয়ে দিয়ে শহরের একটা পার্শ্বভাগকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন তিনিই। শহর দখল হবার পরে তিনি গ্রেপ্তার হন, তাঁর বিচার হয় সামরিক আদালতে, তাঁকে গুলি করে মারা হয়, তা সবাই জানে। বীরের মৃত্যু হয় তাঁর। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ বিভীষিকাগ্রস্ত হলেও সেই রক্তাক্ত অবমাননাটাকে নিল যেন প্রসন্নভাবেই। একটা প্রস্তাব পাস হল, তাতে নরম ভাব এবং ভাষার কূটনীতিক শোভনতার ফলে সেটা অস্ট্রিয়ার ঘৃণার কলঙ্কচিহ্ন হবার চেয়ে বেশি হল খুন করা শাহিদের কবরে অবমাননার ছাপ। তবে এই ঘৃণ্য পরিষদ সেটার একজন সদস্যের, বিশেষত বাম পক্ষের নেতার হত্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করবে তা প্রত্যাশিত ছিল না।

লন্ডন, মার্চ, ১৮৫২

১৩

প্রুশীয় সংবিধান-সভা। জাতীয় পরিষদ

১ নভেম্বর ভিয়েনার পতন ঘটে, আর ঐ মাসেরই ৯ তারিখে বার্লিনে সংবিধান-সভা ভেঙে দেওয়া হয়, তার থেকে দেখা যায় ঘটনাটা সারা জার্মানিতে প্রতিবৈপ্লবিক তরফের উৎসাহ আর শক্তি সঙ্গেসঙ্গেই কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রাশিয়ায় ১৮৪৮ সালের গ্রীষ্মকালের ঘটনাবলির কথা একটু পরেই বলা হচ্ছে। সংবিধান-সভা, কিংবা বরং 'একটা সংবিধান সম্বন্ধে ক্রাউনের সঙ্গে ঐকমত্যে পেঁছবার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত পরিষদ' এবং বুর্জোয়া পক্ষ থেকে সেটার অধিকাংশ প্রতিনিধি জনসমষ্টির অপেক্ষাকৃত কর্মতৎপর অংশের ভয়ে রাজদরবারের যাবতীয় চক্রান্তে প্রশ্রয় দেওয়ার দরুন জনসাধারণের সমস্ত শ্রদ্ধা খুইয়ে বসেছিল অনেক কাল আগেই। সামন্ততন্ত্রের জঘন্য বিশেষাধিকারগুলোকে তারা অনুমোদন করেছিল, বরং পুনঃস্থাপন করেছিল, এবং এইভাবে বিকিয়ে দিয়েছিল কৃষককুলের স্বাধীনতা আর স্বার্থ। তারা সংবিধান রচনাও করতে পারে নি, সাধারণ আইন সংশোধনও করতে পারে নি কোনভাবে। নানা সূক্ষ্ম তত্ত্বগত সংজ্ঞা, বিভিন্ন নিছক আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক শিষ্টাচার সংক্রান্ত প্রশ্নাবলি নিয়েই তারা ব্যাপৃত ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে। প্রকৃতপক্ষে, লোকে যাতে আগ্রহান্বিত হতে পারে এমন একটা সংস্থার চেয়ে বেশি পরিমাণে এই পরিষদটা ছিল সেটার সদস্যদের পার্লামেণ্টারি savoir vivre* শিক্ষালয়। তাছাড়া, এতে কোন স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষিত হত না, সেটা প্রায় সবসময়েই নির্ধারিত করত দোলায়মান **'মধ্যপন্থীরা'**, দক্ষিণ থেকে বামে এবং তদ্বিপরীতে তাদের দোলনের ফলে প্রথমে কাম্পহাউজেনের এবং পরে আউয়ের্সভাল্ড আর হানজেমানের মন্ত্রিসভা উলটে পড়েছিল। কিন্তু যেমন অন্য সব জায়গায়

---

* সাংসারিক প্রজ্ঞা। — সম্পাঃ

তেমনি এখানেও উদারপন্থীরা এইভাবে সুযোগ হাত ফসকে যেতে দিয়েছে, আর তখন রাজদরবার নিজের শক্তি পুনঃসংগঠিত করেছে; ঐ শক্তিতে ছিল অভিজাতকুল এবং গ্রামীণ জনসমষ্টির সবচেয়ে অমার্জিত অংশ, তেমনি ফৌজ আর আমলাতন্ত্র। হানজেমানের পতনের পরে সব কট্টর প্রতিক্রিয়াপন্থী আমলা আর সামরিক অফিসারদের নিয়ে একটা মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল, সেটা কিন্তু পার্লামেণ্টের দাবির কাছে আপাতদৃষ্টিতে নতিস্বীকার করেছিল। 'লোকেরা নয়, ব্যবস্থাবলি' এই উপযুক্ত নীতি অনুসারে চলতে গিয়ে পরিষদটি প্রকৃতপক্ষে প্রতারিত হয়ে এই মন্ত্রিসভাকে বাহবা দিয়েছিল, তবে ঐ মন্ত্রিসভাটাই প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত এবং সংগঠিত করার যে কাজ চালাচ্ছিল প্রায় প্রকাশ্যেই সে সম্বন্ধে তাদের হুঁশ ছিল না। শেষে ভিয়েনার পতন থেকে সংকেত এলে রাজা* তাঁর মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে তাদের জায়গায় বসান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাণ্টেউফেলের নেতৃত্বে 'কাজের লোকদের'। স্বপ্নাবিষ্ট পরিষদ অমনি বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট পাস করায়; সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবে একটা ডিক্রির জোরে পরিষদকে স্থানান্তরিত করা হয় বার্লিন থেকে ব্রান্ডেনবুর্গে, — কোন সংঘর্ষ ঘটলে পরিষদ বার্লিনে জনগণের সমর্থনের ভরসা করতে পারত, আর ব্রান্ডেনবুর্গ হল সম্পূর্ণভাবে সরকারের মুখাপেক্ষী একটা ছোট্ট মফস্বল শহর। কিন্তু পরিষদ ঘোষণা করল, নিজ সম্মতি ব্যতিরেকে তার অধিবেশন মুলতবি, সেটাকে স্থানান্তরিত করা, কিংবা ভেঙে দেওয়া যায় না। ইতোমধ্যে, চল্লিশ হাজার সৈন্য পরিচালনা করে জেনারেল দ্রাঙ্গেল প্রবেশ করলেন বার্লিনে। পৌর শাসক এবং জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অফিসারদের এক সভায় কোন প্রতিরোধ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পরিষদ এবং সেটার পক্ষীয় উদারপন্থী বুর্জোয়ারা প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করতে এবং প্রতিরক্ষার প্রায় প্রত্যেকটা উপায় তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে দিয়েছিল সংযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল তরফকে — তারপরে তারা তখন শুরু করল 'নিষ্ক্রিয় এবং বৈধ প্রতিরোধ'-এর সেই চমকদার প্রহসন, যেটাকে তারা করতে চেয়েছিল হ্যাম্পডেনের এবং

* চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেলম। — সম্পঃ

স্বাধীনতার যুদ্ধে (৫১) আমেরিকানদের প্রথম প্রচেষ্টাগুলির দৃষ্টান্তের গৌরবময় অনুকরণ। বার্লিনে অবরোধের অবস্থা ঘোষিত হল, সঙ্গেসঙ্গেই শান্ত রইল বার্লিন; জাতীয় রক্ষিবাহিনীকে সরকার ভেঙে দিল, তারা অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল পরম তৎপরতা সহকারে। একপক্ষ কাল ধরে এক সভাস্থল থেকে আর-একটাতে পরিষদকে তাড়া করে ফিরে সৈন্যদল সর্বত্র সভাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করল, আর নাগরিকদের শান্ত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল পরিষদ। শেষে, পরিষদ ভেঙে দেওয়া হল বলে সরকারের ঘোষণা হলে পরিষদ কর ধার্য করা বেআইনী ঘোষণা করে একটা প্রস্তাব পাস করল, তারপরে কর-বন্ধ সংগঠিত করার জন্যে পরিষদের সদস্যারা ছড়িয়ে পড়লেন দেশের সর্বত্র। কিন্তু তাঁরা দেখতে পেলেন উপায় বাছনে নিদারুণ ভুল হয়েছিল তাঁদের। অল্প কয়েকটা উত্তেজনাময় সপ্তাহ কাটল, তারপরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চলল সরকারের কঠোর ব্যবস্থাবলি, তখন যে বিলুপ্ত পরিষদ আত্মরক্ষা করার সাহস পর্যন্ত করে নি সেটাকে খুশি করার জন্যে কর বন্ধ করার চিন্তা ছেড়ে দিল প্রত্যেকেই।

১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সশস্ত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করার সময় আর ছিল না কিনা, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতা লক্ষ্য করে ফৌজের একটা অংশ পরিষদের পক্ষে চলে যেত এবং এইভাবে পরিষদের সপক্ষে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যেত কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ত কখনও না-ও হতে পারে। তবে যেমন যুদ্ধে তেমনি বিপ্লবে শক্তিমত্তা প্রদর্শন আবশ্যক, তেমনি যে আক্রমণ করে সে-ই সুবিধে পায়; আর যেমন যুদ্ধে তেমনি বিপ্লবে অনুকূলে-প্রতিকূলে অসমতা যা-ই থাক, নিষ্পত্তিকর মুহূর্তে সবকিছু পণ করাটা সর্বোচ্চ মাত্রায় আবশ্যক। এইসব স্বতঃসিদ্ধের যাথার্থ্য যাতে প্রতিপন্ন হয় নি এমন একটাও কৃতকার্য বিপ্লব নেই ইতিহাসে। প্রুশীয় বিপ্লবের বেলায় নিষ্পত্তিকর মুহূর্তটা এসেছিল ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে; সরকারীভাবে সমগ্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্বে অবস্থিত প্রুশীয় সংবিধান-সভা শক্তিমত্তা প্রদর্শন তো করেই নি — শত্রুর প্রত্যেকটা অগ্রগতির মুখে সেটা হটে গেছে; আক্রমণ করা তো আরও দূরের কথা — সেটা আত্মরক্ষা করতেও মনস্থ করে নি। নিষ্পত্তিকর মুহূর্ত যখন এসেছিল, চল্লিশ হাজার সৈন্য পরিচালনা করে ভ্রাঙ্গেল যখন বার্লিনের ফটকে-ফটকে ঘা মেরেছিলেন

তিনি এবং তাঁর সমস্ত অফিসার সর্বত মনে করেছিলেন তিনি দেখবেন প্রত্যেকটা রাস্তা ব্যারিকেডে গিজগিজ করছে, গুলি ছোড়ার গর্তে পরিণত হয়েছে প্রত্যেকটা জানলা, কিন্তু তার বদলে তিনি দেখেছিলেন ফটকগুলো খোলা, আর রাস্তায়-রাস্তায় বাধা শুধু বার্লিনের শান্তিপূর্ণ বার্গাররা, তারা হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় স্তম্ভিত সৈনিকদের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে ভ্রাঙ্গেলের সঙ্গে যে তামাসাটা করেছিল তাই নিয়ে মজা করছিল। পরিষদ এবং জনগণ প্রতিরোধ করলে তাদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হতে পারত তা ঠিক; বার্লিনের উপর গোলা বর্ষিত হতে পারত, বহু শত মানুষ নিহত হতে পারত, অথচ রাজতান্ত্রিক তরফের আখেরী বিজয় রোধ হত না, তা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সমর্পণ করার জন্যে সেটা কোন কারণ হতে পারে না। ভালভাবে লড়ে পরাজয় হলে সে ঘটনার বৈপ্লবিক গুরুত্ব সহজে অর্জিত জয়েরই মতো। ১৮৪৮ সালে জুন মাসে প্যারিসের এবং অক্টোবর মাসে ভিয়েনার পরাজয় এই নগরী দুটির মানুষের মনে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে ফেব্রুয়ারি আর মার্চের বিজয়ের চেয়ে নিশ্চয়ই ঢের বেশিই করেছিল। পরিষদ এবং বার্লিনের জনসাধারণের নিয়তি হয়ত উল্লিখিত শহর দুটির মতোই হত, কিন্তু তাদের পতনটা গৌরবময়, আর তাদের পিছনে যারা টিকে থাকত তাদের মনে রেখে যেত প্রতিশোধের কামনা, যেটা হল বৈপ্লবিক কালপর্যায়ে তেজীয়ান এবং প্রচন্ড আবেগপূর্ণ কর্মকান্ডের সবচেয়ে মস্ত একটা প্রবর্তনা। প্রত্যেকটা সংগ্রামে চ্যালেঞ্জ যে গ্রহণ করে তার পরাস্ত হবার ঝুঁকি থাকে, এটা তো স্বাভাবিক, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করার এবং অস্ত্রধারণ না করেই বশ্যতা মেনে নেবার কারণ হতে পারে কি সেটা?

বিপ্লবে যে কোন নিষ্পত্তিকর অবস্থান নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু শত্রুকে আক্রমণে শক্তিপরীক্ষা করতে বাধ্য করার বদলে সমর্পণ করে সেই অবস্থান সে সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য হবারই যোগ্য।

যেটাতে প্রাশিয়ার রাজা সংবিধান-সভা ভেঙে দিয়েছিলেন সেই একই ডিক্রিতে একটা নতুন সংবিধানও ঘোষিত হয়েছিল, সেটা ছিল ঐ পরিষদেরই একটা কমিশনের রচিত খসড়ার ভিত্তিতে। তবে তাতে কোন কোন বিষয়ে ক্রাউনের ক্ষমতা আরও বাড়ান হয়েছিল, আর অন্য কোন কোন বিষয়ে অনিশ্চিত করে তোলা হয়েছিল পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে। ঐ সংবিধান

দুটো কক্ষ স্থাপন করেছিল; সংবিধান নিয়ে আলোচনা এবং অনুমোদন করার জন্যে কক্ষ-দুটোর অধিবেশন বসার কথা ছিল শিগ্‌গিরই।

প্রুশীয় নিয়মতন্ত্রীদের 'বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ' সংগ্রামের সময়ে জার্মান জাতীয় পরিষদ কোথায় ছিল, সে প্রশ্ন তোলার বড় একটা প্রয়োজন নেই। সেটা ফ্রাঙ্কফুর্টের প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রুশীয় সরকারের কার্যবাহের বিরুদ্ধে নিস্তেজ প্রস্তাব পাস করার এবং 'পাশব শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়, বৈধ এবং সর্বসম্মত প্রতিরোধের সমারোহময় দৃশ্যে'র তারিফ করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। মন্ত্রিসভা এবং পরিষদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে বার্লিনে কমিসারদের পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু তাদেরও হয়েছিল আগে ওলমুটস-এ পাঠান কমিসারদেরই মতো দশা — ভদ্রভাবে তাদের বিদেয় করা হয়েছিল। জাতীয় পরিষদের বাম অংশ, অর্থাৎ তথাকথিত র‍্যাডিকাল তরফও তাদের কমিসারদের পাঠিয়েছিল, তবে বার্লিন পরিষদের যৎপরোনাস্তি অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে যথাযোগ্যভাবে নিশ্চিত হয়ে এবং নিজেদের সমানই অসহায় অবস্থা কবুল করে তারা ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে উন্নতি ঘটে বলে রিপোর্ট দিয়েছিল, আর জানিয়েছিল যে, বার্লিনের মানুষের আচরণ যথার্থই প্রশংসনীয়ভাবে শান্তিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম কমিসার মিঃ বাসেরমান তাঁর বিবরণে বলেছিলেন যে, প্রুশীয় মন্ত্রীদের কিছুকাল আগেকার কঠোর ব্যবস্থাবলি ভিত্তিহীন নয়, কেননা ইদানীং বার্লিনের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল কতিপয় হিংস্রদর্শন লোকজনকে, কোন অরাজকতার আন্দোলনের আগে যেমনটা দেখা দেয় সবসময়েই (আর যাদের তখন থেকে বলা হচ্ছে 'বাসেরমানীয় লোক'), তখন বাম অংশের এই গুণধর ডেপুটিরা, বৈপ্লবিক পক্ষের কর্মতৎপর সমর্থকরা যথার্থই উঠে দাঁড়িয়ে হলফ করে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ব্যাপারটা তেমন ছিল না! এইভাবে দু'মাসের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের ষোল-আনা অক্ষমতা। এই সংস্থাটা ছিল সেটার করণীয় কাজের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত, শুধু তাই নয়, নিজ করণীয় কাজটা আসলে কী সে সম্বন্ধে লেশমাত্র ধারণাও ছিল না এই সংস্থাটার তাতে এর চেয়ে বেশি দগদগে প্রমাণ আর হতে পারত না। ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের অস্তিত্বের প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ না করেই ভিয়েনা আর

বার্লিন উভয়ত্র বিপ্লবের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেল, উভয় রাজধানীতে সবচেয়ে জরুরী এবং চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্নাবলির মীমাংসা হয়ে গেল; কেবল এই অবস্থাটাই এটা প্রতিপাদন করার জন্যে যথেষ্ট যে, সংস্থাটা ছিল একটা বিতর্ক-সভামাত্র, বোকা-বনা একপ্রস্থ লোক নিয়ে সেটা গঠিত। সরকার তাদের দিয়ে পার্লামেণ্টারি পুতুলনাচ করাতে পেরেছিল, সে নাচ দেখান হয়েছিল খুদে খুদে রাজ্য আর খুদে খুদে শহরের দোকানদার আর খুদে ব্যাপারীদের মনোরঞ্জনের জন্যে, যতক্ষণ এইসব তরফের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করাবার জন্যে সেটা উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল। সেটা উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল কতকাল, তা আমরা দেখব অচিরেই। তবে এটা লক্ষণীয় যে, এই পরিষদের সমস্ত 'বিশিষ্ট' ব্যক্তির মধ্যে একজনও ঘুণাক্ষরে টের পান নি কোন্ ভূমিকায় তাঁদের অভিনয় করান হয়েছিল, আর এমনকি অদ্যাবধি ফ্রাঙ্কফুর্ট ক্লাবের প্রাক্তন সদস্যদের ইতিহাস উপলব্ধির ইন্দ্রিয় নিয়ত একরূপ, যা তাদেরই বেলায় বিশিষ্ট।

লণ্ডন, মার্চ, ১৮৫২

১৪

শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন। ডায়েট এবং কক্ষ

১৮৪৯ সালের প্রথম মাসগুলিকে অস্ট্রীয় এবং প্রুশীয় সরকার লাগিয়েছিল আগের অক্টোবর আর নভেম্বর মাসে পাওয়া সুবিধাগুলোকে আরও কার্যকর করে তোলার জন্যে। ভিয়েনা দখলের পর থেকে অস্ট্রিয়ার ডায়েট মরাভিয়ার ক্রেমসির* নামে একটা ছোট মফস্বল শহরে ছিল নামেমাত্র। তাদের নির্বাচকদের সমেত স্লাভ ডেপুটিরা ছিল অস্ট্রীয় সরকারকে সেটার অসহায় দশা থেকে টেনে তুলতে প্রধান সহায় — তারা ইউরোপীয় বিপ্লবের

* চেক্ নাম: ক্রোমের্জিজ। — সম্পাঃ

বিরুদ্ধে বেইমানির বিলক্ষণ প্রতিফল পেল এখানে। সরকার শক্তি পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে ডায়েট এবং সেটার স্লাভ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকল, আর সাম্রাজ্যিক অস্ত্রশক্তির প্রথম সাফল্যগুলি থেকে হাঙ্গেরীয় যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তির পূর্বলক্ষণ দেখা গেলে সরকার ৪ মার্চ ডায়েট ভেঙে দিয়ে সামরিক শক্তি দিয়ে ডেপুটিদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। অবশেষে তখন স্লাভরা বুঝল তাদের বোকা বানান হয়েছে, আর তখন তারা হাঁক ছাড়ল: 'চলো ফ্রাঙ্কফুর্টে! বিরোধিতা এখানে চালান যায় না — সেটা চালাতে হবে সেখান থেকে!' কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল, আর চুপচাপ থাকা কিংবা অক্ষম ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে যোগ দেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না, কেবল এটাই তাদের যৎপরোনাস্তি অসহায় অবস্থাটাকে দেখিয়ে দিতে যথেষ্ট ছিল।

জার্মানির স্লাভদের স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এইভাবে শেষ হল তখনকার মতো এবং খুব সম্ভব চিরকালের জন্যে। বহু জাতির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এইসব অবশেষ, এগুলির জাতিসত্তা আর রাজনীতিক প্রাণশক্তি লোপ পেয়েছিল দীর্ঘকাল আগে, তার ফলে এগুলি প্রায় হাজার বছর ধরে অধিকতর ক্ষমতাশালী বিজেতা জাতির পায়ে-পায়ে চলতে বাধ্য হয়েছিল, ঠিক যেমন ইংলন্ডে ওয়েল্স্ জাতি, স্পেনে বাস্ক্রা, ফ্রান্সে দক্ষিণ-ব্রেতন্রা, এবং উত্তর আমেরিকার যেসব অংশ ইদানীং ইঙ্গ-মার্কিন নকুলের অধিকৃত সেগুলিতে স্পেনীয় আর ফরাসী ক্রিওল্রা, সেই মৃতকল্প জাতিসত্তাগুলি — বোহেমীয়, ক্যারিন্থীয়, ডালমাটীয়, ইত্যাদিরা —৮০০ খ্রীষ্টাব্দের তাদের রাজনীতিক স্থিতাবস্থা (status quo) পুনরুদ্ধারের জন্যে ১৮৪৮ সালের সর্বব্যাপী তালগোল পাকান অবস্থা থেকে লাভবান হতে চেষ্টা করেছিল। হাজার বছরের ইতিহাস দেখে তাদের বোঝা উচিত ছিল এমন প্রতীপগতি অসম্ভব; তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এল্বা আর সালে-এর পূবে সমস্ত অঞ্চলকে যে সগোত্র স্লাভরা দখল করেছিল সেটা থেকে ইতিহাসক্রমিক ধারাটাই শুধু প্রমাণিত হয়েছিল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হয়েছিল জার্মান জাতির প্রাচীন পূর্বী প্রতিবেশীদের বশীভূত, গ্রাস এবং আত্মভূত করতে জার্মান জাতির শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতা; তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, জার্মানদের এই আত্মভূত করার প্রবণতাটা

বরাবর এবং তখনও ছিল সবচেয়ে পরাক্রমশালী একটা উপায় যেটার সাহায্যে ইউরোপ মহাদেশের পূর্বভাগে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল; তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, সেটা ক্ষান্ত হতে পারে একমাত্র যখন জার্মানী-করণের প্রক্রিয়াটা পৌঁছয় স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন যাপনে সক্ষম কোন বৃহৎ, নিবিড়, অখণ্ডিত জাতির সীমান্তে, যেমন হাঙ্গেরীয়রা এবং কিছু পরিমাণে পোলরা; আর কাজেই তাদের বোঝা উচিত ছিল যে, তাদের অধিকতর শক্তিশালী প্রতিবেশীদের দ্বারা মিলিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়াটাকে নিষ্পন্ন হতে দেওয়াই ছিল এইসব মৃতকল্প জাতির স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থী স্বপ্নবিলাসীরা বোহেমীয় এবং দক্ষিণ-স্লাভদের একাংশকে আলোড়িত করতে কৃতকার্য হয়েছিল — তাদের পক্ষে অমন ভবিষ্য চিত্র অবশ্য প্রীতিকর নয়। কিন্তু, এখানে রয়েছে অল্প কয়েকটা ক্ষয়গ্রস্ত জনসমষ্টি, তারা যে অঞ্চলের অধিবাসী তার প্রত্যেকটা অংশের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জার্মানরা, আর অঞ্চলটাকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে জার্মানরা, তেমনি প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সভ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে জার্মান ছাড়া কোন ভাষা তাদের ছিল না, তাদের নেই জাতিগত অস্তিত্বের একেবারে প্রথম দুটো শর্ত — সংখ্যা আর আঞ্চলিক অখণ্ডতা — এই জনসমষ্টিগুলিকে খুশি করার জন্যে ইতিহাস হাজার বছর পিছিয়ে যাবে, এমনটা আশা করতে পারে কি সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থীরা? জার্মান আর হাঙ্গেরীয় স্লাভ অঞ্চলগুলির সর্বত্র সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থী অভ্যুত্থান ছিল এই সমস্ত অগুন্তি খুদে জাতির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের ছদ্মবেশ, এই অভ্যুত্থান সর্বত্র ইউরোপীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির বিরোধী হয়, এইভাবে স্লাভরা মুক্তির জন্যে লড়াইয়ের ভান করলেও, সবসময়েই (পোলদের গণতান্ত্রিক অংশ বাদে) তাদের দেখা গেছে স্বৈরতন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে। এমনটাই জার্মানিতে, এমনটাই হাঙ্গেরিতে, এমনকি তুরস্কে এখানে-সেখানেও এমনটাই। জনগণের কর্মব্রতের বিরুদ্ধে বেইমান, অস্ট্রীয় সরকারের গুপ্ত চক্রের সমর্থক এবং প্রধান ঠেকনো হিসেবে তারা সমস্ত বৈপ্লবিক জাতির বিবেচনায় স্বভাবদুর্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। জাতিসত্তা সম্বন্ধে সর্বস্লাভ সমন্বয়পন্থী নেতাদের বাধান ঝগড়াঝাঁটিতে স্লাভ জনসাধারণের ব্যাপক অংশ কোথাও অংশগ্রহণ করে নি, তারা বড় বেশি অজ্ঞ

এই কারণেই, তবু এটা কখনও বিস্মৃত হবে না যে, আধা-জার্মান শহর প্রাগে স্লাভীয় উন্মাদনাগ্রস্ত ভিড় 'জার্মান মুক্তির চেয়ে রুশী চাবুকই ভাল' জিগিরে সোল্লাসে সাড়া দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালে প্রথম উবে-যাওয়া প্রচেষ্টার পরে এবং অস্ট্রীয় সরকারের দেওয়া শিক্ষার পরে পরবর্তী কোন সুযোগে আর-একটা চেষ্টা সম্ভবত হবে না। তবে তারা যদি অনুরূপ ছুতোয় আবার প্রতিবৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধতে চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে জার্মানির কর্তব্য স্পষ্টই। বিপ্লবের অবস্থায় এবং বহির্যুদ্ধে জড়িত কোন দেশ একেবারে নিজ মর্মদেশে একটা ভাঁদে (৫২) বরদাস্ত করতে পারে না।

ডায়েট ভেঙে দেবার একই সঙ্গে সম্রাটের* ঘোষিত সংবিধানের কথায় ফিরে যাবার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা সেটার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না কখনও, আর এখন সেটা খতম হয়ে গেছে একেবারেই। ১৮৪৯ সালের ৪ মার্চ থেকেই অস্ট্রিয়ায় স্বৈরতন্ত্র বস্তুত সম্পূর্ণভাবে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

প্রাশিয়ায় রাজার ঘোষিত নতুন সনদ আলোচনা এবং অনুমোদন করার জন্যে ফেব্রুয়ারি মাসে কক্ষ দুটির অধিবেশন বসেছিল। অধিবেশন চলেছিল প্রায় ছ' সপ্তাহ ধরে, সরকারের উদ্দেশে তাদের আচরণ ছিল বেশ নম্র এবং বশংবদ, তবু রাজা এবং তাঁর মন্ত্রীরা যতটা চাইছিলেন ততদূর যেতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই উপযুক্ত সুযোগ আসামাত্র কক্ষ দুটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া উভয়েই তখনকার মতো পার্লামেণ্টারি নিয়ন্ত্রণের বেড়ি থেকে অব্যাহতি পেল। তখন সমস্ত ক্ষমতা সরকার দুটোর হাতে কেন্দ্রীভূত, তখন তারা সে ক্ষমতা খাটাতে পারে যেখানেই আবশ্যক: হাঙ্গেরি আর ইতালির উপর অস্ট্রিয়া, জার্মানির উপর প্রাশিয়া। কেননা, প্রাশিয়াও ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে 'শৃঙ্খলা' পুনঃস্থাপনের অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

জার্মানির মস্ত কর্মকান্ডকেন্দ্র দুটোয় — ভিয়েনায় আর বার্লিনে — তখন প্রতিবিপ্লবের সর্বপ্রাধান্য, তখন বাকি ছিল শুধু ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি, যেখানে সংগ্রামের তখনও নিষ্পত্তি হয় নি, যদিও সেখানেও পাল্লা ক্রমাগত

---

* প্রথম ফ্রানৎস-জোসেফ। — সম্পাঃ

বেশি ভারি হচ্ছিল বৈপ্লবিক পক্ষের বিরুদ্ধে। যা আমরা বলেছি, এইসব ক্ষুদ্রতর রাজ্যের একই কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল ফ্রাংকফুর্টের জাতীয় পরিষদ। এই তথাকথিত জাতীয় পরিষদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি দীর্ঘকাল যাবত স্পষ্টপ্রতীয়মান ছিল, সেটা এতখানি যাতে ফ্রাংকফুর্টেরই মানুষ অস্ত্রধারণ করেছিল সেটার বিরুদ্ধে, তবু সেটার উদ্ভবের ধরনটা ছিল কমবেশি বৈপ্লবিক। জানুয়ারি মাসে সেটা ছিল একটা অস্বাভাবিক বৈপ্লবিক অবস্থানে; সেটার এক্তিয়ার কখনও নির্দিষ্ট করা হয় নি, এবং সেটা শেষে স্থির করেছিল যে, সেটার সিদ্ধান্তের আছে আইনগত বলবত্তা, যদিও বৃহত্তর রাজ্যগুলি কখনও তা মানে নি। এই পরিস্থিতিতে, আর যখন নিয়মতান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক তরফ দেখল স্বৈরতন্ত্রীরা আবার বল পেতে থাকবার ফলে তাদের অবস্থা ঘুরে যাচ্ছে, তখন প্রায় সমগ্র জার্মানির উদারপন্থী রাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা এই পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে করল শেষ ভরসাস্থল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই — ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক তরফের কেন্দ্রী অংশ পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা তাদের বেড়ে-চলা দুর্দশার অবস্থায় এই একই সংস্থার সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশকে ঘিরে জড় হয়েছিল, এই যে অংশটা বাস্তবিকই ছিল গণতন্ত্রের শেষ দৃঢ় পার্লামেণ্টারি ব্যূহ। অন্য দিকে, বৃহত্তর সরকারগুলোর, বিশেষত প্রুশীয় মন্ত্রিসভার বিবেচনায় জার্মানিতে পুনঃস্থাপিত রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে এমন একটা অনিয়মিত নির্বাচিত সংস্থার অস্তিত্ব ক্রমেই বেশি বেখাপ ঠেকছিল, সেটাকে তারা যে তৎক্ষণাৎ জোর করে ভেঙে দেয় নি তার কারণ শুধু এই যে তখনও সময় আসে নি, তাছাড়া, প্রাশিয়া সেটাকে আগে নিজ উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য হাসিল করার জন্যে ব্যবহার করবে বলে আশা করেছিল।

সেই বেচারা পরিষদটা নিজেই ইতোমধ্যে পড়েছিল ক্রমেই বেশি পরিমাণ তালগোল পাকান অবস্থার মধ্যে। ভিয়েনা আর বার্লিন উভয়ত্র সেটার ডেপুটেশনগুলি এবং কমিসারদের প্রতি আচরণ করা হয়েছিল যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞাভরে; পার্লামেণ্টারি অনাক্রম্যতা থাকা সত্ত্বেও সেটার একজন সদস্যকে* ভিয়েনায় সাধারণ বিদ্রোহী হিসেবে বধ করা হয়। সেটার ডিক্রিগুলোর প্রতি

* রবার্ট ব্লুম। — সম্পাঃ

কোথাও মনোযোগ দেওয়া হত না; আদৌ ভ্রূক্ষেপ করা হলে সেটা শুধু প্রতিবাদ-লিপিকা দিয়ে, যাতে সরকারগুলোর পক্ষে অবশ্যপালনীয় হিসেবে পরিষদের আইন আর প্রস্তাব পাস করার কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হত। জার্মানির প্রায় প্রত্যেকটা মন্ত্রিসভার সঙ্গে কূটনীতিক কলহে জড়িত ছিল পরিষদের প্রতিনিধি — কেন্দ্রীয় নির্বাহী ক্ষমতা; পরিষদ কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কোনটাই শত চেষ্টা করেও অস্ট্রিয়াকে কিংবা প্রাশিয়াকে তাদের আখেরী অভিমত, পরিকল্পনা এবং দাবি বিবৃত করাতে পারে নি। পরিষদ অবশেষে অন্তত এটুকু স্পষ্ট বুঝতে শুরু করল যে, সেটা সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাত থেকে ফসকে যেতে দিয়েছে, সেটা অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার সম্পূর্ণ আয়ত্তে, জার্মানির জন্যে কোন ফেডারেল সংবিধান আদৌ রচনা করতে মনস্থ করলে সেটা করা চাই অবিলম্বে এবং স্থিরসংকল্প নিয়ে। দোদুল্যমান সদস্যদের অনেকেও স্পষ্ট বুঝলেন সরকারগুলো তাঁদের বোকা বানিয়েছে মর্মান্তিক ধরনে। কিন্তু নিজেদের অক্ষম অবস্থায় তখন কী করবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল? চটপট এবং স্থিরনিশ্চয় হয়ে জনগণের শিবিরে চলে যাওয়াটাই ছিল একমাত্র উপায় যা তাদের রক্ষা করতে পারত, কিন্তু এমনকি সে পদক্ষেপটার কৃতকার্যতাও ছিল অনিশ্চিতই শুধু নয়। তাছাড়া, অস্থিরমনা, অদূরদর্শী, আত্মগর্বী এই লোকগুলো যখন পরস্পরবিরোধী গুজব এবং কূটনীতিক লিপিকাসমূহের অবিরাম কোলাহলে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল তখন এরা একমাত্র সান্ত্বনা আর অবলম্বন খুঁজেছিল এই অন্তহীনভাবে পুনরাবৃত্ত আশ্বাসের মাঝে যে, তারাই দেশের সবচেয়ে সেরা, মহত্তম, বিজ্ঞতম মানুষ, জার্মানিকে রক্ষা করতে পারে কেবল তারাই। এই অসহায় লোকগুলোর ভিড়ের মাঝে, আমরা বলি, একটামাত্র বছরের পার্লামেণ্টারি জীবন যাদের আকাট মূর্খে পরিণত করেছিল সেই তুচ্ছ লোকগুলোর মধ্যে তেজীয়ান আর সংগতিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্যে তো দূরের কথা, তৎপর এবং স্থিরনিশ্চিত সংকল্পের মানুষই-বা কোথায়?

অবশেষে মুখোশ ছুড়ে ফেলে দিল অস্ট্রীয় সরকার। ৪ মার্চের সংবিধানে অস্ট্রিয়াকে অবিভাজ্য রাজতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হল, তাতে একই রাজস্ব ব্যবস্থা, একই বহিঃশুল্ক ব্যবস্থা, সামরিক প্রতিষ্ঠানাদি একই — এইভাবে নিশ্চিহ্ন করা হল জার্মান এবং অ-জার্মান প্রদেশগুলির মধ্যকার

প্রত্যেকটা বাধা আর পার্থক্য। ইতোমধ্যে ফেডারেল সংবিধান পাস হয়েছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে, সেই পরিকল্পিত সংবিধান সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি এবং প্রবন্ধসমূহ সত্ত্বেও এল অস্ট্রীয় সরকারের ঐ ঘোষণা। এটা হল পরিষদের কাছে অস্ট্রিয়ার চ্যালেঞ্জ, সেটা গ্রহণ করা ছাড়া বেচারা পরিষদের গত্যন্তর ছিল না। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদ বিস্তর তর্জন-গর্জন করল, তবে নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং পরিষদের ডাহা নাস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন অস্ট্রিয়া সেটাকে কেটে যেতে দিতে বেশ সমর্থই ছিল। অস্ট্রিয়ার পক্ষ থেকে এই অবমাননার প্রতিশোধ নেবার জন্যে পরিষদ নিজেকে যা বলে অভিহিত করে সেই জার্মান জনগণের প্রতিনিধি হস্তপদবদ্ধ হয়ে প্রুশীয় সরকারের পায়ে আছড়ে পড়াটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বিবেচনা করল। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু অবৈধ এবং জনবিরোধী বলে পরিষদ যাদের উপর ধিক্কার দিয়েছিল, যাদের বরখাস্ত করাবার জন্যে সেটা বৃথাই পীড়াপীড়ি করেছিল, সেই মন্ত্রীদেরই সামনে সেটা নতজানু হল। এই কলঙ্কজনক কাজকারবারের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৎপরবর্তী ট্র্যাজি-কমিকাল ঘটনাবলি হবে আমাদের পরের কিস্তির বিষয়বস্তু।

লন্ডন, এপ্রিল, ১৮৫২

১৫

প্রাশিয়ার জয়

এবার আমরা আসছি জার্মান বিপ্লবের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে: বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগুলির, বিশেষত প্রাশিয়ার সরকারের সঙ্গে জাতীয় পরিষদের বিরোধ; দক্ষিণ আর পশ্চিম জার্মানির অভ্যুত্থান, আর শেষে প্রাশিয়া কর্তৃক অভ্যুত্থান দমন করা।

কর্মরত ফ্রাঙ্কফুর্ট জাতীয় পরিষদকে আমরা আগেই দেখেছি। আমরা দেখেছি সেটা অস্ট্রিয়ার লাথি খেয়েছে, প্রাশিয়া সেটাকে অপমান করেছে, সেটাকে অমান্য করেছে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলি, সেটাকে বোকা বানিয়েছে সেটার নিজস্ব অক্ষম কেন্দ্রীয় 'সরকার', যেটাকে আবার বোকা বানিয়েছে দেশের

একেবারে প্রত্যেকটা রাজন্য। কিন্তু শেষে এই দুর্বল, দোলায়মান, নিস্তেজ বিধানিক সংস্থাটার মহা বিপদই ঘনিয়ে আসতে থাকল। বাধ্য হয়ে সেটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, 'জার্মান একত্বের মহিমান্বিত ধারণাটাকে বাস্তবে পরিণত করার সম্ভাবনা বিপন্ন', সেটার অর্থ ছিল একেবারে ঠিক ঠিক এই যে, ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ এবং সেটা যাকিছু করেছিল আর করতে যাচ্ছিল, সবই খুব সম্ভব ভেস্তে যাচ্ছিল। তাই সেটা চমৎকার বস্তু 'সাম্রাজ্যিক সংবিধান' পয়দা করতে লেগে গিয়েছিল স্থিরসংকল্প হয়ে।

কিন্তু একটা মুশকিল ছিল: নির্বাহী কর্তৃপক্ষটা হবে কী? নির্বাহী পরিষদ? না; নিজেদের পাণ্ডিত্য অনুসারে তারা ভেবেছিল সেটা হত জার্মানিকে প্রজাতন্ত্র করে ফেলা। 'রাষ্ট্রপতি'? সেটাও তো দাঁড়ায় ঐ একই। কাজেই তাদের জাগিয়ে তোলা চাই সাবেকী সাম্রাজ্যিক মর্যাদা। কিন্তু — যেহেতু সম্রাট তো হওয়া চাই একজন রাজন্য -- তিনি হবেন কে? রেইস্-গ্রেইট্স-শ্লেইট্স-লোবেনস্টেইন-এবের্সডর্ফ* থেকে ব্যাভেরিয়ার রাজা** অবধি dii minorum gentium***-এর কেউ নিশ্চয়ই নয়; অস্ট্রিয়া কিংবা প্রাশিয়া কেউই সেটা মানত না। হতে পারত শুধু অস্ট্রিয়া কিংবা প্রাশিয়া। কিন্তু এই দুইয়ের কোন্‌টা? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য দিক থেকে পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এই মহিমময় পরিষদ এই মস্ত উভয়সংকট সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে অদ্যাবধি আলোচনা চালাতে থাকত, যদি অস্ট্রীয় সরকার জটিলতার মীমাংসা করে দিয়ে তাদের মুশকিল আসান না করত।

অস্ট্রিয়া বেশ ভালভাবেই জানত, সমস্ত প্রদেশগুলিকে বশীভূত করে একটা শক্তিশালী এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে সে যে মুহূর্তে আবার ইউরোপের সামনে দেখা দেবে অমনি রাজনীতিক মহাকর্ষ নিয়মটাই বাদবাকি জার্মানিকে তার কক্ষে আকর্ষণ করে নেবে — ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের প্রদত্ত সাম্রাজ্যিক ক্রাউন যেকোন কর্তৃত্ব দিতে পারত সেটার সাহায্য ছাড়াই। অস্ট্রিয়া ছিল ঢের বেশি শক্তিশালী, অস্ট্রিয়ার গতিবিধি ছিল ঢের বেশি স্বচ্ছন্দ, যেহেতু

* ৭২তম হের্নরি। — সম্পাঃ

** ২য় ম্যাক্সিমিলিয়ান। — সম্পাঃ

*** আক্ষরিক অর্থে: অবর দেবতারা; আলংকারিক অর্থে: দ্বিতীয় মেকদারের লোক। — সম্পাঃ

সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল জার্মান সাম্রাজ্যের ক্ষমতাহীন ক্রাউন, যে ক্রাউন তার নিজস্ব স্বতন্ত্র কর্মনীতিটাকে ভারাক্রান্ত করত, অথচ জার্মানির ভিতরে কিংবা বাইরে তার শক্তি বাড়াত না একরত্তিও। আর ধরা যাক অবস্থা এমন দাঁড়াল যাতে ইতালিতে আর হাঙ্গেরিতে অবস্থান বজায় রাখতে পারল না অস্ট্রিয়া — তাহলে তো অস্ট্রিয়া ভেঙে পড়ে, ধ্বংস হয়ে যায় জার্মানিতেও, এবং নিজ শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকার অবস্থায় যে ক্রাউন হাত থেকে ফসকে গেল সেটাকে আবার হস্তগত করার দাবি করতে পারে না। তাই অস্ট্রিয়া তৎক্ষণাৎ যেকোন সাম্রাজ্যিক ক্ষমতা পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে সাদাসিধে দাবি করল ফেডারেটিভ ডায়েটের পুনঃস্থাপনা, যেটা ছিল জার্মানির একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার যেটা ১৮১৫ সালের সন্ধিচুক্তিতে বিদিত এবং স্বীকৃত। ১৮৪৯ সালে ৪ মার্চ জারি করল সেই সংবিধান যেটার একমাত্র অর্থ হল অস্ট্রিয়াকে একটা অবিভাজ্য, কেন্দ্রীকৃত এবং স্বতন্ত্র রাজতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা, ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ যে জার্মানি পুনঃসংগঠিত করত সেটা থেকেও যে রাজতন্ত্র পৃথক।

এই প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণার ফলে বাস্তবিকপক্ষে ফ্রাঙ্কফুর্টের পণ্ডিতমানীদের সামনে উপায় রইল শুধু অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বাদ দেওয়া এবং বাদবাকি জার্মানিকে নিয়ে একটা 'পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য' (৫৩), 'খুদে জার্মানি' গোছের কিছু সৃষ্টি করা, যেটার কিছুটা জীর্ণ সাম্রাজ্যিক সাজ বসবে প্রাশিয়ার হিজ ম্যাজেস্টির কাঁধে। স্মরণে থাকতে পারে, এটা হল ছয় কিংবা আট বছর আগে দক্ষিণ আর মধ্য জার্মানির একদল উদারপন্থী নীতিবাগীশদের পোষিত একটা পুরন পরিকল্পনার পুনর্নবীকরণ, তাদের পুরন খেয়ালটা দেশের মোক্ষের জন্যে 'নতুন উপস্থাপনা' হিসেবে আবার সামনে এসে গেল যে হীনতাজনক পরিস্থিতির কল্যাণে সেটাকে তারা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করল।

তদনুসারে পরিষদ ১৮৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসে সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং তার সঙ্গে একত্রে অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা আর সাম্রাজ্যিক নির্বাচনী আইন নিয়ে বিতর্ক শেষ করে, তাতে তারা অবশ্য কখনও রক্ষণপন্থী বা বরং প্রতিক্রিয়াশীল তরফকে এবং কখনও পরিষদের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশগুলিকে বহুতর বিষয়ে অতি পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন সুবিধে দিতে

বাধ্য হয়। পরিষদের নেতৃত্ব আগে ছিল দক্ষিণপন্থীদের এবং দক্ষিণ মধ্যপন্থীদের (রক্ষণপন্থী আর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের) হাতে, আর তখন প্রকৃতপক্ষে স্পষ্ট দেখা গেল, ধীরে হলেও ক্রমে নেতৃত্ব চলে যাচ্ছিল সংস্থাটির বাম বা গণতান্ত্রিক দিকে। এই পরিষদ অস্ট্রিয়াকে জার্মানি থেকে বাদ দিয়েছিল, কিন্তু অস্ট্রীয় ডেপুটিরা সেখানে থাকতে এবং ভোট দিতে পারত— তাদের কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থান পরিষদের ভারসাম্য বিগড়ে দেবার সহায়ক ছিল। এইভাবে, ফেব্রুয়ারি মাসের সেই শেষের দিকেই বাম মধ্যপন্থী আর বামেরা অস্ট্রীয় ভোটের সাহায্যে খুবই সাধারণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, আর অন্যান্য দিন অস্ট্রীয়দের রক্ষণপন্থী অংশ হঠাৎ এবং তামাসা করার জন্যেই দক্ষিনেদের সঙ্গে মিলে ভোট দিয়ে আবার পাল্লা ভারি করে দিয়েছিল অপর পক্ষে। এইসব হঠাৎ হঠাৎ লাফালাফি দিয়ে তারা পরিষদকে অবজ্ঞেয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল একেবারেই অনাবশ্যক: ফ্রাঙ্কফুর্টের চূড়ান্ত অন্তঃসারশূন্যতা এবং কিছু দেবার ব্যাপারে অকার্যকরতা সম্বন্ধে জনসাধারণ নিশ্চিত ছিল অনেক আগে থেকেই। ইতোমধ্যে, এইসব লাফালাফি আর পালটা-লাফালাফির অবস্থায় কেমনতর সংবিধান রচিত হয়েছিল সেটা সহজেই ধারণা করা যেতে পারে।

পরিষদের বাম অংশটা মনে করত তারা ছিল বৈপ্লবিক জার্মানির সেরা অংশ এবং গর্বের বস্তু; অস্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের প্ররোচনায় এবং সেটার স্বার্থে সক্রিয় একপ্রস্থ অস্ট্রীয় রাজনীতিকের শুভেচ্ছা, বরং বলা ভাল বিদ্বেষের সাহায্যে অল্প কয়েকটা তুচ্ছ সাফল্য লাভ করে একেবারেই প্রমত্ত ছিল এই বাম অংশটা। তাদের নিজেদের নীতিগুলো তেমন সুনির্দিষ্ট ছিল না, সেগুলোর একটুও কাছাকাছি কিছু হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় লঘুকৃত অবস্থায় যখনই ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের অনুমোদন গোছের কিছু লাভ করত অমনি এই গণতন্ত্রীরা উচ্চকণ্ঠে জাহির করত তারা দেশকে এবং জনগণকে রক্ষা করেছে। এইসব অকিঞ্চিৎকর, দুর্বলচিত্ত মানুষ তাদের সাধারণভাবে খুবই অখ্যাত জীবনে সাফল্য গোছের কিছুর ব্যাপারে এতই অনভ্যস্ত ছিল যে, তারা বাস্তবিকই বিশ্বাস করত দুই-তিন ভোটের সংখ্যাধিক্যে তাদের তুচ্ছ সংশোধনী প্রস্তাবগুলো পাস হলে ইউরোপের চেহারা বদলে যেত। বিধানিক কর্মজীবনের শুরু থেকেই তারা পরিষদের অন্য যেকোন উপদলের চেয়ে বেশি মাত্রায়

চিকিৎসার অসাধ্য সেই 'পার্লামেণ্টারি বামনত্ব' রোগে আচ্ছন্ন; এই ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভাগাদের মগজে এই গুরুগম্ভীর প্রত্যয় জন্মায় যে, যে বিশেষ প্রতিনিধি সংস্থাটা সেটার সদস্যদের মধ্যে তাদের পেয়ে ধন্য হয়েছে সেখানেই ভোটাধিক্যে নিয়মিত এবং নির্ধারিত হয় সমগ্র পৃথিবী, সেটার ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ। তারা বিশ্বাস করে যে, যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা — সেটা যা-ই হোক — কোন একমুহূর্তে তাদের সম্মানিত আইনসভার মনোযোগ জুড়ে থাকে সেটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সঙ্গে তুলনায় তাদের আইনসভার চার-দেয়ালের বাইরে যাকিছু ঘটে — যুদ্ধ, বিপ্লব, রেলপথ নির্মাণ, গোটা গোটা নতুন মহাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করা, কালিফোর্নিয়ায় সোনা আবিষ্কার, মধ্য আমেরিকায় খাল কাটা, রুশী সৈন্যবাহিনী এবং মানবজাতির নিয়তির উপর অন্তত কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন অন্য সবকিছু অকিঞ্চিৎকর। এইভাবেই পরিষদের গণতান্ত্রিক তরফ 'সাম্রাজ্যিক সংবিধানে'র মধ্যে তাদের দু'-চারটে সাধের দাওয়াই কোনমতে ঢুকিয়ে দিতে পেরে প্রথমে সেটাকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতায় পড়ে, যদিও প্রত্যেকটা সারবান বিষয়ে সেটা তাদের নিজস্ব প্রায়শ ঘোষিত নীতিগুলোর সরাসরি বিরোধী। আর শেষে, যখন সেই খচ্চর বস্তুটার প্রধান রচয়িতারা সেটাকে পরিত্যাগ ক'রে গণতান্ত্রিক তরফের দায়াদ করে তখন তারা সেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে এবং তখন যারা নিজ নিজ প্রজাতান্ত্রিক নীতি ঘোষণা করেছিল এমনকি তাদেরও প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আঁকড়ে থাকে এই রাজতান্ত্রিক সংবিধান।

তবে এটা বলতেই হবে যে, এতে অসংগতিগুলো ছিল শুধু আপাতপ্রতীয়মান। সাম্রাজ্যিক সংবিধানের অনির্দিষ্ট, স্ববিরোধী, অপরিণত প্রকৃতিটা হল এই গণতন্ত্রী ভদ্রলোকদের অপরিণত, তালগোল পাকান, পরস্পরবিরোধী রাজনীতিক ভাব-ধারণারই প্রতিমূর্তি। তাদের নিজেদের বিভিন্ন উক্তি এবং রচনা — যতখানি তারা লিখতে পারে — যদি সেটার যথেষ্ট প্রমাণ না হয় তাহলে সেই প্রমাণ দিচ্ছে তাদের কাজকর্ম, কেননা যারা বিচক্ষণ তাদের পক্ষে কারও সম্বন্ধে ধারণা স্থির করতে হলে তার বক্তব্য দিয়ে নয়, তার কাজকর্ম দিয়েই সেটা করা স্বাভাবিক; তিনি যেমনটা ভান করেন তা দিয়ে নয়, তিনি যা করেন এবং তিনি আসলে যা তাই দিয়ে; আর জার্মান গণতন্ত্রের এই বীর-নায়কদের কৃতিগুলি আপনাতেই যথেষ্ট সোচ্চার,

তা আমরা জানব একটু পরেই। তবে যাবতীয় পরিশিষ্ট আর আনুষঙ্গিক উপাদানগুলি সমেত সাম্রাজ্যিক সংবিধান পাস হয় চূড়ান্তভাবে, আর ২৮ মার্চ প্রাশিয়ার রাজা নির্বাচিত হন অস্ট্রিয়া বাদে জার্মানির সম্রাট, পক্ষে ২৯০ ভোট, বিরুদ্ধে ২৪৮ ভোট (যারা ভোটদানে বিরত ছিল) এবং শ'-দুই ভোট (যারা ছিল অনুপস্থিত)। ইতিহাসের পরিহাস ষোল-কলা পূর্ণ হল; ১৮৪৮ সালের ১৮ মার্চ (৫৪) বিপ্লবের তিন দিন পরে স্তম্ভিত বার্লিনের (রাজা তখন যে অবস্থায় সেটা অন্যত্র হলে মার্কিনী মেন্ রাজ্যের সুরাবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ত) রাস্তায় রাস্তায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্মের সাম্রাজ্যিক প্রহসন — ঠিক একবছর পরে সেই নাক্কারজনক প্রহসনটাকে মঞ্জুরি দিল সারা জার্মানির প্রতিনিধি পরিষদ ভেকধারী সংস্থাটা। এই হল জার্মান বিপ্লবের পরিণাম!

লণ্ডন, জুলাই, ১৮৫২

১৬

জাতীয় পরিষদ এবং বিভিন্ন সরকার

প্রাশিয়ার রাজাকে (অস্ট্রিয়া বাদে) জার্মানির সম্রাট নির্বাচিত করার পরে ফ্রাংকফুর্টের জাতীয় পরিষদ সম্রাটকে রাজমুকুট প্রদানের জন্যে একটা ডেপুটেশন বার্লিনে পাঠিয়ে তার অধিবেশন মুলতবি রাখল। ৩ এপ্রিল ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্ম অভ্যর্থনা করলেন ডেপুটিদের। তাদের তিনি বললেন, জন-প্রতিনিধিদের ভোট তাঁকে যা দিয়েছে, জার্মানির অন্যান্য সমস্ত রাজন্যের উপর তাঁর সেই অগ্রাধিকার গ্রহণ করেও, তাঁর আধিপত্য এবং তাঁকে ঐ অধিকার প্রদানের সাম্রাজ্যিক সংবিধান বাদবাকি রাজন্যরা মানছে বলে নিশ্চিত হবার আগে তিনি সম্রাটের মুকুট গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, জার্মানির সরকারগুলির বিবেচনা করা দরকার এই সংবিধান সেগুলির পক্ষে অনুসমর্থনীয় কিনা। শেষে তিনি বলেন, যা-ই হোক, তিনি সম্রাট হন, কি না-ই হন, বহিঃশত্রু কিংবা গৃহশত্রুর বিরুদ্ধে অসি নিষ্কাশিত

করতে তিনি প্রস্তুত থাকবেন সর্বদাই। কিভাবে তিনি জাতীয় পরিষদের পক্ষে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ধরনেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন সেটা আমরা দেখব অচিরেই।

প্রগাঢ় কূটনীতিক অনুসন্ধানাদি করে ফ্রাঙ্কফুর্টের পন্ডিতমানীরা শেষে স্থির করল এই উত্তরটা ক্রাউন প্রত্যাখ্যানেরই শামিল। তখন (১২ এপ্রিল) তারা সিদ্ধান্ত নিল: সাম্রাজ্যিক সংবিধান দেশের বিধান, সেটাকে বজায় রাখতেই হবে; এবং সামনে আদৌ কোন পথই দেখতে না পেয়ে এই সংবিধান বলবৎ করার উপায় সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যে তিরিশ-জনের একটা কমিশন নির্বাচিত করল।

এই সিদ্ধান্তটা হল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদ এবং জার্মান সরকারগুলোর মধ্যে সংঘাতের সংকেত, সেই সংঘাত তখন বেধে গেল।

বুর্জোয়ারা, বিশেষত পেটি বুর্জোয়ারা সহসা নতুন ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধানের সপক্ষে জোরাল মত প্রকাশ করল। 'বিপ্লবের অবসান ঘটাবার' মুহূর্তটার জন্যে তারা আর বিলম্ব করতে পারল না। অস্ট্রিয়ায় আর প্রাশিয়ায় তখনকার মতো বিপ্লবের অবসান ঘটান হয়েছিল সশস্ত্র শক্তির হস্তক্ষেপ দিয়ে; এই কাররবাইটা সমাধা করতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি অপেক্ষাকৃত কম জবরদস্তির উপায় বেশি পছন্দ করত, কিন্তু তারা সুযোগ পায় নি। ব্যাপারটা তো ঘটেই গেছে, সেটার যথোচিত সদ্ব্যবহার তাদের করা চাই, এই সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ নিয়ে সেটাকে তারা অতি বীরোচিত উপায়ে কার্যে পরিণত করল। ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে সবকিছু চলছিল অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে, সেখানে বুর্জোয়ারা পড়েছিল গিয়ে জমকাল কিন্তু নিষ্ফল কেননা ক্ষমতাহীন পার্লামেন্টারি আলোড়নের মাঝে, যেটা ছিল তাদের নিজেদের সবচেয়ে মুনাসিব। জার্মানির রাজ্যগুলিকে পৃথক পৃথক করে ধরে দেখলে প্রতীয়মান হত সেগুলি এমন একটা নতুন এবং চূড়ান্ত আকার পেয়েছিল যাতে করে নাকি সেগুলি তখন থেকে শান্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক বিকাশের পথ ধরতে পারে। অমীমাংসিত প্রশ্ন রইল শুধু একটা -- জার্মান কনফেডারেশনের নতুন রাজনীতিক সংগঠন সংক্রান্ত প্রশ্ন। এই একটামাত্র প্রশ্ন তখনও বিপদে ঠাসা বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল --- সেটার অবিলম্ব মীমাংসা আবশ্যক বিবেচিত হল। তাই বুর্জোয়ারা ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের উপর চাপ দিতে থাকল

সংবিধানটাকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করতে সেটাকে প্রবৃত্ত করাবার জন্যে; তাই অবিলম্বে থিতান অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে উচ্চ এবং নিম্ন বুর্জোয়ারা এটা যা-ই হোক এই সংবিধানটাকে গ্রহণ এবং সমর্থন করতে কৃতসংকল্প হল। এইভাবে, একেবারে শুরু থেকেই সাম্রাজ্যিক সংবিধানের সপক্ষে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি থেকে, আর অনেক আগে থেকেই বিপ্লব সম্বন্ধে ত্যক্তবিরক্ত শ্রেণীগুলোর মধ্যে পয়দা হয়েছিল এই আলোড়ন।

কিন্তু আরও একটা বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট ছিল এতে। ভবিষ্য জার্মান সংবিধানের প্রথম এবং বুনিয়াদী মূলনীতিগুলি ভোটে গৃহীত-অনুমোদিত হয়েছিল বিপ্লবের প্রথম মাসগুলিতে — ১৮৪৮ সালে বসন্তে এবং গ্রীষ্মে — তখনও জন-আলোড়ন ছিল বহুবিস্তৃত। তখন পাস করা প্রস্তাবগুলি তখন পুরোদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীল হলেও অস্ট্রীয় আর প্রুশীয় সরকারের স্বেচ্ছাচারী কার্যকরণগুলোর পরে সেগুলি খুবই উদারনীতিক, এমনকি গণতান্ত্রিক প্রতীয়মান হয়। তুলনার মানদন্ড বদলে গিয়েছিল। ফ্রাংকফুর্ট পরিষদ যদি একদা ভোটে পাস করান অনুবিধিগুলি কেটে বাদ দিয়ে অস্ট্রীয় আর প্রুশীয় সরকারের তলোয়ার-হাতে হুকুম-করা অনুবিধির ছাঁচে সাম্রাজ্যিক সংবিধানটাকে ঢেলে ফেলত সেটা হত পরিষদের নৈতিক আত্মহত্যারই শামিল। তাছাড়া, আমরা যা দেখেছি, ঐ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পক্ষবদল করেছিল; উদারপন্থী এবং গণতান্ত্রিক তরফের প্রভাব বাড়ছিল। এইভাবে সম্পূর্ণত আপাতপ্রতীয়মান গণতান্ত্রিক উদ্ভব দিয়ে সাম্রাজ্যিক সংবিধান বিশিষ্ট ছিল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গে, নানা অসংগতি দিয়ে ভরা থাকলেও, সেটা ছিল সারা জার্মানির সবচেয়ে গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু এটা ছিল নিছক এক-তা কাগজ, এটার অনুবিধিগুলিকে সমর্থন করার কোন ক্ষমতা ছিল না — এই ছিল সেটার বড় দোষ।

এই পরিস্থিতিতে তথাকথিত গণতান্ত্রিক তরফ, অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়াদের ব্যাপক অংশ সাম্রাজ্যিক সংবিধানটাকে জড়িয়ে ধরেছিল, এটা ছিল স্বাভাবিক। দাবিদাওয়ার দিক থেকে এই শ্রেণীটি সবসময়ে রাজতান্ত্রিক-নিয়মতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিল; এই শ্রেণী অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠতার ভাব প্রদর্শন করত, প্রায়ই সশস্ত্র প্রতিরোধের হুমকি দিত, মুক্তির

জন্যে সংগ্রামে রক্ত এবং অস্তিত্ব বলিদান করার দেদার প্রতিশ্রুতি দিত; কিন্তু ইতোমধ্যে এটা প্রচুর প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিল যে, বিপদের দিনে এটার পাত্তা পাওয়া যায় না, আর কোন চূড়ান্ত পরাজয়ের পরদিন যেমনটা তার চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত এটা বোধ করত না আর কখনও, ঐ পরাজয়ে সবকিছু খোয়া যাবার পরে এটা অন্তত এই জেনে সান্ত্বনা পেত যে, কোন-না-কোন ভাবে ব্যাপারটার ফয়সালা **হয়ে গেল**। কাজেই, যেখানে বড় বড় ব্যাঙ্কার, ম্যানুফ্যাকচারার এবং ব্যাপারীদের আনুগত্য ছিল অপেক্ষাকৃত চাপা ধরনের, ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবিধানের সপক্ষে প্রধানত সাদাসিধে প্রদর্শনের মতো, তাদের ঠিক নিচের শ্রেণীটি, আমাদের তেজী গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা এগিয়ে আসত জাঁকের তোড়ে, এবং যথারীতি ঘোষণা করত তারা বরং ঢেলে দেবে শেষ রক্তবিন্দু অবধি, তবু ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না সাম্রাজ্যিক সংবিধানটিকে।

নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকারের বুর্জোয়া এবং কমবেশি গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়ারা, এই দুই তরফের সমর্থনে সাম্রাজ্যিক সংবিধান অবিলম্বে প্রবর্তন করার আলোড়নের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে; কতকগুলি রাজ্যের পার্লামেণ্টে সেটার সবচেয়ে প্রবল অভিব্যক্তি হয়। প্রাশিয়া, হানোভার, স্যাক্সনি, বাডেন এবং ভ্যুর্টেমবের্গের চেম্বারগুলি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে। সরকারগুলি এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের মধ্যে সংগ্রাম আশঙ্কাজনক রূপ ধারণ করে।

তবে সরকারগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল দ্রুত। প্রুশীয় চেম্বারগুলিকে ভেঙে দেওয়া হল, সেটা হল অবৈধ কাজ, কেননা প্রুশীয় সংবিধান সংশোধন এবং অনুমোদন করার কাজটা ছিল তাদের; সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে উসকানো দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধল বার্লিনে; তার পরদিন ২৮ এপ্রিল প্রুশীয় মন্ত্রিসভার প্রচারিত সার্কুলারে সাম্রাজ্যিক সংবিধানকে অত্যন্ত অরাজকতাজনক এবং বৈপ্লবিক দলিল বলে অভিহিত করে বলা হল, সেটাকে নতুন ছাঁচে ঢালা এবং শোধন করাই সরকারগুলির কাজ। এইভাবে, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিজ্ঞজনেরা বরাবর যে সার্বভৌম বিধানিক ক্ষমতার বড়াই করেছেন কিন্তু কখনও প্রতিষ্ঠা করেন নি সেটা স্পষ্টাস্পষ্টি অগ্রাহ্য করল প্রাশিয়া। আগেই আইন হিসেবে সাধারণ্যে ঘোষিত সংবিধান সম্বন্ধে বিচার-মীমাংসা করতে বসল রাজন্য কংগ্রেস (৫৫) — পুরন ফেডারেটিভ ডায়েটের নতুন আকার। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া সৈন্যসমাবেশ করল ক্রয়েজনাখে, সেখান থেকে

ফ্রাঙ্কফুর্ট তিন দিন মার্চের পথ, আর ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিকে বলল, যেইমাত্র তাদের চেম্বার ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে অমনি যেন সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয় প্রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসারে। এই দৃষ্টান্ত ত্বরায় অনুসরণ করেছিল হানোভার আর সাক্সনি।

অস্ত্রবলে সংগ্রামের নিষ্পত্তি এড়ান যাবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সরকারগুলোর বিরুদ্ধতা, জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন প্রতিদিনই প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকল। গণতন্ত্রী নাগরিকেরা সর্বত্র সৈন্যদলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকল — তাতে বিপুল সাফল্য হল দক্ষিণ জার্মানিতে। সর্বত্র অনুষ্ঠিত হল বড় বড় গণসভা, সেগুলিতে গৃহীত প্রস্তাবে প্রয়োজন হলে অস্ত্রবলে সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত হল। কলোনে রাইনীয় প্রাশিয়ার সমস্ত পৌর পরিষদের ডেপুটিদের একটা সভা হল ঐ একই উদ্দেশ্যে। পেলাট্‌নেটে, বের্গে, নুরেম্‌বার্গে, ওডেনভাল্ডে কৃষকেরা বহুতর সংখ্যায় সমবেত হয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় মেতে উঠল। তার সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রান্সে সংবিধান-সভা ভেঙে দিয়ে প্রচন্ড আলোড়নের মাঝে চলছিল নতুন নির্বাচনের প্রস্তুতি, আর ওদিকে, জার্মানির পূর্ব সীমান্তে হাঙ্গেরীয়রা পর পর কয়েকটা দেদীপ্যমান বিজয়ের সাহায্যে একমাসের মধ্যে থেইস্‌ থেকে লেইথা অবধি অস্ট্রীয় আক্রমণ পিছনে গুটিয়ে দিয়েছিল, ঝটিকা আক্রমণে ভিয়েনা দখল প্রত্যাশিত ছিল যেকোন দিন। চতুর্দিকে জন-মানস উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়, আর সরকারগুলোর আক্রমণমুখী কর্মনীতি আরও স্পষ্ট-নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল প্রতিদিনই, তার ফলে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য; একমাত্র ভীরু অক্ষমতাই সেই অবস্থায় সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ধারণায় বশীভূত হতে পারত। কিন্তু এই ভীরু অক্ষমতা খুবই ব্যাপক ছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদে।

লন্ডন, জুলাই, ১৮৫২

১৭

অভ্যুত্থান

ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় পরিষদ এবং জার্মানির রাজ্য সরকারগুলির মধ্যকার অনিবার্য সংঘাত প্রকাশ্য যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত হয়েছিল ১৮৪৯

সালের মে মাসের প্রথম দিনগুলিতে। অস্ট্রীয় ডেপুটিদের ফিরে যেতে আদেশ করেছিল তাদের সরকার, — বাম বা গণতান্ত্রিক তরফের অল্প কয়েক জন ছাড়া তারা পরিষদ ছেড়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। অবস্থাটা যেভাবে মোড় ঘুরতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে অবহিত রক্ষণশীল ডেপুটিদের প্রধান অংশটা নিজ নিজ সরকার তা করতে আদেশ করার আগেই সরে গিয়েছিল। এইভাবে, যেসব কারণে বামের প্রভাব আরও শক্তিশালী হচ্ছিল বলে পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে দেখান হয়েছে সেগুলি থেকে স্বাধীনভাবে স্রেফ দক্ষিণে সদস্যরা ভঙ্গ দেবার ফলেই পরিষদের আগেকার ঊনজন পরিণত হয়েছিল অধিজনে। এই নতুন অধিজন আগে কখনও এই সৌভাগ্যের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি: প্রতিপক্ষ সারিতে আসন থেকে পুরন অধিজন এবং সাম্রাজ্যিক সরকারের দুর্বলতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং জড়তার বিরুদ্ধে বাক্যোদ্গার করার সুবিধে তাদের ছিল। তখন সহসা সেই পুরন অধিজনের স্থানপূরণ করার ডাক এল **তাদেরই** কাছে। তারা কী সম্পাদন করতে পারে সেটা তখন **তাদের** দেখাবার পালা। তাদের নিশ্চয়ই হওয়া চাই তেজ, স্থিরসংকল্প এবং তৎপরতার কর্মধারা। **তারা,** জার্মানির সেরা অংশ তখন অচিরেই সাম্রাজ্যের ভীমরতিগ্রস্ত রাজ-প্রতিনিধিকে এবং তার দোলায়মান মন্ত্রীদের ঠেলে এগিয়ে নিতে পারে, আর সেটা অসম্ভব হলে তারা — এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না! — জনগণের সার্বভৌম অধিকারবলে অক্ষম সরকারটাকে গদিচ্যুত করে সে জায়গায় বসাবে তেজীয়ান, অক্লান্ত সরকারকে, যে নিশ্চিত করবে জার্মানির মোক্ষ। হতভাগার দল! **তাদের** শাসন — যেটাকে কেউ মান্য করে না সেটাকে যদি বলা যায় শাসন — ছিল এমনকি তাদের পূর্বগামীদের শাসনের চেয়েও উপহাসাস্পদ।

নতুন অধিজন ঘোষণা করল, সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সাম্রাজ্যিক সংবিধান বলবৎ করতে হবে, আর সেটা **তখনই**; সামনের ১৫ জুলাই জনসাধারণ নতুন প্রতিনিধি-সভার জন্যে ডেপুটিদের নির্বাচিত করবে, তার পরের ২২ আগস্ট এই সভার অধিবেশন বসবে ফ্রাঙ্কফুর্টে। এটা হল যেসব সরকার সাম্রাজ্যিক সংবিধান মানে নি সেগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা, ঐসব সরকারের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তী ছিল প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়া, সেগুলিতে ছিল জার্মান জনসমষ্টির তিন-চতুর্থাংশের বেশি; এই যুদ্ধঘোষণা তারা গ্রহণ করেছিল

চটপট। প্রাশিয়া আর ব্যাভেরিয়া থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে পাঠান ডেপ্যুটিদেরও ডেকে ফিরিয়ে নিয়ে তারা জাতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি ত্বরিত করল। অন্য দিকে, সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং জাতীয় পরিষদের সপক্ষে গণতান্ত্রিক তরফের অভিমতপ্রদর্শনগুলো (পার্লামেন্টের বাইরে) আরও বেশি দুর্দান্ত এবং প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল, আর সবচেয়ে চরমপন্থী তরফের লোকেদের নেতৃত্বে মেহনতী জনগণের ব্যাপক অংশ অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল এই কর্মব্রতের জন্যে, সেটা তাদের নিজস্ব না হলেও তাতে জার্মানিকে পুরন রাজতান্ত্রিক বোঁড় থেকে মুক্ত করে তাদের লক্ষ্যের দিকে অন্তত কিছুটা এগোবার সুযোগ আসে। এইভাবে সর্বত্র জনসাধারণ এবং সরকার এই বিষয়ে খড়্গহস্ত হয়ে দাঁড়াল; বিস্ফোরণ অনিবার্য হয়ে উঠল; মাইন্ তখন পাতা হয়ে গেছে, সেটা ফেটে পড়ার জন্যে তখন শুধু একটা স্ফুলিঙ্গ আবশ্যক। সাক্সনিতে চেম্বার ভাঙা, প্রাশিয়ায় লান্ডভেয়ার (সামরিক রিজার্ভ) তলব, সাম্রাজ্যিক সংবিধানের বিরুদ্ধে সরকারের প্রকাশ্য প্রতিরোধ — এগুলো হল ঐসব স্ফুলিঙ্গ; সেইসব স্ফুলিঙ্গ ছুটল — অমনি সহসা জ্বলে উঠল দেশটা। ৪ মে ড্রেসডেনে বিজয়ী জনগণ শহরটিকে দখল করে খেদিয়ে দিল রাজাকে*, চারপাশের সমস্ত এলাকা থেকে সৈন্যসাহায্য গেল বিদ্রোহীদের কাছে। রাইনীয় প্রাশিয়ায় আর ওয়েস্টফালিয়াতে লান্ডভেয়ার মার্চ করতে নারাজ হল, অস্ত্রাগার দখল করে তারা অস্ত্রসজ্জিত হল সাম্রাজ্যিক সংবিধানের সমর্থনের জন্যে। পেলাট্‌নেটে জনগণ ব্যাভেরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করল, সরকারী অর্থাদি হস্তগত করল, স্থাপন করল একটা 'প্রতিরক্ষা কমিটি', এই কমিটি প্রদেশটিকে ন্যস্ত করল জাতীয় পরিষদের রক্ষণাধীনে। ভ্যুর্টেমবের্গে জনগণ রাজাকে** সাম্রাজ্যিক সংবিধান মানতে বাধ্য করল; বাডেনে জনগণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফৌজ গ্র্যান্ড ডিউককে*** পালিয়ে যেতে বাধ্য করল এবং দাঁড় করাল একটা অস্থায়ী সরকার। জার্মানির অন্যান্য জায়গায় জনসাধারণ অপেক্ষা করছিল — জাতীয় পরিষদের কাছ থেকে

* দ্বিতীয় ফ্রিডরিখ অগস্টাস। — সম্পাঃ

** প্রথম ভিলহেল্ম। — সম্পাঃ

*** লেওপল্‌দ। — সম্পাঃ

একটা স্থিরনিশ্চিত সংকেত পেলেই তারা অস্ত্রধারণ করে পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হত।

জাতীয় পরিষদের হীন কর্মজীবনের পরে যা আশা করা যেতে পারত তার চেয়ে ঢের বেশি অনুকূল হয়ে দাঁড়াল সেটার অবস্থান। জার্মানির পশ্চিমার্ধ পরিষদের সপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল; সর্বত্রই সৈন্যবাহিনী ছিল দোদুল্যমান; ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিতে তারা নিঃসন্দেহেই ছিল আন্দোলনের অনুকূল। হাঙ্গেরীয়দের বিজয়ী অগ্রগতির ফলে অস্ট্রিয়া ছিল প্রায় ভূমিশায়ী; জার্মান সরকারগুলোর রিজার্ভ শক্তি রাশিয়া সমস্ত ক্ষমতা খাটাচ্ছিল মাগিয়ার বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করার জন্যে। দমন করার দরকার ছিল শুধু প্রাশিয়াকে; সে দেশে যে বৈপ্লবিক সহানুভূতি ছিল তাতে সে লক্ষ্য হাসিল করার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে, পরিষদের আচরণের উপর নির্ভর করছিল সবকিছু।

যুদ্ধ কিংবা অন্য যেকোন কিছুর মতো অভ্যুত্থানও একটা আর্ট এবং কোন কোন কার্যবাহ-নিয়মাধীন, সেসব নিয়ম অবহেলিত হলে যে তরফ সেই অবহেলা করে সেটার সর্বনাশ ঘটে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তরফগুলি এবং পরিস্থিতির প্রকৃতি থেকে পাওয়া যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে এইসব নিয়ম এতই সাদাসিধে যে, ১৮৪৮ সালের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলো সম্বন্ধে জার্মানেরা বেশ ভালভাবেই অবহিত ছিল। প্রথমত, খেলাটার পরিণামের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত না হয়ে অভ্যুত্থান নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। অভ্যুত্থান একরকমের ক্যালকুলাস, তাতে থাকে বহু অনির্দিষ্ট মাত্রা, সেগুলোর মূল্য বদলে যেতে পারে প্রতিদিন। বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর রয়েছে সংগঠন, শৃংখলা আর অভ্যস্ত কর্তৃত্বের সুবিধা; সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রবল পালটা শক্তি দাঁড় না করালে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হবে, তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, অভ্যুত্থানের কার্যক্রম একবার ধরলে কাজ চালাতে হবে সর্বোচ্চ মাত্রায় স্থির-সংকল্প হয়ে এবং আক্রমণাত্মক উপায়ে। আত্মরক্ষামূলক অবস্থান হল যেকোন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু; শত্রুর সঙ্গে নিজের তুলনামূলক মূল্যায়নের আগেই সেটার হার হয়। প্রতিপক্ষীয়দের শক্তি ছড়িয়ে থাকতে-থাকতে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালান দরকার; নতুন নতুন সাফল্য লাভ করা দরকার, তা যতই ক্ষুদ্র হোক, কিন্তু দৈনন্দিন; বিদ্রোহীদের প্রথম সার্থক আক্রমণ

থেকে পাওয়া মনোবলের শ্রেষ্ঠত্বটাকে বজায় রাখতে হবে; দোদুল্যমান যারা সবসময়ে চলে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা অনুসারে, আর সবসময়ে খোঁজে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পক্ষটাকে, তাদের নিজেদের পক্ষে জড়ো করতে হবে; শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে শক্তি সমবেত করতে পারার আগেই তাকে হঠে যেতে বাধ্য করা দরকার; বৈপ্লবিক কর্মনীতি প্রসঙ্গে এযাবত জ্ঞাত মহত্তম বিশারদ দাঁতোঁর ভাষায়: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace!*

ফ্রাঙ্কফুর্টের জাতীয় পরিষদের যে নিশ্চিত সর্বনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা এড়াবার জন্যে সেটার করণীয় ছিল কী? সর্বপ্রথমে, পরিস্থিতিটার মর্ম স্পষ্ট বুঝে এই প্রত্যয় জন্মান দরকার ছিল যে, সরকারগুলোর কাছে নিঃশর্তে বশ্যতাস্বীকার করা কিংবা কোন দ্বিধা না রেখে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মব্রত গ্রহণ করা ছাড়া তখন গত্যন্তর ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইতোমধ্যে যেগুলো শুরু হয়েছিল সেই সমস্ত অভ্যুত্থানকে প্রকাশ্যে স্বীকার করা, এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যারা সার্বভৌম জনগণের বিরোধিতা করতে সাহস করে এমন সমস্ত রাজন্য, মন্ত্রী এবং অন্যান্যকে আইনবহির্ভূত করে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের সমর্থনে অস্ত্রধারণের জন্যে সর্বত্র জনগণের উদ্দেশে আহ্বান জানান দরকার ছিল। তৃতীয়ত, জার্মান সাম্রাজ্যিক রাজ-প্রতিনিধিকে তৎক্ষণাৎ গদিচ্যুত করা, শক্তিশালী, সক্রিয় যেকোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত নির্বাহী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা, ফ্রাঙ্কফুর্টকে অবিলম্বে রক্ষা করার জন্যে বিদ্রোহী সৈনিকদের আহ্বান করা, এইভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থানের প্রসারের আইনগত উপলক্ষ যুগিয়ে দেওয়া, হাতে যা ছিল সেই সমস্ত শক্তিকে একটা ঘনবিন্যস্ত সংস্থায় সংগঠিত করা এবং, সংক্ষেপে, নিজ অবস্থান মজবুত করা এবং বিরোধীদের অবস্থান দুর্বল করার জন্যে যা পাওয়া যায় এমন সমস্ত উপায়ে দ্রুত এবং নিঃসংকোচে লাভবান হওয়া দরকার ছিল।

এই সমস্ত ব্যাপারে ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের নিষ্পাপ গণতন্ত্রীরা কাজ করেছিল ঠিক উলটোটা। সবকিছুকে আপন-আপন মর্জিমাফিক আকার লাভ করতে দিয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে এই গুণধরেরা তাদের বিরোধিতা মারফত

---

* সাহসিকতা, সাহসিকতা এবং আরেকবার সাহসিকতা। — সম্পাঃ

যেগুলির প্রস্তুতি চলছিল সেই সমস্ত অভ্যুত্থানমূলক আন্দোলনকে দমন পর্যন্ত করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নুরেম্‌বার্গে এমনটা করেছিলেন মিঃ কার্ল ফগ্‌ট। প্রুশীয় সরকারের নির্মম হিংস্রতার বিরুদ্ধে মৃত্যু-পরবর্তী ভাবালু প্রতিবাদ করা ছাড়া অন্য কোন সাহায্য না করে তারা স্যাক্সনির, রাইনীয় প্রাশিয়ার, ওয়েস্টফালিয়ার অভ্যুত্থানকে দমিত হতে দিয়েছিল। দক্ষিণ জার্মান অভ্যুত্থানের সঙ্গে তারা একটা গোপন সংসর্গ বজায় রেখেছিল, কিন্তু প্রকাশ্য স্বীকৃতির সমর্থন কখনও দেয় নি। সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন সরকারগুলোর পক্ষে, তারা জানত, অথচ সরকারগুলোর চক্রান্তের বিরোধিতা করার জন্যে তারা আবেদন জানিয়েছিল তাঁর কাছে, যিনি কখনও নড়েন নি। সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরা, পুরন রক্ষণপন্থীরা প্রত্যেকটা অধিবেশনে এই অক্ষম পরিষদকে উপহাস করত, তা তারা বরদাস্ত করেছিল। সাইলেসিয়ার একজন ডেপুটি এবং 'Neue Rheinische Zeitung'-এর অন্যতম সম্পাদক ভিলহেল্‌ম ভল্‌ফ তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধিকে* আইনবহির্ভূত করে দিতে — এই ডেপুটি ঠিকই বলেছিলেন, ঐ রাজ-প্রতিনিধি ছিল সাম্রাজ্যের পয়লা নম্বরের এবং সবচেয়ে মস্ত বেইমান মাত্র — তখন ঐসব গণতান্ত্রিক বিপ্লবওয়ালারা সবাই মিলে সুনীতিসম্পন্ন ক্রোধ প্রকাশ করে অবজ্ঞাধ্বনি তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল! সংক্ষেপে, তারা কথা বলে, প্রতিবাদ ঘোষণা উক্তি করেই চলেছিল, কিন্তু কিছু করার সাহস কিংবা বোধশক্তি তাদের ছিল না কখনও — যখন সরকারগুলোর প্রতি বৈরভাবাপন্ন সৈনিকেরা ক্রমাগত আরও কাছিয়ে আসছিল, আর তাদের নিজেদের নির্বাহক — সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি তাদের দ্রুত বিনাশের জন্যে রাজন্যদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। এইভাবে, এই ঘৃণ্য পরিষদ বিচারবুদ্ধির শেষ চিহ্ন পর্যন্ত খুইয়ে বসেছিল; পরিষদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিদ্রোহীরা তারা সেটাকে আর গণ্য করত না, আর শেষে যখন ঘটল কলঙ্কজনক সমাপ্তি তখন, যা আমরা দেখতে পাব, সেটার অ-সম্মানিত মৃত্যুতে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি।

লণ্ডন, আগস্ট, ১৮৫২

---

* ইয়োহান। — সম্পাঃ

১৮

পেটি বুর্জোয়ারা

গত কিস্তিটিতে আমরা দেখিয়েছি, একদিকে জার্মান সরকারগুলি এবং অন্য দিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচণ্ডতা শেষে এমন মাত্রায় চড়েছিল যাতে মে মাসের প্রথম দিনগুলিতে অভ্যুত্থান ফেটে পড়েছিল জার্মানির একটা মস্ত অংশে: প্রথমে ড্রেসডেনে, তারপরে ব্যাভেরীয় পেলাটিনেটে, রাইনীয় প্রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায়, শেষে বাডেনে।

সমস্ত ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীদের **আসল লাড়িয়ে** অংশটা, সেটা প্রথম অস্ত্রধারণ ক'রে সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেটা ছিল **শহরের শ্রমিকদের** নিয়ে। সংঘর্ষ যথার্থই বেধে যাবার পরে তাদের সঙ্গে সাধারণভাবে শামিল হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে গরিব মানুষদের একাংশ, খেতমজুর আর খুদে খামারীরা। পুঁজিপতি শ্রেণীর নিচকার সমস্ত শ্রেণীর নওজোয়ানদের অধিকাংশকে অন্তত কিছুকালের জন্যে বিদ্রোহী বাহিনীগুলির কাতারে দেখা যেত, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা গুরুতর আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের এই পাঁচমিশালী জটলাটা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের যারা 'বোধশক্তির প্রতিনিধি' বলতে ভালবাসত সেই ছাত্ররা বিশেষত ঝাণ্ডা ছেড়ে গিয়েছিল সবার আগে, যদি না তাদের রেখে দেওয়া হয়েছিল অফিসারের পদ দিয়ে, সেজন্যে অবশ্য তাদের যোগ্যতা ছিল বিরল ক্ষেত্রেই।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতিক প্রাধান্য এবং সমাজ-বিপ্লবের দিকে অগ্রগতির পথ থেকে কোন প্রতিবন্ধ অপসারণের পূর্বলক্ষণ যাতে থাকে, কিংবা সমাজের অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালী কিন্তু কম সাহসী শ্রেণীগুলি তদবধি যে ধারায় চলেছে তার চেয়ে স্পষ্ট-নিশ্চিত এবং বৈপ্লবিক ধারায় সেগুলি যাতে অন্তত সংলগ্ন হয়, এমন অন্য কোন অভ্যুত্থানে যেমনটা করত সেইভাবেই শ্রমিক শ্রেণী এই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। ব্যাপারটার সরাসর তাৎপর্যের দিক থেকে এটা শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দ্বন্দ্ব ছিল না, এটা পুরোপুরি জেনে-বুঝেই এই শ্রেণীটি অস্ত্রধারণ করেছিল, কিন্তু আঁকড়ে ধরে ছিল নিজস্ব একমাত্র সাচ্চা কর্মনীতি: শ্রমিক শ্রেণীর নিজ স্বার্থের জন্যে সংগ্রামের অন্তত ন্যায্য ক্ষেত্রটা

খুলে না দিলে যেকোন শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে চেপে বসে (১৮৪৮ সালে বুর্জোয়া শ্রেণী যা করেছিল) সেটার শ্রেণীগত আধিপত্য মজবুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না; তাছাড়া, যা-ই ঘটুক, অবস্থাটাকে এমন একটা সন্ধিক্ষণে আনা, যাতে হয় জাতি বৈপ্লবিক গতিপথে স্থাপিত হবে স্পষ্ট এবং দুর্নিবার ভাবে, নইলে বিপ্লবের আগেকার স্থিতাবস্থা যতখানি সম্ভব পুনঃস্থাপিত হবে, যাতে নতুন বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণী তুলে ধরেছিল সমগ্র জাতির সত্যিকারের এবং ভালভাবে উপলব্ধ স্বার্থটাকে, বিপ্লবের ধারাটাকে শ্রমিক শ্রেণীর যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করা দরকার ছিল; তখন বিপ্লব সভ্য ইউরোপের সাবেক সমাজগুলির পক্ষে ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল, তাই তেমন যেকোন সমাজ নিজের শক্তির অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব আর নিয়মিত বিকাশ সম্বন্ধে ভাবতে পারত না সেই বিপ্লব ছাড়া।

গ্রামাঞ্চলের যারা অভ্যুত্থানে শামিল হয়েছিল তারা বৈপ্লবিক তরফের বাহুবন্ধনে এসে পড়েছিল, প্রধানত অপেক্ষাকৃত বিপুল করভার এবং অংশত সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্বের চাপে। নিজেদের কোন উদ্যম ছাড়াই তারা ছিল অভ্যুত্থানরত অন্যান্য শ্রেণীর লেজুড়, তারা দোলায়মান ছিল একদিকে শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্য দিকে খুদে ব্যাপারী শ্রেণীর মাঝে। প্রায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কোন্ দিকে তারা ঘুরবে সেটা নির্ধারিত হয়েছিল তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সামাজিক অবস্থান অনুসারে। খেতমজুর সাধারণভাবে সমর্থন করেছিল শহরের শ্রমিকদের, আর পেটি বুর্জোয়াদের হাতধরাধরি করে চলার প্রবণতা ছিল খুদে খামারীদের।

এই খুদে ব্যাপারী শ্রেণীর মস্ত গুরুত্ব এবং প্রভাবের কথা আমরা ইতোমধ্যে কয়েক বার উল্লেখ করেছি — এই শ্রেণীটাকে ১৮৪৯ সালের মে মাসের অভ্যুত্থানের পরিচালক শ্রেণী হিসেবে ধরা যেতে পারে। জার্মানির বড় বড় শহরের কোনটা এবার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল না বলে মাঝারি আর ছোট শহরগুলিতে সবসময়ে প্রাধান্যশালী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী আন্দোলনের অভিমুখটাকে নিজ হাতে নেবার উপায় বের করেছিল। অধিকন্তু, আমরা দেখেছি, সাম্রাজ্যিক সংবিধান এবং জার্মান পার্লামেন্টের অধিকারের জন্যে সংগ্রামে এই বিশেষ শ্রেণীটির স্বার্থ বিপন্ন ছিল। সমস্ত বিদ্রোহী

অঞ্চলে গঠিত অস্থায়ী সরকারগুলির অধিকাংশ ছিল জনসাধারণের এই অংশটার প্রতিনিধি, কাজেই সেগুলো যতদূর এগিয়েছিল সেটা দিয়ে মোটামুটি পরিমাপ করা যেতে পারে জার্মান পেটি বুর্জোয়াদের দৌড়টা কতখানি। আমরা দেখতে পাব, পেটি বুর্জোয়ার হাতে ন্যস্ত যেকোন আন্দোলনের সর্বনাশ করার ক্ষমতা ছাড়া তাদের কিছুই নেই।

পেটি বুর্জোয়ারা বড়াই করতে দড়, কাজে অত্যন্ত অক্ষম, আর কোন ঝুঁকি নিতে বড়ই কুণ্ঠিত। এই শ্রেণীর ব্যাপার-ব্যবসায় এবং ধারের কারবারের তুচ্ছ প্রকৃতি এটার চরিত্রে উৎসাহ আর কর্মতৎপরতার ঊনতার ছাপ লাগিয়ে দিতে খুবই উপযোগী; তাই তাদের রাজনীতিক কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য তদনুযায়ী। তদনুসারে, পেটি বুর্জোয়ারা কী করতে যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে লম্বাই-চওড়াই মেরে এবং দেদার বড়াই ক'রে অভ্যুত্থানে উৎসাহ যুগিয়েছিল; তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্ষমতা হস্তগত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল; অন্য কিছু নয়, অভ্যুত্থানের ক্রিয়াফলগুলিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তারা ব্যবহার করেছিল সেই ক্ষমতা। যেখানেই সশস্ত্র সংঘাতের ফলে দেখা দিয়েছিল গুরুতর সংকটাবস্থা সেখানে পেটি বুর্জোয়াদের পক্ষে গড়ে-ওঠা বিপজ্জনক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল — অস্ত্রধারণ করার জন্যে তাদের সদম্ভ আহ্বান যারা গ্রহণ করেছিল ঐকান্তিকভাবে তাদের প্রসঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত; এইভাবে তাদের নিজেদের হাতে মুঠোয় ঢুকিয়ে-দেওয়া ক্ষমতা সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত; আতঙ্কগ্রস্ত, সর্বোপরি, যে কর্মনীতিতে ব্যাপৃত হতে বাধ্য হয়েছিল, নিজেদের ক্ষেত্রে, তাদের সামাজিক অবস্থানের বেলায়, তাদের ধনদৌলতের ক্ষেত্রে সেটার পরিণতি সম্বন্ধে। তারা যেমনটা বলত তাতে অভ্যুত্থানের কর্মব্রতের জন্যে 'জীবন আর সম্পত্তির' ঝুঁকি তারা নেবে বলেই তো প্রত্যাশিত ছিল? তারা বাধ্য হয়ে অভ্যুত্থানে বিভিন্ন সরকারী পদ নিয়েছিল তো — যেখানে পরাজয় ঘটলে তাদের পুঁজি খোয়া যাবার ঝুঁকি ছিল? আর জয় হলে তারা তৎক্ষণাৎ গদিচ্যুত হবে, তাদের লড়িয়ে বাহিনীর প্রধান অংশটা যাদের নিয়ে গঠিত সেই বিজয়ী প্রলেতারিয়ানরা তাদের সমগ্র কর্মনীতি বানচাল করে দেবে — এটা নিশ্চিত ছিল না কি? এইভাবে চারদিক থেকে নানা বিরুদ্ধ বিপদের বেষ্টনীর মধ্যে প'ড়ে পেটি বুর্জোয়ারা তাদের ক্ষমতাটাকে শুধু

একটা কাজেই লাগাতে জানত, সেটা হল সবকিছুকে আপতিকতার উপর ছেড়ে দেওয়া, তাতে করে অবশ্য সাফল্যের যা সামান্য সম্ভাবনা হয়ত ছিল তাও নষ্ট হয়, এবং অভ্যুত্থানের সমূহ সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে যায়। পেটি বুর্জোয়ার কর্মনীতি, বরং বলা ভাল কর্মনীতির অভাব ছিল সর্বত্র একই, কাজেই ১৮৪৯ সালের মে মাসের অভ্যুত্থানগুলো জার্মানির সর্বত্র একই ছাঁচে ঢালা।

ড্রেসডেন শহরের রাস্তায়-রাস্তায় সংগ্রাম চালু ছিল চারদিন ধরে। ড্রেসডেনের পেটি বুর্জোয়ারা, 'বারোয়ারি রক্ষিদল' লড়ে নি তো বটেই, অধিকন্তু বহু ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের কার্যকলাপে আনুকূল্য করেছিল। এই বিদ্রোহীরাও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ছিল চতুষ্পার্শ্বস্থ ম্যানুফ্যাকচারিং এলাকাগুলির মেহনতীজনদের নিয়ে। তারা পেয়েছিল **একজন সুযোগ্য এবং স্থিরমস্তিষ্ক সেনাপতি — রুশী শরণার্থী মিখাইল বাকুনিন**, তিনি পরে বন্দী হয়েছিলেন, এখন তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে হাঙ্গেরিতে মুনকাচ্* অন্ধকূপে। সংখ্যাবহু প্রুশীয় সৈনিকদের হস্তক্ষেপে দমন হয়েছিল এই অভ্যুত্থান।

রাইনীয় প্রাশিয়ায় যথার্থ লড়াইয়ের গুরুত্ব ছিল সামান্যই। বড় শহরগুলো ছিল সুরক্ষিত নগরদুর্গ, তাই বিদ্রোহীরা শুধু কিছু হানা-দাঙ্গাই করতে পেরেছিল। যখনই যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য জড় করা হয়েছিল অমনি সশস্ত্র বিরোধিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

পেলাটিনেটে এবং বাডেনে হল উলটোটা — একটি সমৃদ্ধ, ফলপ্রসূ প্রদেশ, এবং একটা গোটা রাজ্য পড়েছিল বিদ্রোহীদের হাতে। অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, সৈনিক, সামরিক সরবরাহ ভাণ্ডার, সবকিছু পাওয়া গিয়েছিল ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত অবস্থায়। নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকেরাই শামিল হয়েছিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে, শুধু তাই নয়, বাডেনে তারা ছিল সর্বাগ্রবর্তী বিদ্রোহীদের মধ্যে। স্যাক্সনি আর রাইনীয় প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান আত্মবলিদান করেছিল এই দক্ষিণ-জার্মান আন্দোলন সংগঠনের সময় পাবার জন্যে। একটা প্রাদেশিক এবং আংশিক অভ্যুত্থানের পক্ষে এমন অনুকূল অবস্থা হয় নি কখনও। প্যারিসে

---

* ইউক্রেনীয় ভাষায়: মুকাচেভো। — সম্পাঃ

বিপ্লব প্রত্যাশিত ছিল; হাঙ্গেরীয়রা তখন ভিয়েনার দ্বারদেশে; জার্মানির সমস্ত মধ্য রাজ্যে জনগণই শুধু নয়, এমনকি সৈনিকেরাও ছিল অভ্যুত্থানের প্রবল পক্ষপাতী, তারা প্রকাশ্যে অভ্যুত্থানের শামিল হবার জন্যে শুধু একটা সুযোগ চাইছিল। তবু আন্দোলনটা যেই গেল পেটি বুর্জোয়াদের হাতে অমনি সেটার সর্বনাশ হল একেবারে শুরুতেই। পেটি-বুর্জোয়া শাসকেরা, বিশেষত বাডেনের পেটি-বুর্জোয়া শাসকেরা — তাদের নেতৃত্বে ব্রেণ্টানো — কখনও ভোলে নি যে, 'আইনসম্মত' সার্বভৌম শাসক গ্র্যান্ড ডিউকের পদ আর বিশেষাধিকার জবরদখল করে তারা রাষ্ট্রদ্রোহ করছিল। মন্ত্রীর গদিগুলোতে তারা বসেছিল অন্তরে অপরাধবোধ নিয়ে। কী আশা করা যেতে পারে এমনসব কাপুরুষের কাছে? অভ্যুত্থানটাকে তারা ফেলে দিয়েছিল অকেন্দ্রীকৃত কাজেই অকার্যকর স্বতঃস্ফূর্ততার মাঝে; আন্দোলনটাকে ভোঁতা করে দেবার জন্যে, আন্দোলনকে লোকবলবর্জিত, বিনষ্ট করার জন্যে তারা যথার্থই করেছিল সাধ্যায়ত্ত সবকিছু। এবং তারা কৃতকার্য হয়েছিল, এই সাফল্যে সহায় ছিল রাজনীতিকদের সেই প্রগাঢ় বর্গটার, পেটি বুর্জোয়াদের 'গণতন্ত্রী' বীর নায়কদের সোৎসাহ ঐকান্তিক সমর্থন, এরা সত্যিই মনে করত 'দেশকে ত্রাণ করছে', যখন তারা নিজেদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে দিয়েছিল আরও চতুর বর্গের মুষ্টিমেয় লোককে, তাদের একজন ব্রেণ্টানো।

ব্যাপারটার লড়াইয়ের দিকটা: নিয়মিত ফৌজের একজন প্রাক্তন লেফটেন্যাণ্ট বাডেনের প্রধান সেনাপতি জিগেলের অধীনে যেমনটা হয়েছিল তার চেয়ে এলোমেলো, তার চেয়ে নিস্তেজ সামরিক কার্যকলাপ আর কখনও হয় নি। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছিল, খোয়ান হয়েছিল প্রত্যেকটা সুবর্ণসুযোগ, প্রত্যেকটা অমূল্য মুহূর্ত হেলাফেলায় নষ্ট করা হয়েছিল ভীমকায় কিন্তু অসাধনীয় বিভিন্ন প্রকল্প রচনায়, শেষে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রতিভাশালী পোল্ মেরোস্লাভ্স্কি, তখন ফৌজ বিশৃঙ্খল, মার-খাওয়া, নিরুৎসাহ, সেটার জন্যে যোগান অপকৃষ্ট, সেটার বিরুদ্ধে চারগুণ সংখ্যাবহুল শত্রু। তার ফলে তিনি করতে পেরেছিলেন শুধু এই: ভাগহাইজেলে একটা অকৃতকার্য হলেও গৌরবময় লড়াই, চতুর পশ্চাদপসরণ, রাশতাদ-এর প্রাকার-প্রান্তে শেষ ব্যর্থ লড়াই; তারপরে তিনি পদত্যাগ করেন। প্রত্যেকটা অভ্যুত্থান-যুদ্ধে যা হয় — বাহিনীগুলি ছিল ভালভাবে তালিম-পাওয়া

সৈনিক এবং কাঁচা রংরুটদের মিশ্র, তাতে বীরত্বের পরিচয় ছিল প্রচুর, আর বৈপ্লবিক বাহিনীতে অসৈনিকোচিত, অনেক সময়ে কল্পনাতীত আতঙ্কও ছিল বিস্তর। ত্রুটিবিশিষ্ট না হয়ে পারত না, তবু সেটার আত্মপ্রসাদের কারণ ছিল এই যে, সেটাকে পরাস্ত-পর্যুদস্ত করতে চারগুণ সংখ্যাবহুতাও বিপক্ষের কাছে যথেষ্ট বিবেচিত হয় নি, কুড়ি হাজার বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অভিযানে এক লক্ষ নিয়মিত সৈন্য লাগিয়ে তাদের প্রতি সামরিক দিক দিয়ে এমন সম্মান প্রদর্শন করা হল যেন লড়াইটা ছিল নেপোলিয়নের ওল্ড গার্ডের বিরুদ্ধে।

অভ্যুত্থান ফেটে পড়েছিল মে মাসে; ১৮৪৯ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাত সেটা দমিত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে — প্রথম জার্মান বিপ্লবের অবসান ঘটল।

১৯

অভ্যুত্থানের অবসান

প্রকাশ্য অভ্যুত্থান ঘটেছিল দক্ষিণ আর পশ্চিম জার্মানিতে; ড্রেসডেনে যুদ্ধবিগ্রহ প্রথম শুরু হওয়া থেকে রাশতাদ-এ আত্মসমর্পণ অবধি প্রথম জার্মান বিপ্লবের চূড়ান্ত অগ্নিচ্ছটা নির্বাপিত করতে সরকারগুলোর লেগেছিল দশ সপ্তাহের একটু বেশি; আর জাতীয় পরিষদ রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল, সেটার প্রস্থানের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি।

এই জাঁকাল সংস্থাটিকে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম ফ্রাঙ্কফুর্টে; সেটার মর্যাদার উপর সরকারগুলোর উদ্ধত আক্রমণ, সেটার নিজেরই সৃষ্টি-করা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা এবং বিশ্বাসঘাতক অনীহা, সেটার সমর্থনে খুদে ব্যাপারী শ্রেণী এবং অপেক্ষাকৃত বৈপ্লবিক আখেরী লক্ষ্যের জন্যে শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান এই সবকিছুর দরুন সংস্থাটা তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিষাদ আর হতাশা তখন চরম মাত্রায়; ঘটনাবলি সহসা এমন নির্দিষ্ট এবং চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল যাতে এই বিদ্বান বিধানকর্তাদের আসল ক্ষমতা আর প্রভাব সম্বন্ধে তাদের মোহ একেবারেই

টুটে গিয়েছিল অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যেই। সরকারগুলোর দেওয়া সংকেত অনুসারে রক্ষণপন্থীরা এই পরিষদ থেকে সরে গিয়েছিল আগেই, এই যে সংস্থাটা বিধিসম্মতভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করে ছাড়া অতঃপর টিকতে পারত না। উদারপন্থীরা চূড়ান্ত গোলমেলে অবস্থা মনে করে সবকিছু খুইয়ে বসেছিল; ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। মান্য-গণ্য ভদ্রলোকেরা পিট্‌টান দিয়েছিল শ'য়ে-শ'য়ে। সদস্যসংখ্যা ৮০০ কিংবা ৯০০ থেকে দ্রুত এতই কমে গিয়েছিল যাতে তখন ১৫০ এবং কয়েক দিন পরে ১০০ জন হাজির হলেই কোরাম বলা হত। পরিষদে গোটা গণতান্ত্রিক তরফ বজায় থাকা সত্ত্বেও এমনকি অত জনকে জড় করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল।

পার্লামেন্টের অবশেষের কোন্ পথে চলা উচিত সেটা ছিল বেশ স্পষ্টই। প্রকাশ্যে এবং স্থিরনিশ্চিত হয়ে অভ্যুত্থানের পক্ষে পার্লামেন্টের দাঁড়ান উচিত ছিল, এইভাবে সেটাকে বৈধতা যতখানি শক্তি যোগাতে পারত সেটা দেওয়া, এবং সঙ্গেসঙ্গেই নিজেদের প্রতিরোধব্যবস্থার জন্যে পার্লামেণ্ট এমনিভাবে তৎক্ষণাৎ একটা ফৌজ লাভ করতে পারত। সমস্ত লড়াই বন্ধ করার জন্যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে তাদের তলব দিতে হত; যা বোঝাই যাচ্ছিল, যদি এই ক্ষমতা তা করতে পারতও না, চাইতও না, সেক্ষেত্রে সেটাকে তৎক্ষণাৎ গদিচ্যুত করে সেই জায়গায় আরও বেশি কর্মোদ্যোগী সরকার বসান উচিত ছিল। বিদ্রোহী সৈনিকদের ফ্রাংকফুর্টে আনা না গেলে (গোড়ায়, যখন জার্মান রাজ্য সরকারগুলো সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল সামান্যই, তখনও দ্বিধা করছিল, তখন সেটা করা যেতে পারত সহজেই) পরিষদ তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারত বিদ্রোহী এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে। মে মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষে স্থিরনিশ্চিত হয়ে এই সবকিছু অবিলম্বে করা হলে অভ্যুত্থান আর জাতীয় পরিষদের বিজয়ের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত।

কিন্তু জার্মান দোকানদারিতন্ত্রের কাছে এমন স্থিরসংকল্প কর্মধারা আশা করা যায় নি। এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রীয় কর্মী মোহমুক্ত হয় নি আদৌ। যেসব সদস্য পার্লামেন্টের শক্তি আর অলঙ্ঘনীয়তায় মারাত্মক বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল — তারা আগেই চম্পট দিয়েছিল; গণতন্ত্রীরা যারা থেকে গিয়েছিল তাদের বার মাস ধরে পোষণ-করা ক্ষমতা আর মহত্ত্বের স্বপ্ন ছাড়তে রাজী করানো সহজ ছিল না। তদবধি অনুসৃত কর্মধারায়

অবিচলিত থেকে তারা নিষ্পত্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে পিছিয়েই থেকেছিল — শেষে পার হয়ে গিয়েছিল সাফল্যের সমস্ত সুযোগ, অধিকন্তু পার হয়ে গিয়েছিল অন্তত যুদ্ধের কৃতিত্ব পেয়ে ডোবার যাবতীয় সুযোগ। কাজেই, যেটার পুরোদস্তুর অক্ষমতা এবং তার সঙ্গে চড়া দুরহঙ্কার করুণা আর বিদ্রূপ না জাগিয়ে পারে না তেমনি একটা কৃত্রিম, ব্যস্তবাগীশ গোছের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টায় তারা প্রস্তাবাদি, অভিভাষণ এবং অনুরোধ পাঠাতেই থাকল সাম্রাজ্যিক রাজ-প্রতিনিধির কাছে, যিনি সেগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি, আর মন্ত্রীদের কাছে, যাদের প্রকাশ্য যোগসাজশ ছিল শত্রুর সঙ্গে। স্ট্রিগাউ* থেকে ডেপুটি, 'Neue Rheinische Zeitung'-এর অন্যতম সম্পাদক এবং গোটা পরিষদে একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবী **ভিলহেল্ম ভল্ফ** শেষে তাদের বললেন, তারা যা বলে তাই যদি তাদের অভিপ্রায় হয় তাহলে তারা বরং কথা বলা বন্ধ ক'রে মুখ্য দেশদ্রোহী সাম্রাজ্যিক রাজ-প্রতিনিধিকে অবিলম্বে আইনের বার বলে ঘোষণা করুক; তখন এই পার্লামেণ্টওয়ালা ভদ্রলোকদের সমগ্র চাপা সুনীতিসম্পন্ন বিক্ষোভ এমন সতেজে ফেটে পড়েছিল যেমনটা তারা কখনও দেখায় নি যখন সাম্রাজ্যিক সরকার গাদা গাদা অপমান চাপিয়ে দিয়েছিল তাদের উপর। তার কারণ অবশ্য এই যে, সেণ্ট পল গির্জার (৫৬) চার-দেয়ালের ভিতরে উচ্চারিত প্রথম যুক্তিযুক্ত কথা হল **ভল্ফের** উপস্থাপনাটা, কেননা এটাই ছিল ঠিক যা করণীয় সেই জিনিসটাই — এমন সাদাসিধে কথা যা ছিল সরাসরি উদ্দেশ্যের অনুযায়ী, তাতে অপমান না হয়ে পারে না সেই ভাববিলাসীদের, যারা স্থিরচিত্ত ছিল শুধু অস্থিরচিত্ততায়, যারা এত ভীরু যে কিছুই করতে পারত না, যারা চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলেছিল যে, কিছু না করে তারা করছিল ঠিক যা করণীয়। যা তাদের মনের মোহাচ্ছন্ন কিন্তু অভিপ্রেত তালগোল পাকান অবস্থাটাকে বিদ্যুৎচমকের মতো সাফ করে দেয় এমন প্রত্যেকটা কথা, যেটাকে তারা যথাসম্ভব স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে নিতে জিদ ধরে ছিল সেই গোলকধাঁধা থেকে তাদের বের করে আনার উপযোগী প্রত্যেকটা

---

* পোলীয় নাম: স্ত্শেগম্। — সম্পাঃ

সহায়ক পরামর্শ, বাস্তবে সবকিছু যেভাবে বিদ্যমান সে সম্বন্ধে প্রত্যেকটা স্পষ্ট ধারণা তাদের কাছে অবশ্য ছিল এই সার্বভৌম পরিষদের মর্যাদাহানিকর।

সমস্ত প্রস্তাব, আবেদন-নিবেদন, কৈফিয়ত তলব আর ঘোষণা সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কফুর্টের এই মান্য-গণ্য ভদ্রলোকদের অবস্থান অসমর্থনীয় হয়ে পড়ার স্বল্পকাল পরেই তারা হঠে গিয়েছিল, কিন্তু কোন বিদ্রোহী এলাকায় নয়, সেটা হত তাদের পক্ষে বড্ড বেশি স্থিরসংকল্প পদক্ষেপ। তারা গিয়েছিল স্টুটগার্টে, যেখানে ভ্যুর্টেমবের্গ সরকার প্রতীক্ষমাণ নিরপেক্ষতা গোছের কিছু বজায় রেখেছিল। অবশেষে সেখানে তারা ঘোষণা করেছিল যে, সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি তাঁর ক্ষমতা খুইয়েছিলেন, আর সেখানে তারা নিজেদের সংস্থা থেকে নির্বাচিত করেছিল পাঁচ-জনের রাজ-প্রতিনিধিত্ব। এই রাজ-প্রতিনিধিত্ব সঙ্গে সঙ্গে জারি করেছিল স্বেচ্ছা-সৈনিকদল সম্বন্ধে আইন, সেটাকে যথার্থই যথাবিধি পাঠান হয়েছিল জার্মানির সমস্ত সরকারের কাছে। তাদের, পরিষদের সেই ঘোর শত্রুদেরই হুকুম করা হয়েছিল সেটার প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্যে সৈন্য দিতে! এইভাবে জাতীয় পরিষদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্যে একটা ফৌজ গঠন করা হয়েছিল — অবশ্য শুধু কাগজপত্রে। বিভিন্ন ডিভিশন, ব্রিগেড, রেজিমেণ্ট, ব্যাটারি, সবকিছুর বিন্যাস এবং সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল। বাস্তবতা ছাড়া কিছুরই অভাব ছিল না: সেই ফৌজের অস্তিত্ব দান করা হয় নি কখনও।

জাতীয় পরিষদের কাছে এসেছিল একটা শেষ কর্ম-পরিকল্পনা। দেশের সমস্ত জায়গা থেকে গণতন্ত্রী জনসাধারণ ডেপুটেশন পাঠিয়ে পার্লা-মেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছিল, তারা তাগিদ দিয়েছিল নিষ্পত্তিকর কার্যকরণের জন্যে। ভ্যুর্টেমবের্গ সরকারের মতলবটা কী সেটা জেনে ঐ সরকারটাকে বিদ্রোহী প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রকাশ্য এবং সক্রিয় অংশীদার হতে বাধ্য করতে জাতীয় পরিষদকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল জনসাধারণ। কিন্তু বৃথাই। স্টুটগার্টে যাওয়াতেই জাতীয় পরিষদ ভ্যুর্টেমবের্গ সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্তে চলে গিয়েছিল। ডেপুটিরা সেটা বুঝল, তাই তারা জনগণের মধ্যে আলোড়নে বাধা দিল। প্রভাবের যে আখের অবশেষ হয়ত বজায় রাখতে পারত তাও তারা খোয়াল এইভাবে। অবজ্ঞাভাজন হল তারা – অবজ্ঞার উপযুক্ত পাত্রই তারা ছিল, আর প্রাশিয়া এবং সাম্রাজিক রাজ-প্রতিনিধির চাপে পড়ে

ভ্যুর্টেমবের্গ সরকার গণতান্ত্রিক প্রহসনে যবনিকাপাত করল: যেখানে পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসত সেই কামরাটা বন্ধ করে দিল ১৮৪৯ সালের ১৮ জনুন, আর রাজ-প্রতিনিধিত্বের সদস্যদের দেশ ছেড়ে যেতে হনুকুম করল।

তারপরে তারা গিয়েছিল বাডেনে — বিদ্রোহীদের শিবিরে, কিন্তু তখন সেখানে তারা অকেজো-অনবশ্যক। কেউ তাদের গণ্য করে নি। তবে রাজ-প্রতিনিধিত্ব সার্বভৌম জার্মান জনগণের তরফে সেটার উদ্যম দিয়ে দেশোদ্ধার করেই চলেছিল। যেকেউ সেটার কাছ থেকে **পাস্‌পোর্ট** নিতে চায় তাকে তা দিয়ে সেটা বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির স্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করেছিল। যখন সময় ছিল তখন ভ্যুর্টেমবের্গের ঠিক যেসব এলাকার সক্রিয় সহায়তা সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল সেইসব এলাকাকেই বিদ্রোহী করাবার জন্যে তারা বিভিন্ন ইস্তাহার ছেড়েছিল আর পাঠিয়েছিল কমিসারদের, তাতে অবশ্য কোন ফল হয় নি। এখন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে রাজ-প্রতিনিধিত্বের কাছে অন্যতম কমিসার মিঃ রোয়েসলারের (ওয়েল্‌স* থেকে সদস্য) পাঠান একটা মূল বিবরণ, সেটার বিষয়বস্তু কিছনটা বিশেষকই বটে। এটার তারিখ হল — স্টুটগার্ট, ৩০ জনুন, ১৮৪৯। অর্থের নিষ্ফল সন্ধানে এইসব কমিসারের জনা-ছয়েকের অভিযান বর্ণনা করার পরে তিনি তখনও নিজের কাজে লেগে না যাবার একগনুচ্ছ ওজর দেন, তারপরে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্যাভেরিয়া আর ভ্যুর্টেমবের্গের মধ্যে সম্ভাব্য মতভেদ এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে খনুবই গনুরনুতর যনুক্তি বিবৃত করেন। এটা নিয়ে সম্যক বিচার বিবেচনা করে তিনি কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পেশছন যে, সনুযোগ-সম্ভাবনা আর নেই। তথ্যাদি জ্ঞাপন করার জন্যে বিশ্বস্ত লোকেদের বিভিন্ন চৌকি, আর ভ্যুর্টেমবের্গ মন্ত্রিসভার মতিগতি এবং সৈন্যদের গতিবিধির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা স্থাপনের প্রস্তাব তিনি তোলেন তারপরে। এই চিঠি কখনও সেটার ঠিকানায় পেশছয় নি, কেননা এটা লেখার সময়ে 'রাজ-প্রতিনিধিত্ব' ইতোমধ্যে পনুরোপনুরি চলে গিয়েছিল 'বৈদেশিক বিভাগে', অর্থাৎ সনুইজারল্যাণ্ডে; আর বেচারা মিঃ রোয়েসলার যখন মাথা ঘামাচ্ছিলেন একটা

* পোলীয় নাম: ওলেসনিৎসা। — সম্পাঃ

ষষ্ঠ শ্রেণীর রাষ্ট্রের জাঁদরেল মন্ত্রিসভার মতিগতি নিয়ে তখন প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া এবং হেসে'র একলক্ষ সৈন্য রাশতাদ-এর প্রাকারের সামনে শেষ লড়াইয়ে সমগ্র ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলেছিল ইতোমধ্যে।

এইভাবে অন্তর্হিত হয়েছিল জার্মান পার্লামেণ্ট, আর সেটার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের প্রথম এবং শেষ সৃষ্টি। জার্মানিতে বাস্তবিকই একটা বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রথম নিদর্শন হল এই পার্লামেণ্ট আহ্বান করা; এই, প্রথম আধুনিক জার্মান বিপ্লবের যতকাল অবসান ঘটে নি ততকাল এটা বিদ্যমান ছিল। পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভাবাধীনে গ্রামাঞ্চলের খণ্ডছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জনসমষ্টি, যাদের বেশির ভাগ সবে জেগে উঠছিল সামন্ততন্ত্রের আমলের মূক অবস্থা থেকে, তাদের মনোনীত এই পার্লামেণ্ট ১৮২০-১৮৪৮ সালের সমস্ত নামজাদা জনপ্রিয় মানুষকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে সমবেত করে পরে তাদের একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। এখানে জড় হয়েছিল বুর্জোয়া উদারপন্থার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। নানা অবাককাণ্ড আশা করেছিল বুর্জোয়ারা, কিন্তু নিজেদের এবং নিজেদের প্রতিনিধিদের কলঙ্কিত করেছিল তারা। শিল্প আর বাণিজ্য ক্ষেত্রের পুঁজিপতি শ্রেণী অন্য যেকোন দেশের চেয়ে কঠোরভাবে পরাস্ত হয়েছিল জার্মানিতে। প্রথমে জার্মানির পৃথক পৃথক প্রত্যেকটা রাজ্যে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ, পরাস্ত এবং রাষ্ট্রীয় পদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল, আর তারপরে বিপর্যস্ত, অপদস্থ, ধিক্কৃত করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় জার্মান পার্লামেণ্টে। বুর্জোয়াদের যা নিয়ম-নীতি, রাজনীতিক উদারপন্থা, সেটা রাজতান্ত্রিক কিংবা প্রজাতান্ত্রিক যেকোন রূপের শাসনের আমলে হোক, তা জার্মানিতে চিরকাল অসম্ভব।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে বরাবর যে অংশটা ছিল সরকারী প্রতিপক্ষের নেতৃত্বে, অর্থাৎ গণতন্ত্রীরা, যারা ছিল খুদে ব্যাপারী শ্রেণীর এবং অংশত খামারী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধি, তাদের চিরকালের মতো অপদস্থ করল জার্মান পার্লামেণ্ট সেটার অস্তিত্বের শেষবর্তী কালপর্যায়ে। ঐ শ্রেণীটা জার্মানিতে সুস্থিত সরকার গঠনের সামর্থ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছিল ১৮৪৯ সালের মে আর জুন মাসে। কিভাবে সেটা ব্যর্থ হয়েছিল তা আমরা দেখেছি; সেটা ততটা নয় প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন, তার চেয়ে বেশি বরং বিপ্লব শুরু হবার পরবর্তী সমস্ত পরীক্ষাস্বরূপ আন্দোলনে

যথার্থ এবং অবিরাম ভীরুতার দরুন; সেটার ব্যবসায়ের কাজকারবারের বিশেষক অদূরদর্শী, দুর্বলচিত্ত, দোদুল্যমান মনোবৃত্তিটাকে রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রদর্শনের দরুন। ১৮৪৯ সালের মে মাসে সেটা এই কর্মধারার দরুন সমস্ত ইউরোপীয় অভ্যুত্থানের আসল লড়িয়ে শক্তি শ্রমিক শ্রেণীর আস্থা খুইয়েছিল। কিন্তু তবু সেটা একটা অনুকূল সুযোগ পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়াপন্থী আর উদারপন্থীরা সরে যাবার পরে জার্মান পার্লামেণ্ট সম্পূর্ণভাবেই ছিল সেটার হাতে। গ্রামাঞ্চলের জনসমষ্টি ছিল সেটার সপক্ষে; বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর রাজ্যের বাহিনীগুলির দুই-তৃতীয়াংশ, প্রুশীয় বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ, প্রুশীয় লাণ্ডভেয়ারের (রিজার্ভ বা স্বেচ্ছা-সৈনিকদল) অধিকাংশ সেটার সঙ্গে শামিল হতে প্রস্তুত ছিল — যদি সেটা শুধু কাজ করত স্থিরসংকল্প হয়ে এবং অবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি থেকে উদ্ভূত সাহসের সঙ্গে। কিন্তু এই শ্রেণীটার পরিচালক রাজনীতিকেরা তাদের অনুগামী পেটি বুর্জোয়াদের বিপুল অংশের চেয়ে বেশি স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। তারা ছিল মোহাচ্ছন্ন, ইচ্ছাপূর্বক বজায় রাখা বিভ্রমগুলোর প্রতি একান্ত আসক্ত, সহজবিশ্বাসী, প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে স্থিরসংকল্প হয়ে ব্যবস্থা করতে অপারক — এই সবই উদারপন্থীদের চেয়ে বেশি পরিমাণে, তাইই প্রতিপন্ন হল। তাদের রাজনীতিক গুরুত্বও নেমে গেল হিমাঙ্কের নিচে। কিন্তু নিজেদের মামুলি নীতিগুলিকে বাস্তবিক কার্যে পরিণত করে নি বলে তারা ছিল খুবই অনুকূল পরিস্থিতিতে, যাতে তারা সাময়িকভাবে পুনরুজ্জীবিত হতে সক্ষম ছিল — যখন এই শেষ আশাটা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে লুই বোনাপার্টের কুদেতা ফ্রান্সে তাদের 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের' সহযোগীদের কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিয়েছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির অভ্যুত্থানের পরাজয়ে এবং জার্মান পার্লামেণ্ট ছত্রভঙ্গ হওয়ায় প্রথম জার্মান বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটল। প্রতিবৈপ্লবিক জোটের

বিজয়ী সদস্যদের উপর এখন আমাদের একবার বিদায়ী দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেটা আমরা করব পরের প্রবন্ধে (৫৭)।

লণ্ডন, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫২

১৮৫১ সালের আগস্ট থেকে
১৮৫২ সালের সেপ্টেম্বর
মাসের মধ্যে এঙ্গেলসের লেখা

'New-York Daily Tribune'
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়
১৮৫১ সালে ২৫ আর ২৮ অক্টোবর,
৬, ৭, ১২ আর ২৮ নভেম্বর
এবং ১৮৫২ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি,
৫, ১৫, ১৮ আর ১৯ মার্চ,
৯, ১৭ আর ২৪ এপ্রিল,
২৭ জুলাই, ১৯ আগস্ট,
১৮ সেপ্টেম্বর, ২ আর ২৩ অক্টোবর

স্বাক্ষর: কার্ল মার্কস

সংবাদপত্রটির বয়ান
অনুসারে ছাপা হল

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

কোলন্-এর সাম্প্রতিক মামলা

লন্ডন, বুধবার, ১ ডিসেম্বর, ১৮৫২

প্রাশিয়ার কোলন-এ বিকট কমিউনিস্ট মামলা (৫৮) এবং সেটার ফল সম্বন্ধে ইউরোপীয় পত্র-পত্রিকাগুলি মারফত আপনারা এর আগে বহু রিপোর্ট পেয়ে থাকবেন। কিন্তু যেহেতু ঐসব রিপোর্টের কোনটাই তথ্যগুলো সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণের কাছাকাছিও নয়, আর যেহেতু ইউরোপের মূলভূমিকে দাস-দশায় রাখার রাজনীতিক উপায়াদির উপর প্রবল আলোকপাত করছে এইসব তথ্য, তাই এই মামলার কথায় ফিরে আসা আমি আবশ্যক বিবেচনা করছি।

সভা-সমিতির অধিকার দলনের দরুন ইউরোপের মূলভূমিতে বৈধ সংগঠন হিসেবে দাঁড়াবার উপায় থেকে বঞ্চিত ছিল কমিউনিস্ট বা প্রলেতারিয়ান তরফ, যেমন অন্যান্য তরফও। তাছাড়া, নিজ নিজ দেশ থেকে নির্বাসিত ছিলেন এর নেতারা। অথচ সংগঠন ছাড়া কোন রাজনীতিক তরফের অস্তিত্ব থাকে না; তবে উদারপন্থী বুর্জোয়া আর গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়া উভয়েই তাদের সামাজিক অবস্থা, সুবিধাদি এবং তাদের লোকদের দীর্ঘকালের দৈনন্দিন সংসর্গের কল্যাণে কমবেশি পরিমাণে যোগাতে পেরেছিল সেই সংগঠন, কিন্তু তেমন সামাজিক অবস্থা আর আর্থিক সংস্থান না থাকায় প্রলেতারিয়েত অনিবার্য কারণে বাধ্য হয়ে সেটা পেতে চেষ্টা করেছে গুপ্ত সমিতি হিসেবে। এই কারণে ফ্রান্স আর জার্মানি দুই দেশেই দেখা দেয় বহু গুপ্ত সমিতি, আর ১৮৪৯ সাল থেকে বরাবর পুলিস সেগুলিকে একটার পরে একটা খুঁজে বের করে ষড়যন্ত্র বলে অভিযুক্ত করেছে। তার অনেকগুলিই ছিল সত্যিকারের ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠন, সরকারকে উলটে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেগুলি গড়া হয়েছিল — কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতিতে যে ষড়যন্ত্র করবে

না সে কাপুরুষই বটে, ঠিক যেমন অন্য কোন কোন পরিস্থিতিতে তা যে করে সে মূর্খ। তবে অন্য কোন কোন সমিতি গড়া হয়েছিল ব্যাপকতর এবং আরও উন্নত উদ্দেশ্য অনুসারে, সেগুলি জানত কোন বিদ্যমান সরকার উলটে দেওয়াটা হল আসন্ন মহাসংগ্রামে একটা স্বল্পকালস্থায়ী পর্যায় মাত্র, সেগুলি ছিল তরফটার কোষকেন্দ্র, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল তরফটাকে একাট্টা রেখে প্রস্তুত করা সেই আখেরী নিষ্পত্তিকর লড়াইয়ের জন্যে, যাতে একদিন না একদিন ইউরোপে চিরকালের মতো খতম হবে শুধু 'জালিম', 'স্বৈরশাসক' আর 'জবরদখলদার'দের কর্তৃত্ব নয়, খতম হবে তাদের চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ, তাদের চেয়ে ঢের প্রচণ্ড একটা ক্ষমতা — শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য।

জার্মানিতে অগ্রুয়ান কমিউনিস্ট পার্টির (৫৯) সংগঠন ছিল এই ধরনের। এই সংগঠনের 'ইশতেহার'-এর (১৮৪৮ সালে প্রকাশিত) নীতিগুলি এবং 'New-York Daily Tribune' পত্রিকায় প্রকাশিত **'জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব'*** সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলিতে ব্যাখ্যাত নীতিগুলি অনুসারে এই পার্টি কখনও ধারণা করে নি নিজ ভাব-ভাবনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার বিপ্লবটাকে সেটা যেকোন সময়ে এবং ইচ্ছামতো পয়দা করতে পারে। ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি পয়দা হবার কারণ এবং সেসব আন্দোলন ব্যর্থ হবার কারণগুলি নিয়ে এই পার্টি বিচার-বিশ্লেষণ করেছিল। সমস্ত রাজনীতিক সংগ্রামের মূলে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সামাজিক বিরোধ লক্ষ্য করে এই পার্টিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয় সেই পরিবেশটা যাতে সমাজের কোন একটা শ্রেণীর উপর জাতির সমগ্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার এবং তাই জাতির উপর রাজনীতিক কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব পড়তে পারে এবং তা হবেই। ইতিহাস থেকে কমিউনিস্ট পার্টি দেখল — কিভাবে মধ্যযুগের ভূসম্পত্তি অধিকারীদের পরে প্রথম-প্রথম পুঁজিপতিদের অর্থঘটিত ক্ষমতা দেখা দিয়েছিল এবং তারা দখল করেছিল শাসনভার; কিভাবে স্টীম চালু হবার পর থেকে পুঁজিপতিদের ঐ অর্থপতি অংশটার সামাজিক প্রভাব আর

---

* এই খণ্ডে ৭-১২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

রাজনীতিক কর্তৃত্বের জয়গায় এসেছিল ম্যানুফ্যাকচারিং পুঁজিপতিদের বেড়ে-চলা ক্ষমতা, আর কিভাবে এখন কর্তৃত্বের পালা দাবি করছে আরও দুটো শ্রেণী — পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী এবং শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক শ্রেণী। ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের ব্যবহারিক বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় তত্ত্বের সেই বিচারধারাটা প্রতিপন্ন হল যার থেকে সিদ্ধান্ত এল যে, পেটি বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রের পালাই আসতে হবে আগে, তারপরে কমিউনিস্ট শ্রমিক শ্রেণী অবিরাম সংগ্রামের পথে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদেরকে বুর্জোয়াদের জোয়ালে জুতে রাখার মজুরি-শ্রম দাসত্ব খতম করার আশা করতে পারে।

এইভাবে জার্মানির বিদ্যমান সরকারগুলিকে উলটে দেবার সরাসর উদ্দেশ্য থাকতে পারত না কমিউনিস্টদের গুপ্ত সংগঠনের। এইসব সরকারকে নয়, কিন্তু এগুলোর পরে আগেপিছে যে বিদ্রোহী সরকার আসবে সেটাকে উচ্ছেদ করার জন্যে গঠিত হয় ঐ সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা তখন বিদ্যমান স্থিতাবস্থার (status quo) বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পৃথকভাবে সক্রিয় হয়ে হাত লাগাতে পারে এবং তা নিশ্চয়ই লাগাবে, কিন্তু গোপনে জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট মত ছড়িয়ে ছাড়া কোন উপায়ে অমন আন্দোলনের প্রস্তুতি কমিউনিস্ট লীগের একটা উদ্দেশ্য হতে পারত না। সমিতির বেশির ভাগ সদস্য সেটার এই ভিত্তিটাকে এতই ভালভাবে বুঝত যাতে উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে কেউ এটাকে কোন প্রস্তুতি ছাড়া উপস্থিতমতো বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্রে পরিণত করলে তাদের ঝটিতি বের করে দেওয়া হত।

ধরাধামে কোন আইন অনুসারে এমন একটা সমিতিকে রাষ্ট্রদ্রোহের উদ্দেশ্যে পরিচালিত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করা যায় না। এটা যদি ষড়যন্ত্র হয়েও থাকে, তা বিদ্যমান সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এর সম্ভাব্য কোন কোন উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে। প্রুশীয় সরকার সে সম্বন্ধে অবগতও ছিল। এই কারণেই সবচেয়ে আজব এই বিচারঘটিত অদ্ভুতকর্মে কর্তৃপক্ষের অতিবাহিত আঠার মাস ধরে প্রতিবাদী এগার জনকে আটক রাখা হয়েছিল নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ভাবুন একবারটি, বন্দীদের আট মাস হাজতে আটক রাখার পরে তাঁদের আবার হাজতে পোরা হল আরও কয়েক মাসের জন্যে, 'অপরাধের কোন সাবুদ তাঁদের বিরুদ্ধে না থাকায়!' অবশেষে যখন তাঁদের হাজির করা হল জুরির এজলাসে তখনও রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক ধরনের একটা প্রত্যক্ষ

কাজ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হল না। অথচ তাঁরা অপরাধী বলে রায় দেওয়া হল — এখুনি দেখবেন সেটা কিভাবে।

সমিতির একজন বিশেষ দূত* গ্রেপ্তার হন ১৮৫১ সালের মে মাসে, তাঁর কাছে পাওয়া দলিলপত্র অনুসারে গ্রেপ্তার হন আরও কেউ কেউ। তথাকথিত চক্রান্তের শাখাপ্রশাখা খুঁজে বের করার জন্যে স্টিবার নামে জনৈক প্রুশীয় পুলিস অফিসারকে সঙ্গেসঙ্গে লণ্ডন যেতে হুকুম দেওয়া হল। সমিতি থেকে বেরিয়ে-যাওয়া উল্লিখিত লোকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কাগজপত্র সে পেলও বটে; সমিতি থেকে বিতাড়িত হবার পরে তারা যথার্থই একটা ষড়যন্ত্র করেছিল প্যারিসে আর লণ্ডনে। ঐসব কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল জোড়া দুষ্ক্রিয়ার সাহায্যে। রয়টার নামে একটা লোককে ঘুষ দিয়ে তাকে দিয়ে সমিতির সম্পাদকের** ডেস্ক ভেঙে সেখান থেকে ঐ কাগজপত্র চুরি করান হয়েছিল। কিন্তু তাও তো কিছুই নয়। ঐ চুরি থেকে প্যারিসে তথাকথিত ফরাসী-জার্মান চক্রান্ত (৬০) আবিষ্কৃত হয়, তাতে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু মহান কমিউনিস্ট লীগ সম্বন্ধে কোন সূত্রক তার থেকে বের হয় না। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, প্যারিস চক্রান্তটার পরিচালক ছিল লণ্ডনে অল্প কয়েক জন অতি-আকাঙ্ক্ষী ক্ষীণচেতা এবং রাজনীতিক chevaliers d'industrie,*** আর আগেই দণ্ডিত একজন জালিয়াত, সে তখন প্যারিসে পুলিসের গুপ্তচরের কাজ করছিল****। তাদের রাজনীতিক জীবন ছিল একেবারেই নগণ্য, এই অভাবটাকে পুষিয়ে দিয়েছিল তাদের ভজানো লোকগুলোর জন্যে বুলি আর রক্তপিপাসু গলাবাজি।

প্রুশীয় পুলিসকে তখন নতুন নতুন উদ্ভাবনের জন্যে তল্লাশ করতে হয়েছিল। লণ্ডনে প্রুশীয় রাষ্ট্রদূতাবাসে তারা গুপ্ত পুলিসের একটা পুরাদস্তুর আপিস খুলেছিল। গ্রেইফ্ নামে একজন পুলিসের চর তার জঘন্য কাজটা চালাচ্ছিল রাষ্ট্রদূতাবাসের একজন সহদূত (অ্যাটাশে) হিসেবে — এই

---

* পিটার নটিয়ুং। — সম্পাঃ

** অ. ডিট্স্। — সম্পাঃ

*** বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী, ভাঁওতাবাজ। — সম্পাঃ

**** শেভাল। — সম্পাঃ

ব্যবস্থাটার ফলে সমস্ত প্রুশীয় রাষ্ট্রদূতাবাস আন্তর্জাতিক আইনের চৌহদ্দির বাইরে পড়ে যায়, যেমন ব্যবস্থা এখনও নিতে সাহস করে নি এমনকি অস্ট্রীয়রাও। তার অধীনে কাজ করত জনৈক ফ্লেরি, লণ্ডন ব্যবসায়কেন্দ্রের একজন ব্যাপারী, বেশকিছুটা পয়সাওয়ালা লোক, তার কিছুটা যোগাযোগ ছিল মান্যগণ্য মহলে -- জঘন্যতার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাবশত যারা সবচেয়ে হীন কাজকর্ম করে সেইসব নিচ জীবদের একটি। আর-একজন চর ছিল হির্শ নামে ব্যবসায় মহলের জনৈক কেরানি, সে অবশ্যি হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে চর হিসেবে শনাক্ত হয়ে গিয়েছিল। লণ্ডনে কিছু কিছু জার্মান কমিউনিস্ট শরণার্থীদের মহলে সে হাজির হয়েছিল, তার আসল পরিচয় সম্বন্ধে প্রমাণাদি পাবার জন্যে তারা তাকে গ্রহণ করেছিল স্বল্পকালের জন্যে। পুলিসের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল চটপট, আর তখন থেকে মিঃ হির্শ উধাও। যেসব তথ্য জোগাড় করার জন্যে তাকে পয়সা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি পাবার সুযোগ থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও সে নিষ্ক্রিয় থাকে নি। কেনসিংটনে নিজের গুপ্তস্থানে সে সংশ্লিষ্ট কমিউনিস্টদের একজনেরও দেখা পায় নি, কিন্তু প্রুশীয় পুলিস যেটার কোন সূত্র পায় নি ঠিক সেই তথাকথিত ষড়যন্ত্রমূলক সংস্থা তথাকথিত কেন্দ্রীয় কমিটির তথাকথিত বৈঠকগুলোর তথাকথিত রিপোর্ট সে বানিয়েছিল প্রতি সপ্তাহে। এইসব রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল অতি আজগুবি ধরনের; একটাও মূলনাম সঠিক ছিল না, সঠিক বানান ছিল না একটিও নামের, একজনের মুখেও সে এমন কোন কথা বসাতে পারে নি যেমনটা সে বলতে পারত। তার মনিব ফ্লেরি তাকে এইসব জালিয়াতিতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু 'সহদূত' গ্রেইফ্ এইসব জঘন্য ব্যাপারের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে পারে এমনটা এখনও প্রমাণিত হয় নি। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও, প্রুশীয় সরকার ঐ সমস্ত বানানো বাজে কথাকে ধরে নিয়েছিল একেবারে পরম সত্য বলে, কিন্তু জুরির এজলাসে হাজির-করা সাক্ষ্য-সাবুদের মধ্যে এমনসব এজাহার কী তালগোল পাকান অবস্থা সৃষ্টি করেছিল সেটা ধারণা করে নিতে পারেন। মামলা শুরু হলে, আগেই উল্লিখিত পুলিস অফিসার স্টিবার সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠে হলফ করে বলল এই সমস্ত আজগুবি কথা সত্যি, আর সমানই আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে সে বলল, এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রটার পালের গোদা বলে বিবেচিত লণ্ডনের

মহলগুলির সঙ্গে চূড়ান্তভাবে ঘনিষ্ঠ একজন গুপ্তচর তার ছিল। এই গুপ্তচরটি খুবই গুপ্তই ছিল বটে, কেননা আট মাস ধরে সে কেন্সিংটনে মুখ লুকিয়ে ছিল, কেননা যেসব মহলের অতি গোপন ভাবনা, কথা আর কাজ সম্বন্ধে সে নাকি সপ্তাহের পর সপ্তাহ রিপোর্ট দিচ্ছিল তাদের কারও সঙ্গে পাছে সত্যিই দেখা হয়ে যায়।

মিঃ হির্‌শ আর মিঃ ফ্লোরির হাতে কিন্তু ছিল আরও একটা উদ্ভাবনা। তাদের পাঠান সমস্ত রিপোর্ট নিয়ে তারা বানিয়েছিল (যেটার অস্তিত্ব সমর্থন করছিল প্রুশীয় পুলিস) সেই গুপ্ত সর্বোচ্চ কমিটির বৈঠকগুলির 'মূল কার্যবিবরণী পুস্তক'। আর মিঃ স্টিবার যেইমাত্র দেখলেন একই মহল থেকে আগেই পাওয়া রিপোর্টগুলোর সঙ্গে এই পুস্তক চমৎকার মিলে যাচ্ছে, অমনি তিনি সেটাকে জুরির কাছে পেশ করে হলফ করে বললেন, গুরুত্বপূর্ণ বিচার-বিবেচনার পরে এবং তাঁর পরিপূর্ণ প্রত্যয় অনুসারে পুস্তকখানা সাচ্চা। হির্‌শের রিপোর্ট-করা বেশির ভাগ আজগবি কথা প্রকাশ পায় তখনই। সেই গুপ্ত কমিটির তথাকথিত সদস্যরা যখন তাঁদের সম্বন্ধে বিবৃত জিনিসগুলো দেখলেন যা তাঁরা কখনও জানতেন না তখন তাঁরা কী অবাক হয়েছিলেন সেটা অনুমান করতে পারেন। যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল ভিলহেল্‌ম তাঁরা এখানে পরিচিত ছিলেন লুই কিংবা শার্লেমেন বলে; অন্য কেউ কেউ যখন ছিলেন ইংলণ্ডের অপর প্রান্তে তখন তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বলান হয়েছিল লণ্ডনে; আরও কাউকে দিয়ে চিঠি পড়ান হয়েছিল যা তাঁরা কখনও পান নি; রিপোর্টে তাঁদের নিয়মিতভাবে একত্র করান হয়েছিল বৃহস্পতিবারে, যখন তাঁরা সপ্তাহে একবার পান-ভোজনে মিলিত হতেন বুধবারে; একজন মজুর বড় একটা লিখতেই পারতেন না, তাঁকে দেখান হল সভার কার্যবিবরণ লেখক এবং তদনুসারে তাতে সইদাতা হিসেবে; আর তাঁদের সবাইকে এমন ভাষায় কথা বলান হল যেটা প্রুশীয় পুলিস থানার ভাষা হতে পারে, কিন্তু নিজেদের দেশে দেশে সুখ্যাতি-পরিচিতিসম্পন্ন সাহিত্যিক মহলের মানুষ যাতে অধিকাংশ এমন জমায়েতের ভাষা নয় নিশ্চয়ই। আর সর্বোপরি কিছু টাকার একখানা জাল রসিদ, জালিয়াতরা নাকি ঐ পুস্তকখানা বাবত টাকাটা দিয়েছিল কল্পিত কেন্দ্রীয় কমিটির তথাকথিত সম্পাদককে। কিন্তু বেচারা হির্‌শের সঙ্গে একজন

খুনসুড়ে কমিউনিস্টের ভাঁওতাই ছিল শুধু এই তথাকথিত সম্পাদকের অস্তিত্বের ভিত্তি।

আনাড়ি উদ্ভাবনটা ছিল এতই কেলেঙ্কারির ব্যাপার যা সেটার ঈপ্সিত ক্রিয়াফলের বিপরীতটাই পয়দা না করে পারে নি। যদিও প্রতিবাদীদের লন্ডনের বন্ধুরা মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি যাতে জুরির কাছে হাজির করতে পারেন তেমন সমস্ত উপায় থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছিল, যদিও প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির কাছে তাঁরা যেসব চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেগুলিকে চেপে দিয়েছিল ডাক বিভাগ, যেসব দলিলপত্র আর শপথনামা তাঁরা ঐ আইনক্ষেত্রের ভদ্রলোকদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সেগুলি যদিও সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয় নি, তবু সর্বসাধারণের ঘৃণা আর ক্রোধ ছিল এমনই যাতে সরকারী অভিশংসকেরা, শুধু তাই নয়, সেই পুস্তকের যাথার্থ্যের গ্যারাণ্টি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল যার হলফ-বাক্য সেই মিঃ স্টিবারও সেটাকে জালিয়াতি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

তবে পুলিস যে ধরনের অপরাধে অপরাধী ছিল তার একমাত্র উপাদান নয় এই জালিয়াতিটা। মামলা চলার সময়ে অমন আরও দু'-তিনটে ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছিল। রয়টারের চুরি-করা দলিলপত্রের মধ্যে পুলিস নানা কথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যাতে সেটার অর্থ বিকৃত হয়। অতি জঘন্য বাজে কথা লেখা একখানা কাগজ লেখা হয়েছিল ডঃ মার্কসের হাতের লেখার ছাঁদে, আর সেটা তাঁরই লেখা বলে চালানো হয়েছিল কিছুকাল, শেষে বাদীপক্ষ সেটাকে জালিয়াতি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুলিসের জঘন্যতা একটা প্রমাণিত হলে তার জায়গায় তোলা হয়েছে নতুন আরও পাঁচ-ছ'টা, সেগুলোর স্বরূপ তখনই খুলে ধরা যায় নি, কেননা সেগুলো আসে প্রতিবাদীপক্ষের দিক থেকে অতর্কিতে, প্রমাণাদি পাওয়া দরকার ছিল লন্ডন থেকে, কিন্তু লন্ডনে কমিউনিস্ট শরণার্থীদের সঙ্গে প্রতিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির প্রত্যেকটা চিঠিপত্র তথাকথিত চক্রান্তে সহযোগ বলে ধরা হচ্ছিল প্রকাশ্য আদালতে।

গ্রেইফ্ আর ফ্লোরিকে এখানে যেভাবে দেখান হল তারা তাইই সেটা মিঃ স্টিবার নিজেই বলেছেন তাঁর সাক্ষ্যে; আর হির্‌শ — সে লন্ডনের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে 'কার্যবিবরণী পুস্তক' সে জাল

করেছিল হুকুমমাফিক এবং ফ্লোরির সাহায্যে, তারপরে সে ফৌজদারী অভিযোগ এড়াবার জন্যে এদেশ থেকে পালিয়ে যায়।

এই মামলা চলার সময়ে যেসব কলঙ্ককর ব্যাপার ফাঁস হয়েছিল তার ফলে সরকার খুবই কঠিন অবস্থায় পড়েছিল। জুরি যা ছিল তেমনটা রাইন প্রদেশ আগে কখনও দেখে নি। ছ'জন একেবারে বিশুদ্ধতম প্রতিক্রিয়াপন্থী অভিজাত, ফিনান্স জগতের লর্ড চার জন, দু'জন সরকারী কর্মকর্তা। ছ'সপ্তাহ ধরে তাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে গাদা-করা সাক্ষ্য-সাবুদ খুঁটিয়ে দেখার মতো মানুষ এরা নয়, যখন অবিরাম ঢাক পিটিয়ে তাদের কানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে, প্রতিবাদীরা ছিল একটা ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের সর্দার, পবিত্র সবকিছু — মালিকানা, পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা, সরকার আর আইন — উলটে দিতে তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল! কিন্তু তবু তার সঙ্গে সঙ্গে সরকার যদি বিশেষাধিকারী শ্রেণীগুলিকে জানিয়ে না দিত যে, এই মামলায় বেকসুর খালাসের রায় হত জুরিকে দমন করার সংকেত, যদি তাদের জানিয়ে না দেওয়া হত যে, খালাসের রায়টাকে ধরা হত সরাসর রাজনীতিক প্রদর্শন হিসেবে এবং অতি চরম বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গেও বুর্জোয়া উদারপন্থী প্রতিপক্ষের এক হতে প্রস্তুত থাকবার প্রমাণ হিসেবে, তাহলে বেকসুর খালাসের রায়ই হত। যা হল তাতে নতুন প্রুশীয় ফৌজদারী সংহিতাকে অতীত সম্পর্কে প্রয়োগ করে সরকার সাত জন বন্দীকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারল, বেকসুর খালাস হলেন মাত্র চার জন। যাঁরা অপরাধী সাব্যস্ত হলেন তাঁদের উপর কারাদণ্ডাদেশ হল তিন থেকে ছয় বছরের বিভিন্ন মেয়াদের, যা আপনারা নিশ্চয়ই খবরটা আপনাদের কাছে পেঁছবার সময়েই বিজ্ঞাপিত করেছিলেন।

১৮৫২ সালে ২৯ নভেম্বর
এঙ্গেলসের লেখা

১৮৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর
'The New-York Daily Tribune'-এর
৩৬৪৫ নং সংখ্যায় ছাপা হয়

স্বাক্ষর: কার্ল মার্কস

সংবাদপত্রটির বয়ান
অনুসারে এখানে ছাপা হল

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসন (৬১)

লণ্ডন, শুক্রবার, ১০ জুন, ১৮৫৩

...হিন্দুস্তান যেন এশীয় আয়তনের এক ইতালি, হিমালয় তার আল্প্‌স্‌, বাংলার সমভূমি যেন তার লম্বার্দি সমভূমি, দাক্ষিণাত্য তার অ্যাপেনাইন্স এবং সিংহল তার সিসিলি দ্বীপ। জমির উৎপন্নের সেই একই সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য এবং রাজনৈতিক চেহারায় সেই একই খণ্ড খণ্ড ভাব। বিজয়ীর তরবারির চাপে ইতালি যেমন মাঝেমাঝে বিভিন্ন জাতির সমষ্টিতে সংহত হয়েছে, তেমনি দেখা যায় হিন্দুস্তানেও মুসলমান বা মোগল বা বৃটনদের চাপ যখন থাকে নি, তখন হিন্দুস্তানও যতগুলি বিবদমান স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে গেছে তার সংখ্যা হিন্দুস্তানের নগর এমন কি গ্রামগুলির সংখ্যার মতো। তবু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, হিন্দুস্তান ইতালি নয়, প্রাচ্যের আয়র্ল্যাণ্ড। এবং ইতালি ও আয়র্ল্যাণ্ড — ভোগবিলাসী এক জগতের সঙ্গে দুর্দশার এক জগতের এই বিচিত্র মিলন — তা হিন্দুস্তানের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সূচিত। এ ধর্ম যুগপৎ ইন্দ্রিয়াতিশয্য ও আত্মনিগ্রহী কৃচ্ছ্রসাধনের ধর্ম, লিঙ্গম্‌ আর জগন্নাথদেবের ধর্ম, সন্ন্যাসী ও বায়াদেরের (দেবদাসীর) ধর্ম।

যাঁরা হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগে বিশ্বাস করেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই, তবে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আমি স্যার চার্লস উডের মতো কুলি-খাঁর নজির দেব না। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ আওরঙ্গজেবের সময়টা ধরা যাক, অথবা উত্তরে যখন মোগল এবং দক্ষিণে পোর্তুগীজদের উদয় হল সেই যুগটা, অথবা

মুসলিম অভিযান ও দাক্ষিণাত্যের হেপ্টার্কির যুগই*। কিংবা চাই কি, আরো পুরাকালে গিয়ে খাস ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ইতিবৃত্তটাকেই নেওয়া যাক — তাতে ভারতীয় দুর্দশার প্রারম্ভ বলে যে কাল-নির্দেশ হয়েছে, সেটা খৃষ্টীয় ধারণানুসারে বিশ্বসৃষ্টিরও আগে।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহই নেই যে বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি** এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে সালসেট মন্দিরের রোমহর্ষক স্বর্গীয় দানবদের চাইতেও বেশি যে দানবীয় এক জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে, তার কথা আমি বলছি না। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের কোনো বৈশিষ্ট্যসূচক দিক এটা নয় — এ হল শুধুই ওলন্দাজদের অনুকরণ এবং এতখানি অনুকরণ যে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্রিয়াকলাপের সংজ্ঞা দিতে হলে জাভার ইংরেজ লাট স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস অতীতের ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করলেই যথেষ্ট:

'ওলন্দাজ কোম্পানি শুধুমাত্র লাভের লালসায় প্ররোচিত হয়েছিল এবং আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ার বাগান-মালিক বাগানের কুলিবাহিনীকে যে দৃষ্টিতে দেখত তার চেয়েও কম শ্রদ্ধা ও কম বিবেচনার সঙ্গে তারা দেখত তাদের প্রজাদের, কারণ বাগান-মালিককে মনুষ্যসম্পদ ক্রয় করার জন্যে টাকা দিতে হয়েছিল, এদের দিতে হয় নি। এ কোম্পানি

---

* হেপ্টার্কি (সপ্তরাজ্য) — ইংলণ্ড যখন সাতটি এঙ্গলো-স্যাক্সন রাজ্যে বিভক্ত ছিল (৬ষ্ঠ — ৮ম শতক) তখনকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনায় ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ব্যবহৃত একটি শব্দ। উপমা হিসেবে মার্কস এই শব্দটি ব্যবহার করছেন মুসলিম অভিযানের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের (মধ্য ও দক্ষিণ ভারত) সামন্ত বিখণ্ডীকরণ নির্দেশের জন্য। — সম্পাঃ

** বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি — ভারতের সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্যের জন্য এটি গঠিত হয় ১৬০০ সালে। 'বাণিজ্য' কারবারের আড়ালে ইংরেজ পুঁজিপতিরা ভারত জয় করতে থাকে ও কয়েক দশকের মধ্যে তার শাসক হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৭—১৮৫৯ সালের ভারতীয় অভ্যুত্থানের সময় কোম্পানি তুলে দেওয়া হয় ও ইংরেজ সরকার ভারত শাসন সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। — সম্পাঃ

স্বেচ্ছাতন্ত্রের সবর্খানি প্রচলিত যন্ত্র প্রয়োগ করেছিল লোকগুলোর কাছ থেকে যত বেশি পারা যায় আদায় করার জন্যে, নিংড়ে নেবার জন্যে তাদের মেহনতের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত এবং এই ভাবে খামখেয়ালী ও অর্ধবর্বর এক সরকারজনিত কুফল বাড়িয়ে তুলত রাজনীতিকদের অভ্রান্ত সবখানি ধূর্ততা ও ব্যবসায়ীদের সবখানি একচেটিয়া স্বার্থপরতার সঙ্গে সে যন্ত্রকে পরিচালিত করে।'

হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত ও বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সবকিছু গৃহযুদ্ধ, অভিযান, উৎপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নিচে নামে নি। ইংলন্ডই ভারতীয় সমাজের সমগ্র ভিত্তিটাই ভেঙে দিয়েছে, তার পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের অপহৃতি অথচ নতুন কোনো জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে ও বৃটেন-শাসিত হিন্দুস্তান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।

এশিয়ায় স্মরণাতীত কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল: অর্থবিভাগ অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধবিভাগ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ, এবং পরিশেষে পূর্তকর্মের বিভাগ। আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে, বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুন্নত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়; জলের স্ফীতির সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলিতে জলের জোগান দেওয়া হয়। বিনা অপচয়ে, সমবেতভাবে জল-ব্যবহারের এই প্রাথমিক যে প্রয়োজন থেকে প্রতীচ্যে যেমন, ফ্ল্যান্ডার্স ও ইতালির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলি স্বেচ্ছামূলক সমিতিতে আবদ্ধ হতে এগিয়েছিল, তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ — এ প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্তি এত বিপুল যে স্বেচ্ছামূলক সমিতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই এসে বর্তায় একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব — পূর্তকর্ম

সংগঠনের কাজ। ভূমির এই যে কৃত্রিম উর্বরীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং সেচ ও জল-নিঃসারণ ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গেসঙ্গেই যা ক্ষয় পেতে থাকে, তা থেকেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এই অন্যথা-বিচিত্র ঘটনাটির — কেন আমরা পালমিরা ও পেত্রায়, ইয়েমেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এবং মিশর, পারস্য ও হিন্দুস্তানের বড়ো বড়ো প্রদেশে দেখি, একদা অতি উত্তমরূপে কর্ষিত গোটাগুটি এক একটা এলাকা আজ বন্ধ্যা ও মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে। এ থেকেও ব্যাখ্যা করা যায় কেমন করে একটি মাত্র বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি দেশ জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে, তার সমস্ত সভ্যতা লোপ পায়।

পূর্ব ভারতে বৃটিশ তাদের পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে অর্থ ও যুদ্ধের বিভাগটি গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু পূর্তকর্মটা একেবারেই অবহেলা করেছে। সেই জন্যেই কৃষির এ অবনতি, অবাধ প্রতিযোগিতার বৃটিশ নীতি —laissez faire, laissez aller* এই নীতিতে এ কৃষি পরিচালিত হতে পারে না। কিন্তু এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে কৃষি এক সরকারের আমলে অবনত হচ্ছে আবার অন্য সরকারের আমলে উন্নত হচ্ছে, এ দেখতে আমরা বেশ অভ্যস্ত। ইউরোপে যেমন ভালো মন্দ আবহাওয়া অনুসারে ফসলের অবস্থা বদলায়, ওখানে তেমনি বদলায় ভালো মন্দ সরকার অনুসারে। সুতরাং কৃষির পীড়ন ও অবহেলা খারাপ জিনিস হলেও ভারতীয় সমাজের ওপর সেইটাই বৃটিশ অভিযানকারীদের চূড়ান্ত আঘাত বলে গণ্য না করা সম্ভব হত, যদি এর সঙ্গে একেবারে অন্য রকম গুরুত্বের একটি পরিস্থিতি, সমগ্র এশীয় জগতের ইতিহাসের পক্ষেই যা অভিনব, তার সংযোগ না ঘটত। ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। সে সমাজ-কাঠামোর খুঁটি হল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে নিয়মিতভাবে তাঁতী আর সুতাকাটুনির

* Laissez faire, laissez aller —কার্যকলাপের স্বাধীনতা দাও — (অবাধ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় না-হস্তক্ষেপের মতাবলম্বী বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ধ্বনি)। — সম্পাঃ

অক্ষৌহিণী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ইউরোপ ভারতীয় শ্রমের অপূর্ব বস্ত্র পেয়ে এসেছে এবং তার বদলে পাঠিয়েছে তার বহুমূল্য ধাতু। সে ধাতু পৌঁছিয়েছে ভারতের স্বর্ণকারের কাছে, ভারতীয় সমাজের এক আবশ্যিক সদস্য সে — এ সমাজে অলঙ্কার-প্রিয়তা এত বেশি যে নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত, যারা প্রায় নগ্নগায়ে ঘোরে তারাও সাধারণত এক জোড়া সোনার মাকড়ি আর গলায় কোনো না কোনো রকমের সোনার গহনা পরে। হাত-পায়ের আঙুলে আংটি পরাও খুব চল। নারী ও ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পরে ভারি ভারি সোনারুপোর কঙ্কণ আর মল, এবং ঘরে দেখতে পাওয়া যায় সোনারুপোর তৈরি দেবদেবীর মূর্তি। বৃটিশ হামলাদাররাই এসে ভারতীয় তাঁত ভেঙে ফেলে, ধ্বংস করে চরকা। ইংলণ্ড শুরু করে ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় তুলাবস্ত্রকে বিতাড়ন করে; অতঃপর সে হিন্দুস্থানে সুতো পাঠাতে থাকে এবং পরিশেষে তুলোর মাতৃভূমিকেই কার্পাস বস্ত্র চালান দিয়ে ভাসিয়ে দেয়। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত গ্রেট বৃটেন থেকে ভারতে সুতো চালানের অনুপাত বেড়ে ওঠে ১ থেকে ৫,২০০ গুণ। ১৮২৪ সালে ভারতে বৃটিশ মসলিনের চালান ১০,০০,০০০ গজও প্রায় নয়, অথচ ১৮৩৭ সালে তা ৬,৪০,০০,০০০ গজও ছাড়িয়ে যায়। অথচ একই সময়ে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ২০,০০০-এ নেমে আসে। শিল্পের জন্যে বিখ্যাত এই সব ভারতীয় শহরগুলির অবক্ষয়টুকুই কিন্তু বৃটিশ আধিপত্যের সর্বনিকৃষ্ট ফলাফল নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের যে ঐক্য ছিল বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান তাকে উন্মূলিত করে দিয়েছে।

এই দুটি অবস্থা — একদিকে সকল প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক সর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পূর্তকর্মের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পণ, এবং অন্যদিকে জনসমষ্টির সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে তাদের ছোটো ছোটো কেন্দ্র জোট বন্ধন — এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ-ব্যবস্থা — তথাকথিত **গ্রামগোষ্ঠী-ব্যবস্থার** সৃষ্টি করেছে, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা। এই ব্যবস্থার বিশিষ্ট চরিত্র বোঝা যাবে ভারত বিষয়ে

বৃটিশ কমন্স সভার একটি পুরনো সরকারী দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে:

'ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটা গ্রাম হল কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল; রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌর গোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরনের: **পটেল** (potail) অথবা প্রধান মন্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিসের কাজ দেখে, এবং স্ব-গ্রামের অভ্যন্তর থেকে রাজস্ব-সংগ্রহের কাজ চালায় — ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। **কার্নম** (kurnum) চাষের হিসাব রাখে এবং চাষ সংক্রান্ত সবকিছু নথিবদ্ধ করে। **তৈলার** (tallier) আর **তোত্তী** (totie)— প্রথম জনের কাজ অপরাধাদির সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা; অপর জনের এখতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। **সীমানাদার** — তার কাজ গ্রামের সীমা রক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্যে জলের বিলি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পুজা-অর্চনা। গুরু মশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন। পঞ্জিকা-ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী ইত্যাদি। এই সব পরিচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা, কিন্তু দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে সে ব্যবস্থাপনা এত প্রসারিত নয়, উপরিকথিত দায়-দায়িত্বের কতকগুলি একই ব্যক্তি পালন করে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে উপরিকথিত লোক ছাড়াও কিছু বেশি লোক দেখা যায়। এই প্রাথমিক ধরনের পৌরশাসনের আওতায় স্মরণাতীত কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে কচিৎ; এবং যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বা মারীমড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমন কি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগবিভাগ নিয়ে এই সব গ্রামের অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না; গ্রামটি অখন্ড হয়ে থাকলেই হল, কোন্ শক্তির কাছে তা গেল, কোন্ সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ নিয়ে তারা ভাবে না — গ্রামের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির অপরিবর্তিতই থাকে। সেই একই পটেল থাকে প্রধান মন্ডল তথা ক্ষুদে বিচারপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনো চালিয়ে যায়।'

এই সব ছোটো ছোটো বাঁধি-গৎ ধরনের সামাজিক সত্তাগুলি বহুলাংশে ভেঙে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স-সংগ্রাহক ও বৃটিশ

সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাষ্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের ক্রিয়ায়। ঐ সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল কুটির শিল্প — হাতে কাটা সুতো, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এমন এক বিশিষ্ট সমন্বয়, যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সুতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাংকাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সুতাকাটুনি ও তাঁতী উভয়কেই নিশ্চিহ্ন করে এই সব ছোটো ছোটো অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়েছে, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।

ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায় — দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল (idyllic) গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই দৃঢ় ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্যমানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা কোনো একটা ক্ষুদ্র ভূমিখন্ড আঁকড়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকান্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে বেশি কিছু ভাবে নি এদের; এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠেছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অচল ও উদ্ভিদ্-সুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যাব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে ছোটো ছোটো এই

সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার পদানত, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজ-ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির এমন পূজো যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শবলাদেবী রূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।

তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙে পড়ার দৃশ্য যত কটু লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের অধিকার রয়েছে গেয়টের সঙ্গে ঘোষণা করার:

'Sollte diese Qual uns quälen
Da sie unsre Lust vermehrt,
Hat nicht Myriaden Seelen
Timur's Herrschaft aufgezehrt?'*

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩ সালের
১০ জুন লিখিত
'New-York Daily Tribune' পত্রিকায়
৩৮০৪ নং সংখ্যায়
১৮৫৩ সালের ২৫ জুন প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

স্বাক্ষর: **কার্ল মার্কস**

---

* 'এ নির্যাতন থেকে যদি পাই এক বৃহত্তম সুখ, তবে কেন সেজন্যে মনঃপীড়া? তৈমুরের শাসনের মাধ্যমে কি হয় নি আত্মার অশেষ নির্বাণ?' (গেয়টের 'Westöstlicher Diwan', 'An Suleika' থেকে)। — সম্পাঃ

কার্ল মার্কস

ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল

লন্ডন, শুক্রবার, ২২শে জুলাই, ১৮৫৩

আমি ভারত সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলির খতিয়ান করতে চাই এই প্রবন্ধে।

ইংরেজ প্রভুত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল কী করে? মহা মোগলের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভেঙে ফেলেছিল মোগল শাসনকর্তারা। শাসনকর্তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করল মারাঠারা। মারাঠাদের ক্ষমতা ভাঙল আফগানরা; এবং সবাই যখন সবার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন প্রবেশ করল বৃটেন এবং সকলকেই অধীন করতে সক্ষম হল। দেশটা শুধু হিন্দু আর মুসলমানেই বিভক্ত নয়, বিভক্ত উপজাতিতে, বর্ণাশ্রমজাতিভেদে; এমন একটা স্থিতিসাম্যের ভিত্তিতে সমাজটার কাঠামো গড়ে উঠেছিল যা এসেছে সমাজের সকল সভ্যদের মধ্যস্থ একটা সাধারণ বিরাগ ও প্রথাবদ্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতা থেকে; — এমন একটা দেশ ও এমন একটা সমাজ, সে কি বিজয়ের এক অবধারিত শিকার হয়েই ছিল না? হিন্দুস্তানের অতীত ইতিহাস না জানলেও অন্তত এই একটি মস্ত ও অবিসংবাদী তথ্য তো রয়েছে যে এমন কি এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে পোষিত এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই! বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতীত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পরপর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোনো ইতিহাসই নেই — অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী ও অপরিবর্তমান সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে

গেছে। ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়: প্রশ্ন এই, তুর্কী, পারসীক কি রুশদের দ্বারা ভারত বিজয় কি বৃটেনদের দ্বারা ভারত বিজয়ের চেয়ে শ্রেয় বলে ভাবব?

ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলন্ডকে: একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক -- পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।

আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই **হিন্দুভূত হয়ে গেছে;** ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। বৃটিশেরাই হল প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু তার কাছে অনধিগম্য। দেশীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, দেশীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং দেশীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে বৃটিশেরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া প্রায় লক্ষ্যেই পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

এ উজ্জীবনের প্রথম সর্ত হল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য — মোগল-ই-আজম আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও দূরপ্রসারিত। বৃটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে। দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী বৃটিশ ড্রিল-সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্মমুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর শিকার হওয়া থেকে অব্যাহতির sine qua non*। এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের যুগ্ম সন্তানদের দ্বারা যা প্রধানত পরিচালিত সেই স্বাধীন সংবাদপত্র হল সেই সমাজের পুনর্নির্মাণের এক নূতন ও শক্তিশালী কারিকা। জমিদার ও রায়তোয়ার যত ঘৃণ্যই হোক, তারা হল জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ,

---

* Conditio sine qua non—অপরিহার্য শর্ত। — সম্পাঃ

যা এশীয় সমাজের মহান অপেক্ষিত আবশ্যিকতা। কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাভরে ও কার্পণ্য সহকারে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা শাসন পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের দ্রুত ও নিয়মিত যোগাযোগ এনে দিয়েছে বাষ্প, ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব মহাসমুদ্রের বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং ভারতের অচলায়তনের যা প্রাথমিক কারণ, সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে তাকে পুনরুত্থিত করেছে। সেদিন দূরে নয়, যখন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোতের সমন্বয়ে ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যেকার দূরত্ব সময়ের পরিমাপে কমে আসবে আট দিনে এবং এই একদা-রূপকথার দেশটা এই ভাবে সত্য করেই পাশ্চাত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট বৃটেনের শাসক শ্রেণীগুলির যা স্বার্থ ছিল সেটা নিতান্ত আকস্মিক, অস্থায়ী ও ব্যতিরেকমূলক। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল জয়, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন, এবং মিলতন্ত্রীরা চেয়েছিল শস্তায় বেচে বাজার দখল। কিন্তু এখন অবস্থা উল্টে গেছে। মিলতন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে উৎপাদনশীল দেশরূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরী এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের উপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা। এবং সে কাজ তারা করবেই। তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।

এ কথা অতি সুবিদিত যে, ভারতের উৎপাদন-শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন-দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারতের চেয়ে বেশি আর কোথাও দেখা যায় না। ১৮৪৮ সালে বৃটিশ কমন্স সভার একটি কমিটির কাছে প্রমাণিত হয়েছিল যে,

'খান্দেশে যখন এক কোয়ার্টার শস্য বিক্রি হচ্ছিল ৬ থেকে ৮ শিলিং মূল্যে তখন পুনায় তা বিক্রি হচ্ছিল ৬৪ থেকে ৭০ শিলিং দামে — সেখানে লোকে দুর্ভিক্ষে মরে পড়ে থাকছিল রাস্তায়, খান্দেশ থেকে সরবরাহ আসার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কেননা কাঁচা রাস্তায় গাড়ি অচল।'

যেখানে রেলপথ-বাঁধের প্রয়োজনে মাটি দরকার সেখানে পুকুর খুঁড়ে এবং বিভিন্ন লাইন বরাবর অঞ্চলে জল সরবরাহ করে রেলওয়ের প্রবর্তনকে সহজেই কৃষি-উদ্দেশ্যের সহায়ক করে তোলা সম্ভব। এই ভাবে প্রাচ্যের চাষ ব্যবস্থার যা অপরিহার্য সর্ত সেই সেচ ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে বিস্তৃত কর যেতে পারে এবং জলাভাবে বারবার দেখা-দেওয়া স্থানীয় দুর্ভিক্ষগুলিকে রোধ করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ের অসাধারণ গুরুত্ব স্পষ্ট হবে যদি মনে রাখি এমন কি ঘাটের নিকটবর্তী জেলাগুলিতে সেচহীন জমিগুলির তুলনায় সেচ-দেওয়া জমিগুলির কর তিন গুণ, কর্মসংস্থান দশ-বারো গুণ এবং মুনাফা বারো থেকে পনেরো গুণ বেশি।

রেলওয়ের ফলে সামরিক ব্যবস্থার আয়তন ও ব্যয় কমানোর উপায় হবে। ফোর্ট সেণ্ট উইলিয়মের সেনাপতি কর্ণেল ওয়ারেন কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটির নিকট বলেন:

'বর্তমানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আগের চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে সৈন্য ও গোলাবারুদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের এত বেশি প্রয়োজন থাকবে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।'

আমরা জানি, গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির নিজেদের পরিচালিত সংগঠন ও অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে গেছে, কিন্তু এগুলির যা সর্বমন্দ দিক —বাঁধি-গৎ ও বিচ্ছিন্ন কণিকায় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনো বজায়। গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে যা সৃষ্টি, ভারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী। নিম্নতম মাত্রার সুযোগসুবিধার ওপর, গ্রাম গ্রামান্তরের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগ ছাড়াই এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে যা অপরিহার্য তেমন আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই এক একটি গোষ্ঠী এমনি পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার নিম্নতম

মাত্রায় বেঁচে এসেছে। গ্রাম-গোষ্ঠীগুলির এই স্বপর্যাপ্ত জাড্য ভেঙে দিয়েছিল বৃটিশেরা, রেলপথ মেটাবে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নতুন অভাববোধ। তাছাড়া,

'রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে — রেলপথের নিকটবর্তী প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে প্রথমত ভারতের বংশানুক্রমিক বৃত্তিভোগী গ্রাম্য কারিগরের পুরো যোগ্যতার পরখ হবে এবং অতঃপর তার ত্রুটি দূরীকরণের সাহায্য হবে' (চ্যাপম্যান, 'ভারতের তুলা ও বাণিজ্য')।

আমি জানি যে ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথে বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য নিয়ে যাতে তাদের কলকারখানার জন্যে কম দামে তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল নিষ্কাশিত করা যায়। কিন্তু যে দেশটার লোহা আর কয়লা বর্তমান সে দেশের গতিপথে যদি একবার যন্ত্রের প্রবর্তন করা যায় তাহলে সে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা থেকে তাকে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল-বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। এ যে নিশ্চয় তা আরো স্পষ্ট এই কারণে যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে। কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় মেকানিকরা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুসংস্কারে ভয়ানক প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ ক্যাম্পবেল স্বয়ং স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,

'ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত **শিল্প-ক্ষমতা** বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং অঙ্ক ও

গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য।' উনি বলছেন, 'এদের মেধা চমৎকার' (৬২)।

রেল ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত আধুনিক শিল্পের ফলে শ্রমের বংশানুক্রমিক যে ভাগাভাগির উপর ভারতের জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি, ভারতীয় প্রগতি ও ভারতীয় ক্ষমতার সেই চূড়ান্ত প্রতিবন্ধক ভেঙে পড়বে।

ইংরেজ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা তাদের সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না — এগুলি শুধু উৎপাদন-শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের স্বত্ব-গ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু এ দুটি জিনিসের জন্যেই বৈষয়িক পূর্বসর্ত স্থাপনের কাজ ইংরেজ বুর্জোয়ারা না করে পারবে না। তার বেশি কি বুর্জোয়ারা কখনো কিছু করেছে? রক্ত আর কাদা, দীনতা ও হীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে?

খাস গ্রেট বৃটেনেই যতদিন না শিল্পকারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসক শ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না। যাই হোক নিঃসন্দেহে আশা করতে পারি, ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন, সেই দেশ যেখানকার এমন কি হীনতম শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রেও শিষ্ট দেশবাসীরা — প্রিন্স সালতিকভের ভাষায় — 'sont plus fins et plus adroits que les italiens',* যাদের পরাধীনতাও এক ধরনের শান্ত মহত্ত্ব দ্বারা প্রতিতুলিত (counterbalanced), স্বাভাবিক অনীহা সত্ত্বেও যারা বৃটিশ অফিসারদের চমৎকৃত করেছে তাদের সাহস দেখিয়ে, যাদের দেশটা হল আমাদের ভাষা ও আমাদের ধর্মের উৎসভূমি, এবং যাদের জাটদের মধ্যে আমরা পাই প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিরূপ।

---

* 'ইতালীয়দের চেয়ে মার্জিত ও দূরদর্শী' (৬৩)। — সম্পাঃ

উপসংহারের কিছু মন্তব্য না দিয়ে ভারত প্রসঙ্গে ছেদ টানতে পারছি না।

স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অঙ্গাঙ্গি বর্বরতা আমাদের সামনে অনাবৃত। বুর্জোয়ারা নিজেদের সম্পত্তির সমর্থক বলে দেখায়, কিন্তু বাংলায়, মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে যে রকম কৃষি বিপ্লব হল তেমন কৃষি বিপ্লব কি কোনো বৈপ্লবিক দল কখনো সৃষ্টি করেছে? দস্যুচূড়ামণি স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের ভাষায়, ভারতবর্ষে যখন কেবল দুর্নীতি দিয়ে লালসার তাল ধরা যাচ্ছিল না, তখন কি ওরা নৃশংস জবরদস্তির পথ নেয় নি? জাতীয় ঋণের অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতার কথা নিয়ে ওরা যখন ইউরোপে বাগাড়ম্বর করছে তখন ভারতে কি তারা রাজাদের ডিভিডেন্ট বাজেয়াপ্ত করে নি — কোম্পানির নিজস্ব তহবিলেই যারা তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ঢেলেছিল? 'আমাদের পবিত্র ধর্ম' রক্ষার অছিলায় ওরা যখন ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছিল তখন একই সময়ে কি তারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয় নি, এবং উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরগুলিতে ধাবমান তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা তোলার জন্যে জগন্নাথের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত্যা ও গণিকাবৃত্তির ব্যবসায় চালায় নি? 'সম্পত্তি, শৃঙ্খলা, পরিবার ও ধর্মের' ধ্বজাধারী হল এরাই।

ইউরোপ-সদৃশ বিপুল, ১৫ কোটি একর এক ভূখণ্ডের দেশ ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে দেখলে বৃটিশ শিল্পের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট এবং হতভম্ব করার মতো। কিন্তু ভোলা উচিত নয়, বর্তমানে যে-ভাবে সমগ্র উৎপাদন-পদ্ধতি সংগঠিত, ও হল তারই অঙ্গাঙ্গি ফলাফল। এ উৎপাদন দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির চূড়ান্ত প্রভুত্বের ওপর। স্বাধীন শক্তি হিসেবে পুঁজির অস্তিত্বের জন্যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে প্রতিটি সুসভ্য শহরে অর্থশাস্ত্রের যে অন্তর্নিহিত অঙ্গাঙ্গি নিয়মগুলি কাজ করছে,বিশ্বের বাজারের ওপর এ কেন্দ্রীভবনের বিধ্বংসী প্রভাব শুধু সেই নিয়মগুলিকেই উদ্ঘাটিত করছে বিপুলতম আকারে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা — একদিকে মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদন-শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের

ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্যরূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন জগতের এই সব বৈষয়িক সর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল, বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদন-শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব কব্জা করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিকটাকৃতি আদিম দেবমূর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।

কার্ল মার্কস কর্তৃক ১৮৫৩
সালের ২২ জুলাই লিখিত

'New-York Daily Tribune'
পত্রিকায় ৩৮৪০ নং সংখ্যায়
১৮৫৩ সালের ৮ আগস্ট
প্রকাশিত

সংবাদপত্রের পাঠ অনুসারে
ইংরেজী থেকে ভাষান্তর

স্বাক্ষর: **কার্ল মার্কস**

(১) 'জার্মানিতে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লব' রচনাটিতে এঙ্গেলস ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের ফলাফলের পর্যালোচনা করেছেন, আর সেই বিপ্লবের বিভিন্ন পূর্বশর্ত, বিকাশের মূল পর্বগুলি এবং বিভিন্ন শ্রেণী আর পার্টির অবস্থানের প্রগাঢ় বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী মতাবস্থান থেকে। এতে তিনি বিশদভাবে বিবৃত করেছেন প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মকৌশলের মূল উপাদানগুলি, আর সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে মার্কসীয় শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করেছেন।

১৮৫১-১৮৫২ সালে 'The New-York Daily Tribune'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে এই রচনাটি। মার্কস তখন আর্থনীতিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁর অনুরোধক্রমে এঙ্গেলস লিখেছিলেন এইসব প্রবন্ধ। পত্রিকাটির সরকারী সংবাদদাতা ছিলেন মার্কস, তাঁরই নামে বেরিয়েছিল প্রবন্ধগুলি। মার্কস এবং এঙ্গেলসের মধ্যে লেখা চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে, শুধু তখনই জানা যায় এগুলি লিখেছিলেন এঙ্গেলস। পৃঃ ৭

(২) 'In partibus infidelium' (আক্ষরিক অর্থে — 'বিধর্মীদের দেশে') — অখ্রিস্টান দেশে নিছক নামে মাত্র ডায়োসেসে নিযুক্ত ক্যাথলিক বিশপের খেতাবে একটা সংযোজন। কোন একটি দেশের বাস্তব পরিস্থিতি উপেক্ষা করে বিদেশে গঠিত রাজতন্ত্রীদের সরকার প্রসঙ্গে মার্কস এবং এঙ্গেলসের রচনাগুলিতে প্রায়ই এই কথাটা ব্যবহার করা হয়। পৃঃ ৭

(৩) 'The Tribune' — ১৮৪১-১৯২৪ সালে প্রকাশিত প্রগতিশীল বুর্জোয়া সংবাদপত্র 'The New-York Daily Tribune'-এর সংক্ষেপিত নাম। ১৮৫১ সালের আগস্ট থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মার্কস এবং এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে লেখা দিয়েছিলেন। পৃঃ ৯

(৪) **মূলভূমি ব্যবস্থা** অথবা ইউরোপের মূলভূমি অবরোধ — ইংলণ্ডের সঙ্গে ইউরোপীয় মূলভূমির দেশগুলির বাণিজ্যের উপর ১৮০৬ সালে প্রথম নেপোলিয়নের প্রবর্তিত নিষেধাজ্ঞা। রাশিয়ায় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর এই অবরোধ ভেঙে যায়। পৃঃ ১০

(৫) **১৮১৮ সালের সংরক্ষণ শুল্ক** — প্রাশিয়ার রাজ্যক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ শুল্ক রহিত করা। পৃঃ ১২

(৬) Zollverein **(কাস্টমস সম্মিলনী)** — প্রায় সমস্ত জার্মান রাজ্য নিয়ে প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে এটা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৪ সালে; অভিন্ন সাধারণের কাস্টমস চৌহদ্দি স্থাপন ক'রে এটা জার্মানির রাজনীতিক একীকরণের সহায়ক হয়েছিল। পৃঃ ১২

(৭) **সাইলেসিয়ার** তাঁতিদের ১৮৪৪ সালের ৪-৬ জুনের অভ্যুত্থান — জার্মানিতে প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রথম বড়রকমের শ্রেণীগত লড়াই — এবং ১৮৪৪ সালে জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে **চেক** শ্রমিকদের অভ্যুত্থান প্রচণ্ড বলপূর্বক দমন করেছিল সরকারী ফৌজ। পৃঃ ১৫

(৮) **জার্মান কনফেডারেশন** — ১৮১৫ সালে ৮ জুন ভিয়েনা কংগ্রেসে গঠিত সংস্থা। তাতে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রগুলো সম্মিলিত হয় এবং জার্মানির রাজনীতিক আর আর্থনীতিক বিভাগ দৃঢ় করা হয়। তখন জার্মানিতে প্রধান ভূমিকায় ছিল অস্ট্রিয়া। পৃঃ ১৭

(৯) **কনফেডারেশনের ডায়েট** — জার্মান কনফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সংস্থা, সেটার অধিবেশনগুলো চলত মাইন্-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে; প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক হাতিয়ার হিসেবে এটাকে ব্যবহার করত জার্মান সরকার। পৃঃ ১৭

(১০) তথাকথিত **কাস্টমস ইউনিয়ন** (Steuerverein) স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৪ সালের মে মাসে; এটার অন্তর্ভুক্ত ছিল জার্মান রাজ্য হানোভার, ব্রাউন্শ্ভিথ, ওল্ডেনবুর্গ এবং শাউম্বুর্গ-লিপে, এগুলি ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহান্বিত ছিল। ১৮৫৪ সাল নাগাদ এই বিচ্ছিন্নতাপন্থী সম্মিলনীটা ভেঙে যায়, এতে অংশগ্রাহীরা যোগ দেয় Zollverein-এ (৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। পৃঃ ১৭

(১১) ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার পাণ্ডারা — অস্ট্রিয়া, ইংলণ্ড আর জারতান্ত্রিক রাশিয়া — জাতিগুলির জাতীয় একীকরণ এবং স্বাধীনতার স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে বিভিন্ন লেজিটিমিস্ট রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৮১৪-১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসে ইউরোপের মানচিত্রটাকে নতুন ক'রে খণ্ড-বিখণ্ড করে। পৃঃ ১৮

(১২) ১৮৩০ সালের জ্বলাই মাসে ফ্রান্সে একটা ব্র্জোয়া বিপ্লব ঘটেছিল, সেটার পরে অভ্যুত্থান ঘটে বেলজিয়ম, পোল্যান্ড, জার্মানি এবং ইতালিতে। পৃঃ ১৯

(১৩) **'নবীন জার্মানি'** ('Junges Deutschland')— উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে জার্মানিতে উদ্ভূত একটা সাহিত্যিক চক্র; এটার সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকতার রচনাগুলিতে পেটি ব্র্জোয়াদের মধ্যে বিরোধিতার মনোভাব প্রকাশ পায়; সেগুলিতে ধর্মবিশ্বাস এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে বলা হত। পৃঃ ১৯

(১৪) **'পবিত্র মৈত্রী'** — বিভিন্ন দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করা এবং সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৮১৫ সালে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার গড়া ইউরোপীয় রাজাদের প্রতিক্রিয়াশীল জোট। পৃঃ ২১

(১৫) 'Berliner politisches Wochenblatt' ('বার্লিন রাজনীতিক সাপ্তাহিক')-এর কথা বলা হচ্ছে; 'আইন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের' অনুগামীদের অংশগ্রহণে ১৮৩১-১৮৪১ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকাটা ছিল চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। পৃঃ ২২

(১৬) **'আইন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক সম্প্রদায়'** — আঠার শতকের শেষের দিকে জার্মানিতে দেখা দিয়েছিল ইতিহাস আর আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতধারাটা। পৃঃ ২২

(১৭) **লেজিটিমিস্টরা** — বংশানুক্রমিক বৃহৎ ভূস্বামী ব্যবস্থার প্রতিনিধি 'লেজিটিমেট' (বৈধ) বুরবোঁ রাজবংশের সমর্থকেরা; ১৮৩০ সালে এই রাজবংশ উৎখাত হয়। অর্থপতি অভিজাতকুল এবং বৃহৎ ব্র্জোয়াদের উপর নির্ভরশীল শাসক অর্লিয়ান্স বংশের (১৮৩০-১৮৪৮) বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেজিটিমিস্টদের একাংশ ভুয়ো গলাবাজি ক'রে শাসক ব্র্জোয়াদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনগণের রক্ষক হিসেবে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করে। পৃঃ ২২

(১৮) 'Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe' ('রাজনীতি, বাণিজ্য আর শিল্পের রাইন গেজেট') —১৮৪২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১৮৪৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কলোন্-এ প্রকাশিত জার্মান দৈনিক। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে মার্কস এই পত্রিকায় লেখা দিতে শুরু করেন, আর ঐ বছরই অক্টোবর মাসে তিনি হন এটার অন্যতম সম্পাদক। পৃঃ ২৪

(১৯) **সম্মিলিত কমিশনসমূহ** — প্রাশিয়ায় প্রাদেশিক ডায়েটগুলি তাদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করত এইসব সামাজিক-বর্গগত পরামর্শদাতা সংস্থা। পৃঃ ২৫

(২০) 'Seehandlung' ('বহির্বাণিজ্য') — 'Preussische Seehandlungsgesell-

schaft' ('প্রুশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য কম্পানি')-র সংক্ষেপিত নাম; ১৭৭২ সালে প্রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়-বাণিজ্যিক এবং ব্যাঙ্কিং সমিতিটাকে রাষ্ট্র কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিত; সমিতি মোটা মোটা টাকার ঋণ দিত সরকারকে। পৃঃ ২৫

(২১) **সম্মিলিত ডায়েট** — রাজার বন্দোবস্ত করা একটা বৈদেশিক ঋণের দায়িত্ব নেবার জন্যে ১৮৪৭ সালে এপ্রিল মাসে বার্লিনে আহূত প্রাদেশিক সাম্রাজ্যিক বর্গগত লান্টটাখগুলির সংযুক্ত পরিষদ। লান্টটাখ-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ বুর্জোয়াদের খুবই সীমাবদ্ধ রাজনীতিক দাবিদাওয়া মেটাতে রাজা নারাজ হওয়ায় তারা ঋণটার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে, সেই কারণে ঐ বছরই জুন মাসে রাজা লান্টটাখ ভেঙে দেন। পৃঃ ২৬

(২২) জার্মান বা 'সাচ্চা' সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের বিভিন্ন রচনার পরোক্ষ উল্লেখ; উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে জার্মানিতে প্রধানত পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই প্রতিক্রিয়াশীল মতধারাটা। পৃঃ ২৮

(২৩) **গোথা পার্টি** — অস্ট্রিয়া বাদে সমগ্র জার্মানিকে হয়েনৎসলার্ন প্রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে এক করার লক্ষ্য অনুসারে ১৮৪৯ সালের জুন মাসে প্রতিবিপ্লবী বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি দক্ষিণপন্থী উদারপন্থীদের প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। পৃঃ ৩০

(২৪) **'জার্মান ক্যাথলিকতন্ত্র'** — ১৮৪৪ সালে উদ্ভূত এই ধর্মীয় আন্দোলনে শামিল হয়েছিল মাঝারি আর পেটি বুর্জোয়াদের বড় বড় স্তর; ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদ এবং ভণ্ডামির মাত্রাতিরিক্ত অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল এই আন্দোলন। 'জার্মান ক্যাথলিকরা' পোপের প্রাধান্য এবং বহু ক্যাথলিক আপ্তবাক্য আর আচার-অনুষ্ঠান মানত না এবং ক্যাথলিকতন্ত্রকে জার্মান বুর্জোয়াদের চাহিদাগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করত।

'মুক্ত সম্প্রদায়গুলো' — ১৮৪৬ সালে অফিশিয়াল প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া সম্প্রদায়গুলো। এই ধর্মীয় প্রতিপক্ষতা ছিল জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার প্রতি উনিশ শতকের পঞ্চম দশকের জার্মান বুর্জোয়াদের অসন্তোষ জ্ঞাপনের একটা ধরন। ১৮৫৯ সালে তারা 'জার্মান ক্যাথলিকদের' সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। পৃঃ ৩২

(২৫) **ইউনিটারিয়ানরা** (একেশ্বরবাদীরা) বা অ্যান্টি-ট্রিনিটারিয়ানরা (ত্রিত্ববাদবিরোধীরা) — ষোল শতকে জার্মানিতে উদ্ভূত একটা ধর্মীয় মতধারার প্রতিনিধিরা, যারা সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনগণ এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের সংগ্রামের মুখপাত্র ছিল। ইউনিটারিজম ইংলণ্ড আর আমেরিকায়

দেখা দেয় সতর শতকে। উনিশ শতকের ইউনিটারিয়ান মতবাদ ধর্মের বাহ্য, আচার-অনুষ্ঠানের দিকটার বিরোধিতা ক'রে জোর দেয় নৈতিক দিকটার উপর।
পৃঃ ৩২

(২৬) ১৮০৬ সাল পর্যন্ত জার্মানি ছিল জার্মান জাতির তথাকথিত পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। দশম শতকে প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যটা ছিল সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা মান্যকারী বিভিন্ন সামন্ত প্রিন্স-শাসিত রাজ্য এবং স্বাধীন নগররাষ্ট্রের পরিমেল।
পৃঃ ৩৩

(২৭) এক এবং অবিভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্রের স্লোগান মার্কস এবং এঙ্গেলস তুলেছিলেন বিপ্লবের প্রাক্কালে 'জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির দাবি' রচনায়।
পৃঃ ৩৪

(২৮) তথাকথিত **প্রথম ওপিয়াম যুদ্ধের** (১৮৩৯-১৮৪২) কথা বলা হচ্ছে — এটা ছিল চীনের বিরুদ্ধে বৃটেনের রাজ্যজয়ের যুদ্ধ; চীনের আধা-উপনিবেশে পরিণত হবার সূত্রপাত করে এই যুদ্ধ।
পৃঃ ৩৫

(২৯) ১৮৪৬ সালে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ক্রাকোভে জাতীয়-মুক্তি অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্যালিসিয়ায় ঘটেছিল একটা মস্ত কৃষক অভ্যুত্থান, সেটাকে ছুতো করে অস্ট্রিয়া সরকার পোল্যাণ্ডের অভিজাতকুলের বিদ্রোহ আন্দোলন দমন করেছিল। ক্রাকোভের অভ্যুত্থান দমন ক'রে অস্ট্রিয়া সরকার গ্যালিসিয়ার কৃষক বিদ্রোহও দমন করেছিল।
পৃঃ ৩৬

(৩০) অস্ট্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে ইতালির জনগণের ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের কথা বলা হচ্ছে। ইতালির বৈপ্লবিক ঐক্যসাধন সম্বন্ধে আতঙ্কিত ছিল ইতালির শাসক শ্রেণীগুলো, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ঐ সংগ্রামের পরাজয় ঘটে।
পৃঃ ৪৬

(৩১) ১৮৪৮ সালে ২৬ আগস্ট মালমোয়ে-তে ডেনমার্ক এবং প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়; জনগণের চাপে বাধ্য হয়ে প্রাশিয়া শ্লেজ্‌ভিগ এবং হোলস্টাইনের বিদ্রোহীদের পক্ষে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল; ঐ বিদ্রোহীরা লড়ছিল জার্মানির সঙ্গে সম্মিলনের জন্যে এবং দেনিশ শাসনের বিরুদ্ধে। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে নকল যুদ্ধ চালিয়ে প্রাশিয়া সাত মাস মেয়াদের কলঙ্কজনক যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছিল ডেনমার্কের সঙ্গে; সেপ্টেম্বর মাসে ঐ চুক্তি ফ্রাংকফুর্ট জাতীয় পরিষদে অনুসমর্থিত হয়। যুদ্ধ আবার আরম্ভ হয়েছিল ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু ১৮৫০ সালের জুলাই মাসে প্রাশিয়া ডেনমার্কের সঙ্গে শান্তি সন্ধিচুক্তি সই করে, তাতে ডেনমার্ক বিদ্রোহীদের দমন করতে সমর্থ হয়।
পৃঃ ৫৮

(৩২) ১৭৭২ সালে প্রথম বিভাগের আগেকার পোল্যাণ্ডের সীমান্তের কথা বলা হচ্ছে; পোল্যাণ্ডের রাজ্যক্ষেত্রের বেশকিছু অংশ ১৭৭২ সালে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়েছিল রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির মধ্যে। পৃঃ ৬০

(৩৩) **হুস্‌সাইটদের যুদ্ধ** — জার্মান সামন্ত এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চেক্‌ জনগণের ১৪১৯-১৪৩৭ সালের জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধ। চেক্‌ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা ইয়ান হুস-এর নাম থেকে আসে হুস্‌সাইল। পৃঃ ৬২

(৩৪) মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপের কোন কোন স্লাভ জাতি-উপজাতির ঐতিহাসিক ভাগ্য এবং জীবনী শক্তি সম্পর্কে এই মত ঠিক নয়। কেন্দ্রীকরণের উপর জোর দিয়ে ছোট ছোট জাতিকে বড় বড় জাতির অঙ্গীভূত করার পুঁজিতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে দেখে এঙ্গেলস ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে, নিজেদের রাষ্ট্র সৃষ্টি করার জন্যে তাদের আগ্রহ এবং জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এইসব জাতি-উপজাতির বৃহৎ সম্ভাবনার কথা মনে রাখেন নি। এই মূল্যায়নের কিছুটা ভিত্তি ছিল এই যে, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে হাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর রুশী জারতন্ত্রের গলাবাজির সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায়ে জার্মান আর হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে পশ্চিমী এবং দক্ষিণ স্লাভ্‌দের জাতীয় আন্দোলন ব্যবহার করা হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া-জমিদারদের প্রভাবে পড়ে এই সমস্ত আন্দোলন প্রতিবিপ্লবের বাস্তব হাতিয়ারে পরিণত হয়।

পরে শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সেটার রাজনীতিক চেতনা আর সংগঠন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমেত বৈপ্লবিক আর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সমস্ত ধারার খুবই অগ্রগতি ঘটেছিল। টুকরো টুকরো রাজ্যক্ষেত্র নিয়ে গড়া সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল; সেই সাম্রাজ্যের শিকার ছোট ছোট জাতিগুলি স্বতন্ত্র বিকাশের পথে পা বাড়িয়েছিল; সেগুলোর কোন কোন জাতি এখন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পৃঃ ৬৩

(৩৫) **স্লাভ কংগ্রেস** —১৮৪৮ সালে ২ জুন প্রাগে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসে দেখা যায়, হাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্যের উৎপীড়িত স্লাভ লোকসমাজগুলির জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে ছিল দুটো মতধারা। জাতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে একক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে অপারক হয় এই কংগ্রেস। কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের মধ্যে র‍্যাডিকাল বিভাগের কিছু কিছু সদস্য, যাঁরা ১৮৪৮ সালের জুন মাসের প্রাগ অভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের উপর কঠোর দমন-পীড়ন চলে। নরম-উদারপন্থী বিভাগের প্রতিনিধিরা, যাঁরা প্রাগে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা ১৬ জুন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কংগ্রেসটাকে মুলতবি রাখার ঘোষণা করেন। পৃঃ ৬৪

(৩৬) জনগণের সনদ (চার্টার) গ্রহণ করাবার ব্যাপারে একখানা আবেদনপত্র পার্লামেণ্টে পেশ করার উদ্দেশ্যে ১৮৪৮ সালের ১০ এপ্রিল লণ্ডনে যে গণ-মিছিলের জন্যে চার্টিস্টরা আহ্বান জানিয়েছিল সেটা পরিচালকদের অস্থিরমতি আর দোদুল্যমানতার জন্যে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সেটাকে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ব্যবহার করেছিল শ্রমিকদের উপর হামলা এবং চার্টিস্টদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন শুরু করার জন্যে। পৃঃ ৬৮

(৩৭) **১৮৪৮ সালের ১৬ এপ্রিল** প্যারিসে শ্রমিকদের একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল 'শ্রমের সংগঠন' এবং 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ লোপের' দাবি করে একখানা আবেদনপত্র নিয়ে যাচ্ছিল অস্থায়ী সরকারের কাছে; সেটাকে থামিয়ে দিয়েছিল বিশেষভাবে সেই উদ্দেশ্যেই জড়ো-করা বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিদল। পৃঃ ৬৮

(৩৮) **১৮৪৮ সালের ১৫ মে** একটা জন-বিক্ষোভপ্রদর্শনের সময়ে প্যারিসের শ্রমিক আর হস্তশিল্পীরা ঢুকে পড়েছিল সংবিধান-সভার অধিবেশনের সভাগৃহে, তারা সংবিধান-সভা খতম হল ঘোষণা করে গড়েছিল একটা বৈপ্লবিক সরকার। কিন্তু জাতীয় রক্ষিদল এবং সৈন্যরা বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল অচিরেই। ব্লাঙ্কি, বার্বে, আলবের, রাস্পাই, সোব্রিয়ে এবং শ্রমিকদের অন্যান্য নেতা গ্রেপ্তার হন। পৃঃ ৬৮

(৩৯) **১৮৪৮ সালের ১৫ মে** নেপল্‌সের রাজা ২য় ফার্ডিনান্ড একটা জন-অভ্যুত্থান দমন করেন, জাতীয় রক্ষিদল আর পার্লামেণ্ট ভেঙে দেন, এবং ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনগণের চাপে প্রবর্তিত সংস্কারগুলি লোপ করেন। পৃঃ ৬৮

(৪০) ১৮৪৮ সালে ২৩-২৬ জুন ফরাসী বুর্জোয়াদের খুবই নির্মমভাবে দমন করা প্যারিসের শ্রমিকদের সাহসিক অভ্যুত্থানের কথা বলা হচ্ছে। অভ্যুত্থানটি হল প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়াদের মধ্যে ইতিহাসের প্রথম মহাগৃহযুদ্ধ। পৃঃ ৬৯

(৪১) ১৮৪৮ সালের ১ এপ্রিল অস্ট্রিয়া সরকারের জারি করা **অস্থায়ী সংবাদপত্র আইনে** মোটা টাকা জামানত রাখলে তবেই কোন সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হত। পৃঃ ৭৩

(৪২) **১৮৪৮ সালের ২৫ এপ্রিলের সংবিধানে** এমনসব বাধানিষেধ ছিল যাতে একটা নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তির মালিকেরা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্থায়ী বাসস্থান যাদের ছিল কেবল তারাই ডায়েট নির্বাচনে ভোটাধিকারী হত; এই সংবিধানে দুটো কক্ষ চালু করা হয় — নিম্নতর কক্ষ আর সেনেট, প্রাদেশিক সামাজিক-বর্গীয় প্রতিনিধি-সংস্থাগুলি বজায় রাখা হয়, আর কক্ষ-দুটোয় পাস-করা আইন বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয় সম্রাটকে। পৃঃ ৭৩

(৪৩) **১৮৪৮ সালের ৮ মে তারিখের নির্বাচনী আইনে** শ্রমিক, দিনমজুর এবং চাকরদের নির্বাচনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিছু-কিছু সেনেটরকে নিয়োগ করতেন সম্রাট, আর সর্বোচ্চ পরিমাণের করদাতাদের মধ্য থেকে দুই-পর্বের নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হত অন্যান্যেরা। নিম্নতর কক্ষের নির্বাচনও হত দুই পর্বে। পৃঃ ৭০

(৪৪) **অ্যাকাডেমিক লিজিয়ন** — ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডিকাল মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের নিয়ে গড়া একটা সামরিকীকৃত নাগরিক সংগঠন। পৃঃ ৭৩

(৪৫) 'Wiener Zeitung' — পুরো নাম 'Oesterreichische Kaiserische Wiener Zeitung' ('অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যিক ভিয়েনা গেজেট') — পত্রিকার কথা বলা হচ্ছে; এটা ছিল অফিশিয়াল সরকারী সংবাদপত্র, এই নামে এটার প্রকাশন আরম্ভ হয়েছিল ১৭৮০ সালে। পৃঃ ৭৬

(৪৬) **ফ্রীট্রেডাররা** — অবাধ বাণিজ্য (ফ্রী ট্রেড) এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের না-হস্তক্ষেপের সমর্থকেরা। উনিশ শতকের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দশকে ফ্রীট্রেডারদের নিয়ে ছিল একটা বিশেষ রাজনীতিক গ্রুপ, সেটা পরে লিবারাল পার্টিতে শামিল হয়ে যায়। পৃঃ ৮৪

(৪৭) অভ্যুত্থান দমন করার জন্যে হাঙ্গেরিতে পাঠান জারতান্ত্রিক ফৌজের কাছে গ্যোর্গের পরিচালিত হাঙ্গেরীয় ফৌজ **ভিলাগোশের** নিকটে আত্মসমর্পণ করেছিল ১৮৪৯ সালের ১৩ আগস্ট। পৃঃ ৮৪

(৪৮) 'Neue Rheinische Zeitung. Organ der Democratie' ('নতুন রাইন পত্রিকা। গণতন্ত্রের মুখপত্র') — ১৮৪৮ সালের ১ জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯ মে পর্যন্ত কলোন্-এ প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র; মার্কস ছিলেন প্রধান সম্পাদক, এঙ্গেলস — সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। পৃঃ ৮৫

(৪৯) **ল্যাঙ্কাস্টারীয় বিদ্যালয়সমূহ** — গরিব বাপ-মায়েদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, সেখানে পারস্পরিক শিক্ষণের প্রণালী প্রয়োগ করা হত; প্রণালীটার নাম হয় একজন ইংরেজ শিক্ষক জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টারের (১৭৭৮-১৮৩১) নাম অনুসারে। পৃঃ ৮৭

(৫০) **ফ্রাঙ্কফুর্ট পরিষদের বাম পক্ষ** — জার্মানিতে মার্চ বিপ্লবের পরে আহূত জাতীয় পরিষদের পেটি-বুর্জোয়া বাম বিভাগের কথা বলা হচ্ছে; ১৮৪৮ সালে ১৮ মে মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে শুরু হয়েছিল এই পরিষদের অধিবেশন। জার্মানির রাজনীতিক খণ্ড-বিখণ্ডতা ঘুচান এবং সারা জার্মানির সংবিধান রচনা করাই ছিল

সেটার প্রধান কাজ। কিন্তু উদারপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভীরুতা আর দোদুল্যমানতা এবং বাম বিভাগের দ্বিধা আর আত্মবিরোধের দরুন জাতীয় পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতা হস্তগত করতে অপারক হয় এবং ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের জার্মান বিপ্লবের প্রধান প্রধান প্রশ্নে স্থিরনিশ্চিত মতাবস্থান নিতে পারে নি। ১৮৪৯ সালের ৩০ মে পরিষদকে চলে যেতে হয়েছিল স্টুটগার্টে। ১৮৪৯ সালের ১৮ জুন সৈন্যদল সেটাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। পৃঃ ৮৭

(৫১) সতর শতকের বৃটিশ বুর্জোয়া বিপ্লবে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জন হ্যাম্পডেন ১৬৩৬ সালে 'জাহাজী অর্থ' কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন — ঐ কর কমন্স-সভায় অনুমোদিত হয় নি। হ্যাম্পডেনের মামলা ইংরেজ সমাজে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জাগিয়ে তুলেছিল।

বৃটিশ সরকারের চালু করা স্ট্যাম্প-কর দিতে আমেরিকানরা ১৭৬৬ সালে অস্বীকার করেছিল, আর ১৮ শতকের অষ্টম দশকে শুরু হয়েছিল বৃটিশ পণ্য বয়কট — ঘটনা দুটো হয়েছিল ইংলণ্ডের উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮৩) একটা মুখবন্ধস্বরূপ। পৃঃ ৯১

(৫২) ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের একটা পশ্চিমী প্রদেশের ভাঁদে-তে ফরাসী রাজতন্ত্রীদের চালু-করা একটা প্রতিবৈপ্লবিক বিদ্রোহ সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ; ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজতন্ত্রীরা ঐ প্রদেশের অনগ্রসর কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। পৃঃ ৯৭

(৫৩) **পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য** — ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে দাসপ্রথাভিত্তিক রোম সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া রাষ্ট্র, সেটার প্রধান শহর ছিল কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌। পরে এই রাষ্ট্রের নাম হয়েছিল বাইজান্‌টিয়াম। ১৪৫৩ সালে তুর্কী দখল পর্যন্ত সেটার অস্তিত্ব ছিল। পৃঃ ১০২

(৫৪) প্রুশীয় বুর্জোয়া মন্ত্রীদের উদ্যোগে ১৮৪৮ সালের ২১ মার্চ বার্লিনে একটা জাঁকাল রাজ-শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়েছিল। জার্মানির একীকরণের পক্ষে প্রবলভাবে মতপ্রকাশ করা হয়েছিল সেটার সঙ্গে সঙ্গে। চতুর্থ ফ্রিডরিখ-ভিলহেল্‌ম রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি করে যাবার সময়ে তাঁর একীভূত জার্মানির একটা প্রতীক ছিল কালো-লাল-সোনালী রঙের বাহুবন্ধনী, আর তিনি নকল-দেশপ্রেমিক বক্তৃতা করেছিলেন কয়েকটা। পৃঃ ১০৫

(৫৫) তথাকথিত 'সাম্রাজ্যিক সংবিধান' সংশোধনের উদ্দেশ্যে আহূত সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। সেটার ফলে ১৮৪৯ সালের ২৬ মে প্রাশিয়া, স্যাক্সনি এবং হ্যানোভারের রাজাদের মধ্যে একটা চুক্তি ('তিন রাজার সম্মিলনী') সম্পাদিত হয়েছিল। এই

'সম্মিলনী' ছিল জার্মানিতে প্রুশীয় রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব লাভ করার একটা চেষ্টা, যেহেতু প্রাশিয়ার রাজা হতেন সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি, কিন্তু অস্ট্রিয়া আর রাশিয়ার চাপে পড়ে প্রাশিয়া ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসেই 'সম্মিলনী' ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। পৃঃ ১০৮

(৫৬) ১৮৪৮ সালের ১৮ মে থেকে ১৮৪৯ সালের ৩০ মে পর্যন্ত মাইন-তীরে ফ্রাঙ্কফুর্টে সেণ্ট পল গির্জায় সারা-জার্মান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন চলেছিল। পৃঃ ১২২

(৫৭) এই সিরিজের শেষ প্রবন্ধটি 'The New-York Daily Tribune'-এ প্রকাশিত হয় না। মার্কসের মেয়ে এলেওনোরা মার্কস-এভেলিং প্রকাশনের জন্যে প্রস্তুত করেছিলেন ১৮৯৬ সালের যে ইংরেজী সংস্করণ সেটাতে এবং কয়েকটা পরবর্তী সংস্করণে এঙ্গেলসের 'কলোন্-এর সাম্প্রতিক মামলা' রচনাটিকে (এই বইয়ের ১২৮-১৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শেষ প্রবন্ধ হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, এটা ঐ সিরিজে ছিল না। পৃঃ ১২৭

(৫৮) **কোলন্-এ কমিউনিস্ট মামলা** (১৮৫২ সালে ৪ অক্টোবর - ১২ নভেম্বর) — কমিউনিস্ট লীগের ১১ জন সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রুশীয় সরকারের আয়োজিত প্ররোচনামূলক মামলা। জাল দলিল আর মিথ্যাসাক্ষ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত করা আসামীদের মধ্যে সাত জনকে ৩ থেকে ৬ বছরের মেয়াদে কেল্লায় বন্দী রাখার দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রুশীয় পুলিসী রাষ্ট্রের ইতর প্ররোচনামূলক পদ্ধতির মুখোস খুলে দিয়েছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস। পৃঃ ১২৮

(৫৯) **কমিউনিস্ট লীগ** — মার্কস এবং এঙ্গেলসের গড়া প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন; এটা ছিল ১৮৪৭-১৮৫২ সালে। পৃঃ ১২৯

(৬০) ১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভিল্লিখ্-শাপের গ্রুপের স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ-কেউ গ্রেপ্তার হয়; এই গ্রুপটা ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই গ্রুপটার পেটি-বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকৌশলের দরুন প্যারিসের একটা সম্প্রদায়ের নেতা প্ররোচক-গুপ্তচর শের্ভালের সাহায্যে ফরাসী আর প্রুশীয় পুলিস তথাকথিত জার্মান-ফরাসী ষড়যন্ত্র মামলা সাজাতে পেরেছিল। যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তারা কূদেতার আয়োজন করার জন্যে অপরাধী বলে ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রায় জারি হয়েছিল। জার্মান-ফরাসী ষড়যন্ত্রে মার্কস এবং এঙ্গেলসের পরিচালিত কমিউনিস্ট লীগ অংশগ্রাহী বলে সেটাকে অভিযুক্ত করার জন্যে প্রুশীয় পুলিসের চেষ্টা ভেস্তে গিয়েছিল। পৃঃ ১৩১

(৬১) জাতীয়-ঔপনিবেশিক প্রশ্নে মার্কসের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে পড়ে 'ভারতে বৃটিশ শাসন' এবং 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' এই প্রবন্ধ-দুটি। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশ ভারতে বৃটিশ শাসনের দৃষ্টান্ত দিয়ে মার্কস প্রাচ্যের অর্থনীতিগতভাবে অনগ্রসর দেশগুলির উপর পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির ঔপনিবেশিক আধিপত্য ব্যবস্থার বিশেষক উপাদানগুলিকে খুলে ধরেছেন। বৃটেনের ভারত দখল এবং ভারতকে দাসে পরিণত করার প্রধান পর্বগুলিকে বের করে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতে ইংরেজদের দখল আর লুণ্ঠন ছিল খোদ ইংলণ্ডে ভূমি-সম্রাট আর ধনকুবেরদের শাসক-চক্রতন্ত্রের সমৃদ্ধি আর শক্তি বৃদ্ধির একটা উৎপত্তিস্থল। মার্কস এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পেৌছন যে, হয় ইংলণ্ডে প্রলেতারিয়ান বিপ্লব, নইলে ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের নিজেদের মুক্তি-সংগ্রামের ফলে ভারত মুক্ত হতে পারে। পৃঃ ১৩৬

(৬২) G. Campbell. 'Modern India : a Sketch of the System of Civil Government', London, 1852, pp. 59-60 (জ. ক্যাম্পবেল, 'সমসাময়িক ভারত: সিভিল শাসন ব্যবস্থার একটি রূপরেখা', লণ্ডন, ১৮৫২, পৃঃ ৫৯-৬০)। পৃঃ ১৪৯

(৬৩) আ. দ. সালতিকভ-এর বই 'Lettres sur l'Inde', Paris, 1848, p. 61. ('ভারত সম্বন্ধে পত্রাবলী', প্যারিস, ১৮৪৮, পৃঃ ৬১) থেকে মার্কস উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ১৮৫১ সালে মস্কোতে রুশ সংস্করণ বেরিয়েছিল। পৃঃ ১৪৯

নামের সূচি

র

ল

শ

স

সাহিত্য এবং পৌরাণিক চরিত্র